প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম

(অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় এম. এ.

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক

দাম সাড়ে পাঁচ টাকা

সঙ্কেতপঞ্জী

সা. প. প.=সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

বা. সা. ই. ১।২=ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ

বা. সা. ই. ১।১=ঐ, প্রথম সংস্করণ

Nep. Cat.=হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত A Catalogue of palm-leaf & selected paper manuscripts belonging to the Durbar Library, Nepal

J. A. S. B.=Journal of the Asiatic Society of Bengal

I. H. Q.=Indian Historical Quarterly

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত

রাজা গণেশের আমল

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকের বাংলার প্রামাণিক ইতিহাস

বাংলার নাথসাহিত্য

(বিশ্বভারতী-প্রকাশিত সাহিত্য-প্রকাশিকা প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত)

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় অনূদিত

এ ক্রিসমাস ক্যারোল

বারনেবি রাজ

চার্লস ডিকেন্‌সের দুটি বিখ্যাত গল্পের ছোটদের উপযোগী অনুবাদ

উৎসর্গ

বিশ্বের বরেণ্য বৈজ্ঞানিক, বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের করকমলে
সশ্রদ্ধ নিবেদন

ভূমিকা

আমাদের দেশের লোকেরা ইতিহাস সম্বন্ধে চিরদিনই উদাসীন ছিলেন। তাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও যতদূর সম্ভব অস্পষ্ট। তার প্রধান প্রধান লেখকদের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সব সময় সঠিকভাবে জানা যায় না। ফলে তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা ও বিতর্কের অন্ত থাকে না। এই বইখানির মধ্যে যথাসাধ্য সমস্ত উপকরণ একত্র করে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লেখকদের সময়-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ-ভাবে প্রথম শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকলেও যে সমস্ত অপ্রধান লেখকের সময় ইতিপূর্বে চূড়ান্তভাবে স্থির হয়নি, তাঁদের প্রসঙ্গও বইএ স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষায় বিশেষ কিছু না লিখে বা সাহিত্যস্রষ্টা না হয়েও যাঁরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন (যেমন জয়দেব, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দ, মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও শ্রীনিবাস আচার্য), তাঁদের সম্বন্ধেও আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী মনীষীর সময় সম্বন্ধেও আলোচনা করেছি (যেমন রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—পৃঃ ১৫২-১৫৪ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ছাড়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত অন্য কোন কোন বিষয়ের আলোচনাও এই বইএ পাওয়া যাবে। ঐ বিষয়গুলির সঙ্গে কালক্রমের প্রশ্ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত বলেই এ বইএ তাদের অবতারণা অবান্তর বলে মনে করিনি। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সময়ে আমাকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এমন বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার সুষ্ঠু সমাধান কোন বইতে পাইনি। এই বইএর বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে সেই সমস্যাগুলিরও অবতারণা করে তাদের জট ছাড়াবার চেষ্টা করেছি।

এখনকার দিনে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও গবেষকরা সাধারণতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য বা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রসবিশ্লেষণের দিকেই বেশী মনোযোগী, তথ্যমূলক আলোচনার "কচ্‌কচি" তাঁদের ভালো লাগে না। কিন্তু সাহিত্যসংক্রান্ত তথ্যকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের পরিপূর্ণ আস্বাদন সম্ভব নয়, শেক্‌স্‌পীয়র-রসিকদের কাছে শেক্‌স্‌পীয়র-সংক্রান্ত তথ্য তাঁর কাব্য-নাটকের রসাস্বাদনের তুলনায় কম আদরণীয় বলে বিবেচিত হয় না। তথ্যের গাঁথুনীর

উপরে সাহিত্য-সমালোচনার সৌধকে প্রতিষ্ঠা না করলে তার আয়ু দীর্ঘ হবে না। এই বইএ কেবলমাত্র তথ্যই আছে এবং এর অধিকাংশই আমার নিজস্ব অনুসন্ধানের ফল। এই বই পড়ে সাহিত্যরসিকেরা যদি তথ্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই বইএ নিজের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবার সময় আমি পূর্বাচার্যদের মতেরও বিচার করেছি। কতকগুলি মত ইতিপূর্বেই খণ্ডিত হয়ে গেছে বলে সেগুলির নতুন করে খণ্ডন করার দরকার বোধ করিনি। অনেকগুলি মতের ভিত্তি খুবই দুর্বল, যে কোন লোকেই তাদের ত্রুটি ধরতে পারবেন, তাই সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করে বইএর কলেবর বৃদ্ধি করা সঙ্গত বোধ করিনি। যাঁরা "ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে" বর্তমান "দ্বিজ চণ্ডী" (চণ্ডীদাস নয়) নামক কবির লেখা এক অকিঞ্চিৎকর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের পুঁথি পেয়ে ও কল্পনাবলে 'রুক্কিণীবিশালা' ও 'বাশুলী'কে অভিন্ন ধরে "এইদিকে চণ্ডীদাস-রসিকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ" করেন এবং একটি পুঁথিতে চৈতন্যচরিতামৃতের সর্বজনপরিচিত 'শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ' ইত্যাদি শ্লোকটির বিকৃত পাঠ 'সাকে সিদ্ধাগ্নিবানেন্দৌ জৈষ্টে বৃন্দাবনান্তরে, সুর্য্যাঙ্গ সিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং সম্পুর্ণতাং গতঃ' পেয়ে তাকে "চৈতন্যচরিতামৃতের নবাবিষ্কৃত রচনাকাল" বলেন, তাঁদের মতামত বিচারের প্রশ্ন ওঠে বলে মনে করি না। পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ, এই বইএ কোন মতের উল্লেখ না থাকলে যেন তাঁরা ধরে না নেন, সেই মত আমার চোখে পড়েনি।

শ্রদ্ধেয় পাঠক ও সমালোচকদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন আমার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ভিত্তিস্থানীয় যুক্তি ও তথ্যগুলিকে বিচার করে তারপর তাদের গ্রহণ বা বর্জন করেন। কোন বিশিষ্ট লেখকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার সিদ্ধান্তের বিরোধ যেন আমার সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁদের বিরূপতার হেতু না হয়ে দাঁড়ায়।

ছাপার দিক দিয়ে এই বইটিতে বহু দোষত্রুটি থেকে গেছে। বইএর শেষে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হল। লজ্জার কথা এই যে, কয়েকটি সাল-তারিখের অঙ্কও ভুল থেকে গেছে। সেগুলিও যথাসাধ্য শুদ্ধিপত্রে সংশোধন করা হল। কোন ভুল যদি শুদ্ধিপত্রে না ধরা হয়ে থাকে, তাহলে পাঠকেরা বইএর অন্য অংশের সঙ্গে মিলিয়ে তা সংশোধন করে নেবেন। এই বইএ বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যে সব অংশ উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যেও কিছু কিছু ভুল থাকা অসম্ভব নয়, কারণ প্রুফ সংশোধনের সময় অনেক বই বহু চেষ্টা

করেও আর একবার সংগ্রহ করতে পারিনি। এগুলি সংশোধনের ভার পাঠকদেরই উপর রইল। ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলিতে বহু শব্দের প্রয়োজনীয় diacritical marks সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাদ পড়েছে। এজন্যেও যেন সকলে ক্ষমা করেন। এই ত্রুটিগুলির মধ্যে কতকগুলিতে আমার কোন হাত ছিল না, কতকগুলির জন্য আমার প্রুফ সংশোধনে অক্ষমতাই দায়ী। আর কলকাতার বাইরে থেকে কলকাতায় বই ছাপালে এজাতীয় ত্রুটির আধিক্য ঘটতে বাধ্য।

বর্তমান বইএর দু'একটি নতুন বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ, সূচীপত্রে প্রতি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বা ব্যক্তির সময় সংক্ষেপে নির্দেশ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সময় বইএর মধ্যে নির্ণয় করা হয়েছে। সূচীপত্রে উল্লিখিত রঃ=রচনাকাল, জীঃ=জীবৎকাল, গ্রঃ=গ্রন্থরচনাকাল, আঃ=আনুমানিক বুঝতে হবে। জীবৎকাল নির্দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। বিদ্যাপতি, চৈতন্যদেব, কবিশেখর, শ্রীনিবাস আচার্য, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, আলাওল, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিপূর্ণ জীবৎকাল সঠিক বা আনুমানিকভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু জয়দেব, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভবানন্দ ও দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের ক্ষেত্রে যে সময়টুকুতে তাঁরা জীবিত ছিলেন বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, মাত্র সেই সময়টুকু উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদের বেলায় কেবলমাত্র গ্রন্থরচনাকাল দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে মূল অধ্যায় ছাড়া পরিশিষ্টেও আলোচনা করা হয়েছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে মূল অধ্যায়ের পৃষ্ঠাসংখ্যার পাশে ( ) বন্ধনীর মধ্যে পরিশিষ্টের পৃষ্ঠাসংখ্যাও দেওয়া হয়েছে। পাঠকেরা ঐসব ক্ষেত্রে মূল অধ্যায় ও পরিশিষ্টকে মিলিয়ে পাঠ করবেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সম্বন্ধে মূল অধ্যায়ে (পৃঃ ১৯৯-২০৮) যে আলোচনা করা হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ, এসম্বন্ধে প্রামাণিক ও সর্বজনগ্রহণীয় সিদ্ধান্ত পরিশিষ্টের আলোচনাতেই (পৃঃ ২৭৭-২৮৪) পাওয়া যাবে। আলাওলের 'তোহ্ফা' গ্রন্থের রচনাসমাপ্তিকালও পরিশিষ্টেই (পৃঃ ২৯০) পাওয়া যাবে।

এখনকার পাঠকেরা পাদটীকার পক্ষপাতী নন বলে এই বইএ পাদটীকা একেবারেই দেওয়া হয়নি। নিদর্শনীগুলিকে ( ) বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি। যেখানে যতটুকু নিদর্শনী না দিলে নয়, ততটুকুই দিয়েছি। অনেক তথ্যের মূল সূত্র সর্বজনপরিচিত বলে উল্লেখ করিনি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিছক অনবধানবশতঃ কোন তথ্যের সূত্র অনুল্লিখিত থেকে গেছে। সেজন্যেও সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি।

এবারে ঋণ স্বীকারের পালা। পরলোকগত ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর উৎসাহ ও শিক্ষায় আমার প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জাগ্রত হয়। কিন্তু আমার আজকের কৃতজ্ঞতা নিবেদন তাঁর কাছে পৌছোবে না। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের কাছে আমি আগাগোড়া সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও স্বার্থলেশশূন্য সাহায্য পেয়েছি। সেজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র সেন এই বই লেখা ও প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে প্রথম পদার্পণের দিন থেকেই আমি তাঁর আনুকূল্য লাভ করে আসছি। এঁরা ভিন্ন আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস, অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহা, অধ্যাপক যতিকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় রায় ও শ্রীযুক্ত অমিতাভ সেন অবিরত অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে উদ্দীপিত করেছেন। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বর্ধমান সাহিত্য সভার কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে তাঁদের সংগ্রহের কয়েকটি পুঁথি ব্যবহার করতে দিয়েছেন। সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্.এ. ও বি.এ. অনার্স ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে আমাকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর দিতে গিয়ে আমি অনেক বিষয়ে নতুন আলোক লাভ করেছি এবং তার ফলে এই বইটিও পরিপুষ্ট হয়েছে। আমার এই ছাত্রছাত্রীদের কাছেও আমি ঋণী।

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন,
শান্তিনিকেতন,
৯ই জানুয়ারী, ১৯৫৮ সাল

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

বই পড়তে স্থরু করার আগে অনুগ্রহ করে বইএর শেষের শুদ্ধিপত্র দেখে ছাপার ভুলগুলি, বিশেষ করে সাল-তারিখের ভুলগুলি সংশোধন করে নেবেন। ঐগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি ভুল সংশোধনীয়। ৪ পৃঃ ৯ ছত্রে "Grunwedel" স্থলে "Gruenwedel", ২৯ পৃঃ ৮ ছত্রে "আটমাস" স্থলে "দশমাস", ৪৭ পৃঃ ১৪-১৬ ছত্রে "এই নসরৎ…প্রকাশ করেছেন" স্থলে "পদটি অন্য কোন বিদ্যাপতির রচনা", ৫৩ পৃঃ ২৭ ছত্রে "বসু" স্থলে ঘোষ", ৮০ পৃঃ ১৪ ছত্রে 'Valisha" স্থলে "vasilha", ১০৯ পৃঃ ২২ ছত্রে "২০।২২ বছরের" স্থলে "১৮ বছরের", ১৩৩ পৃঃ ১৮ ছত্রে "৮ই মার্চ" স্থলে "৮ই মার্চ, ১৯৫৫", ২৪৯ পৃঃ ২৪ ছত্রে "১৬৯১-৯২" স্থলে "১৬৯১-৯৫", ২৮৮ পৃঃ ২৫-২৬ ছত্রে "যা এই তিন জায়গা …কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত" স্থলে "যেখানে এই তিন জায়গা থেকেই সহজে আসা-যাওয়া করা চলে" এবং ৩১২ পৃঃ ৯ ছত্রে "শুণে" স্থলে "শুনে" হবে। ৩২৩ পৃঃ ২ ছত্রে "ও হয়তো তিরোভাবও" অংশটুকু বাদ যাবে। ১০৫ পৃঃ ৭ ছত্রে "যশোরাজ খান" এর পর "সুবুদ্ধি রায়, দামোদর ও কবিরঞ্জন" নামগুলি যুক্ত হবে।

৬৯ পৃঃ ৮-৯ ছত্রে ছাপার ভুলে উদ্ধৃত পদটির কতকাংশ বাদ পড়েছে। ঐ অংশটির শুদ্ধ পাঠ

নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল তাহে অতি আরতি ভেল।
রাধাকানুক প্রেম-রস-কৌতুক তাহে মগন ভৈ গেল ॥
নিজ নিজ সহচর রসিক-ভকত-বর তা সঞে করত বিচার।
তাহে নিতি নবিন পরম সুখ পাওত আনন্দ প্রেম অপার ॥

১৪২ পৃঃ ১৩ ছত্রে "চৈতন্যদেবের মৃত্যুর তারিখটি"র আগে এই অংশটুকু যোগ করতে হবে।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের সাল কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন। (চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥)

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম

॥ এক ॥

চর্যাগীতি

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাগীতিগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' গ্রন্থে, ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। সেই থেকে আমরা এগুলিকে বাংলা রচনার আদি নিদর্শন হিসেবেই গণ্য করে আসছি। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, এগুলির ভাষা মূলতঃ বাংলা।

কিন্তু উড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী ও হিন্দী ভাষার পণ্ডিতেরা এখন এগুলিকে তাঁদের ভাষার রচনা বলে দাবী করছেন। তাঁদের সবগুলি যুক্তি খুব জোরালো বলে মনে হয় না। একজন বলেছেন, যেহেতু চর্যাগীতি-রচয়িতাদের মধ্যে অনেকের আধুনিক বিহারের অন্তর্গত নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ ছিল, অতএব চর্যাগীতিগুলির ভাষা প্রাচীন হিন্দী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু নালন্দা ও বিক্রমশিলায় সে সময় ভারতবর্ষের সব প্রদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাই সমবেত হতেন। আর এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার পাল রাজাদের অধিকারের মধ্যে অবস্থিত ছিল। সুতরাং নালন্দা-বিক্রমশিলাতেও রাজাদের ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হত বলে মনে করা যেতে পারে। আর একজন পণ্ডিত বলেছেন, যে বৌদ্ধ মহাযানধর্ম চর্যাগীতিগুলির বিষয়বস্তু, তার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল ওড্ডয়ান। এই ওড্ডিয়ানকে তিনি উড়িষ্যার সঙ্গে অভিন্ন বলে দাবী করেন। এরই উপর আবার চর্যাগীতির উপর উড়িয়া ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু

প্রাচীন তিব্বতীগ্রন্থ Blue Annals এ (Vol. I, p. 367) লেখা আছে, "the country of Oddiyana, which was situated 230 yoyanas to the north of Magadha", আর বর্তমান উড়িষ্যা মগধের দক্ষিণে। সুতরাং এ যুক্তি টিক্‌ল না।

কিন্তু এসব বাদ দিলেও, চর্যাগীতির সঙ্গে যে উড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী ও হিন্দী ভাষার সম্পর্ক আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। অসমীয়া ও উড়িয়া ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য এমনিতেই বোঝা যায়। চর্যাগীতির ভাষার দুটি ক্রিয়াপদ 'ভণথি', 'বোলথি' মৈথিলী থেকে এসেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। দু-একটি চর্যাগীতির অংশবিশেষের সঙ্গে কবীরের প্রাচীন হিন্দীতে লেখা পদের কোন কোন অংশের প্রায় আক্ষরিক মিল আছে (ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৪; বা, সা. ই. ১।২, পৃঃ ৭৬-৭৭ দ্রষ্টব্য)।

বাংলার স্বপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে, চর্যাগীতিগুলির মধ্যে ভারতের অন্য কোন অঞ্চল বা অন্য কোন জাতির নাম উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু একটি চর্যাগীতিতে (নং ৪৯) 'বঙ্গাল' দেশ, 'বঙ্গাল' জাতি ও 'পঁউআ' (পদ্মা) খালের এবং আর একটিতে (নং ৩৯) 'বঙ্গ' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাগীতির মধ্যে ব্যবহৃত 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী' প্রবাদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কবিকঙ্কণচণ্ডী, বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান এবং আধুনিক বাংলা ভাষাতে পাওয়া যায়। 'সুন গোহালী কি মো দুঠ বলন্দে' প্রবাদটি আধুনিক বাংলা ভাষায় 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' রূপে পাওয়া যায়। 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়' উক্তিটি আধুনিক শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষায় প্রায় অবিকল ভাবে 'দোহাইল দুধ বানে সামায় না' আকারে মেলে। এছাড়া বাংলা ভাষার সঙ্গে চর্যাগীতির ভাষার অন্যান্য মিল তো আছেই।

বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে চর্যাগীতির ভাষার এইসব সাদৃশ্য দেখে মনে হতে পারে যে, যে সাধারণ ভাষা থেকে বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া ও হিন্দী ভাষার উদ্ভব হয়েছে, চর্যাগীতিগুলি সেই ভাষায় লেখা। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাই মনে করেন (ওড়িয়া সাহিত্য, পৃঃ ৮)। ডঃ সুকুমার সেন সম্প্রতি লিখেছেন, চর্যাগীতির উপর "অসমীয়াভাষীদের দাবি অযৌক্তিক নয়, কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি (বাংলা ও অসমীয়া) দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না" (চর্যাগীতি পদাবলী, ভূমিকা, পৃঃ ৩৯)। ডঃ সেন অন্যত্র লিখেছেন, "উড়িয়া-

আসামীর সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে মূল ধারা হইতে উড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে" (ভাষার ইতিবৃত্ত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৯৫)। চর্যাগীতিগুলি যে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই লেখা, তা সর্বজনস্বীকৃত; সুতরাং এই উক্তি দ্বারা পরোক্ষে চর্যাগীতির উপর উড়িয়া ভাষার দাবীকেও স্বীকার করা হল। চর্যাগীতিগুলির ভাষাকে বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী ও হিন্দী ভাষার সাধারণ জননী বলে স্বীকার করলে সব সমস্যারই সমাধান হয়।

যাহোক্, বাংলা ভাষার সঙ্গে এদের ভাষার যে যথেষ্ট সম্পর্ক আছে, তা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে এত বেশী সাদৃশ্যযুক্ত এত প্রাচীন রচনা আর পাওয়া যায় না। এই কারণে চর্যাগীতির প্রসঙ্গ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা সুরু করাই সঙ্গত। অবশ্য চর্যাগীতিগুলির সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নয়।

এখন তাহলে চর্যাগীতিগুলির রচয়িতাদের সময় নির্ধারণের চেষ্টা করা যাক্। যে ৫০টি চর্যাগীতি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছিল, সেগুলির সাড়ে ছেচল্লিশটির মূল আমরা পেয়েছি। বাকী সাড়ে তিনটির তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গেছে। এই ৫০টি চর্যাগীতির ভণিতায় এঁদের নাম পাওয়া যায়।

আর্যদেব (৩১ নং চর্যা), কঙ্কণপা (৪৪), কম্বলাম্বরপা (৮), কাহ্নপা (৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫), কুক্কুরীপা (২, ২০ ৪৮), গুণ্ডরী বা গুড্ডরীপা (৪), চাটিলপা (৫), জয়নন্দী (৪৬), ডোম্বীপা (১৪), ঢেণ্ঢণপা (৩৩), তন্ত্রীপা (২৫), তাড়কপা (৩৭), দারিকপা (৩৪), ধামপা বা গুঞ্জরীপা (৪৭), বিরুবাপা (৩), বীণাপা (১৭), ভাদে বা ভদ্রপা (৩৫), ভুসুকুপা (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯), মহীধরপা (১৬), লুইপা (১, ২৯), শবরপা (২৮, ৫০), শান্তিপা (১৫, ২৬), সরহপা (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯)।

এছাড়া চর্যাগীতিগুলির সঙ্গে যে টীকা পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে মীননাথের ভণিতাযুক্ত একটি পদ আছে।

চর্যাগীতিকারদের সময় নির্ধারণের প্রথম চেষ্টা করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর সময়ে Cordier এর Catalogue du Fonds Tibetain ছাড়া এসম্বন্ধে আর বিশেষ কোন উপকরণ ছিল না। এর সাহায্যে তিনি কয়েকজন চর্যাগীতিকারের সময়ের নিম্নতম সীমা নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। তাঁর

অনুবর্তীরা অন্য কিছু কিছু উপকরণ আবিষ্কার করে আরও কয়েকজন চর্যা-গীতিকারের সময়ের নিম্নতম সীমা নিরূপণ করেছেন।

চর্যাগীতিগুলির রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্য। তিব্বতী গ্রন্থ থেকে এঁদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। তিব্বতী সূত্র অবলম্বনে চর্যাগীতিকারদের আবির্ভাবকাল নির্ধারণের কাজ কিছু পরিমাণে করেছেন ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ও ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। ডঃ ভট্টাচার্য প্রধানতঃ Sumpā Mkhan-Por লেখা Pag-Sam-Jon-Zan (রচনাকাল ১৭৪৭ খৃঃ), তারনাথের লেখা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (রচনাকাল ১৬০৮ খৃঃ) এবং Arthur Grunwedel এর জার্মান ভাষায় লেখা ৮৪ সিদ্ধার ইতিহাস থেকে তথ্য আহরণ করে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩৫শ বর্ষের ৩য় সংখ্যায় এবং বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির জার্নালের ১৪শ বর্ষের ২য় সংখ্যায় এসম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আর ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন Sa-Skya-bka'-'bum-pha নামে একটি পুরানো তিব্বতী গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন তাঁর লেখা 'পুরাতত্ত্ব-নিবন্ধাবলী' বইএ। Sa-Skya-bka'-'bum-phaর প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ভদন্ত রাহুল লিখেছেন, "তিব্বতকে স-স্ক্য-বিহারকে পাঁচ প্রধান গুরুওঁ (১০৯১-১২৭৯ ইঃ) কী গ্রন্থাবলী 'স-স্ক্য-ব্‌কহ-হবুম্'.........জো কি, চীনকী সীমাকে পাস 'তের-গী' মঠমে ছপী হৈ।" ডঃ ভট্টাচার্য ও ভদন্ত রাহুলের আলোচনা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সম্বন্ধে অনেকখানি আলোকপাত করেছে। কিন্তু আমরা এসম্বন্ধে আরও নতুন উপকরণ পেয়েছি। আলোচনা সুরু করার আগে সেগুলির উল্লেখ করা দরকার মনে করছি।

তিব্বতী ভাষায় Deb-ther Snon-Po নামে একটি বই আছে। বইটিতে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃত ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর রচনাকাল ১৪৭৬-১৪৭৮ খৃঃ। অন্য সব তিব্বতী বইএর তুলনায় এই বইটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এতে উল্লিখিত বহু ঘটনার সন-তারিখ দেওয়া রয়েছে। কয়েক বছর হল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এই মূল্যবান বইটির ইংরেজী অনুবাদ 'The Blue Annals' নামে বেরিয়েছে (এই নামেই আমরা বইটির উল্লেখ করব)। অনুবাদ করেছেন ডঃ জর্জ রোরিক। ডঃ রোরিক Blue Annals এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছেন "The work is invaluable for its attempt to establish a firm chronology

of events of Tibetan history." চর্যাগীতিকারদের কাল নির্ণয়ের অনেক উপাদান এই বইটি থেকে পাওয়া যায়।

Blue Annals ছাড়া আর একটি প্রাচীন তিব্বতী গ্রন্থ থেকে আমরা অনেক সাহায্য পেয়েছি, সেটি হচ্ছে Bu-ston Rin-po-che এর লেখা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (আলোচনার সময় আমরা বইটিকে Bu-ston বলে উল্লেখ করব)। এর রচনাকাল ১৩২২ খৃষ্টাব্দ। Dr. E. Obermiller এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। এতে আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে, কিন্তু এর মধ্যে সন-তারিখের উল্লেখ Blue Annals এর তুলনায় অনেক কম।

যাহোক্, এখন চর্যাগীতিকারদের সময় সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করা যেতে পারে।

Blue Annals এর ৩৮০ পৃষ্ঠায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের নামের যে তালিকা দেওয়া রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকজন চর্যাগীতিকারেরও নাম পাই। এর থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি,

"The widely propagated teaching and manuals of meditation according to the initiation and Tantra of Śrī-Samvara, originated first in the Spiritual Lineage of the disciples of the Great Translator (Rin-chen bzan-po). In later times Mar-pa Do-pa, sPu-hrans lo-chun, Mal-gyo and others taught extensively this Tantra. The Lineage is as follows: Vajradhara, Vajra-pāni, Saraha, Śa-ba-ra dBan-phyug and his disciple Lū-yi-pa whom some call Lū-i-pa and some Lū-hi-pa...Lū-yi-Pa taught the Tantra to king Dā-ri-kā-pa (Dārika) and his minister Dangi-pa. The latter taught it to···Vajraghanta; the latter to···Kūrma pāda, the latter to Jayandhara; the latter to Krsnācārya...; the latter to Vijayapada,......the latter to Tilli-pa and he in turn taught it to Na-ro-pa......Na-ro-pa: he was the guardian of the northern gate of Vikramaśila. The ācārya Śānti-pa····· and the Venerable Maitri-pa heard the tantra

from him. The Venerable Master (Atiśa) heard it from Śanti-pa. Atiśa in his turn taught it in mNa-ris to the Great Translator (Rin-chen bzan-po) and his disciples."

উপরের বর্ণনা থেকে এই গুরু পরম্পরা পাওয়া যাচ্ছে,

বজ্রধর—বজ্রপাণি—সরহ—শবর—লুইপা—দারিক-পা ও ডঙ্গি-পা—বজ্রঘণ্ট—কূর্মপাদ—জয়ন্ধর—কৃষ্ণাচার্য—বিজয়পাদ—তিল্লিপা—নারো-পা—শান্তি-পা—অতীশ।

অতীশের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে Blue Annals এ (p. 247) লেখা আছে, "The master, who was born in the Water-Male-Horse year (chu-pho-rta—982 A. D.), in his 57th year, in the year Iron-Male-Dragon year (Icags-pho-brug—1040 A. D.) left India." অন্য তিব্বতী গ্রন্থগুলিও এ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একমত। অতীশের সময় থেকে হিসাব করে উপরে উল্লিখিত অন্যান্য সিদ্ধাচার্যদের সময় সহজেই বার করা যায়।

সরহ-পা

সরহ অতীশের ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ গুরু। প্রতি গুরুর গড়পড়তা ব্যবধান ২০ বছর ধরলে সরহের জীবৎকাল হয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ। এইটিই যে সরহের প্রকৃত জীবৎকাল, তা অন্য সূত্র থেকেও জানা যায়। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের গবেষণা এ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দেয়।

তিনি লিখেছেন, "তেঙ্গুরের তালিকায় দেখি, কমলশীল নামক একজন পণ্ডিত সরহের ব্যাখ্যানুসারে 'ডাকিনীবজ্রগুহ্যগীতিমর্ম্মোপদেশ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে কমলশীল সরহের পরবর্ত্তী কালের লোক। কমলশীল সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু জানা আছে। তিনি শান্তরক্ষিত নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্যের শিষ্য ছিলেন এবং শান্তরক্ষিতের রচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক বৃহৎ তর্কশাস্ত্রের পুথির উপর প্রায় পনর হাজার শ্লোকের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ও তাহার টীকা সম্প্রতি গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছে।" (সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ৩৫ শ বর্ষ, পৃঃ ১৫৬)

এখন, শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের আবির্ভাবকাল স্থিরভাবে নিরূপণের চেষ্টা করা যাক্। Bu-ston এবং Blue Annals—দুটি গ্রন্থেই লেখা আছে যে, তিব্বতের রাজা Khri-sron-lde-btsan এর রাজত্বকালে শান্তরক্ষিত ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে গিয়েছিলেন। Khri-Sron-lde-btsan এর রাজত্বকালের নির্দেশ তিন জায়গায় পাওয়া যায়—চীনদেশের T'ang Annals, তিব্বতের Tun-huang Chronicles (নবম শতক) এবং Blue Annals. তিনটিতেই লেখা আছে যে Khri-sron-lde-btsan ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন (Blue Annals, Introd. p. xix)। শান্তরক্ষিতের সময় সম্বন্ধে Blue Annals এ আর একটি নির্দেশ দেওয়া আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, শান্তরক্ষিতের উপস্থিতিতে তিব্বতে একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার তৈরী হয়। Blue Annals এ (p. 44) লেখা আছে, "From the Hare year (yos-lo, 787 A. D.) till the sheep yeer (lug-lo, 791 A. D.), the king built the Vihara". এই সময় নির্দেশই সঠিক। Bu-ston এর মতে বিহারের নির্মাণসমাপ্তিকাল ৭৪৯ খৃঃ, কিন্তু তা নিঃসন্দেহে ভুল, কারণ Khri-sron-lde-btsan তার ছয় বছর বাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিহার নির্মাণের কয়েক বছর বাদেই শান্তরক্ষিতের মৃত্যু হয় এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কমলশীল তিব্বতে পদার্পণ করেন। সুতরাং শান্তরক্ষিত ও কমলশীল দুজনেই অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। অতএব সরহের জীবৎকাল তার পরে হবে না। আগে হতে পারত, কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়নের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আগেও হবে না। রাহুল সাংকৃত্যায়ন লিখেছেন, "ভোটিয়া-গ্রন্থোঁসে মালুম হোতা হৈ কি, বুদ্ধজ্ঞান জো সরহকে সহপাঠী ঔর শিষ্য থে, দর্শনমেঁ হরিভদ্রকে ভী শিষ্য থে। হরিভদ্র শান্তরক্ষিতকে শিষ্য থে"। রাহুলজী এই তথ্য পেয়েছেন Sa-skya-bka'-'bum থেকে, Bu-ston ও Blue Annals এও আমরা এর সমর্থন পেয়েছি। এই তথ্য থেকে সরহকে শান্তরক্ষিতের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক বলে মনে হয়। অতএব তিনি কমলশীলের সমসাময়িক এবং অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। ২২১ নেপাল সংবৎ বা ১১০১ খৃষ্টাব্দে লেখা সরহের দোহাকোষের একটি পুঁথি পাওয়া যায়। তার থেকে জানা যায়, তখনই সরহের অনেক দোহা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

শবর-পা

Blue Annals এবং অধিকাংশ তিব্বতী গ্রন্থের মতে শবর সরহের শিষ্য। কোন কোন তিব্বতী গ্রন্থের মতে সরহের আর এক শিষ্য নাগার্জুনও শবরের গুরু ছিলেন। শবর সরহের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক, সুতরাং তিনি অষ্টম শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকের লোক।

লুই-পা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছিলেন।" হরপ্রসাদ লুইকে দীপঙ্করশ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক বলতে চান। কিন্তু তাঁর পুত্র ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর মতের প্রতিবাদ করে লিখেছেন, "লুইপাদ ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, দুই জনকেই তেঙ্গুরের তালিকায় 'লুই অভিসময়-বিভঙ্গ' নামক একখানি পুঁথির গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে অবশ্য প্রমাণ হয় না যে, লুই এবং দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান একই সময়ের লোক। বরং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, লুইপাদ 'লুইঅভিসময়' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কর তাহার টীকা 'বিভঙ্গ' লিখিয়াছিলেন এবং যেহেতু মূল ও টীকা এই পুস্তকে ছিল তাই দুই জনকেই গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" অতএব দীপঙ্করশ্রীজ্ঞানের জীবৎকাল (একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) লুইয়ের জীবৎকাল নয়, তার নিম্নতম সীমা।

লুই পার নাম সিদ্ধাচার্যদের তালিকায় সর্বপ্রথমে উল্লিখিত হয়ে থাকে এই জন্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকেই আদি সিদ্ধাচার্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু লুই-পা এই সম্মান লাভ করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য, সর্বপ্রাচীনত্বের জন্য নয়। সরহ যে তাঁর গুরুর গুরু, এসম্বন্ধে সমস্ত তিব্বতী সূত্র একমত।

শবর যদি অষ্টম শতাব্দীর শেষদিকে বর্তমান থাকেন, তাহলে তাঁর শিষ্য লুই-পা ঐ সময়ে ও নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন ধরা যায়। রাহুল সাংকৃত্যায়নের গবেষণা লুই-পার এই আবির্ভাবকালকে সমর্থন করে। তিনি 'Sa-Skya-bka'-'bum-pha' নামে তিব্বতী গ্রন্থের সাক্ষ্য অবলম্বন করে লিখেছেন, "লুই-পা মহারাজ ধর্মপালকে কায়স্থ (=লেখক) থে।" ধর্মপালের রাজত্বকাল (আঃ) ৭৭০-৮১০ খৃষ্টাব্দ।

দারিক-পা

Blue Annals এবং অন্য সমস্ত তিব্বতী গ্রন্থে দারিক-পাকে লুইপার শিষ্য বলা হয়েছে। দারিক পার নিজের পদের ভণিতা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর ছুটি পদ পাওয়া গেছে, ছুটিতেই তিনি লুইপার প্রসাদের উল্লেখ করেছেন, একটির ভণিতা এই,

"লুইপা অপসাএঁ দারিক দ্বাদশ ভুঅণে লাধা ॥"

(লুই পার প্রসাদে দারিক দ্বাদশ ভুবন লব্ধ।)

Cordier এর Catalogue du Fonds Tibetain এর ২য় খণ্ডের ২১১-১২ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় যে, দারিকের আর এক গুরু ছিলেন লীলাবজ্র। লীলাবজ্রের গুরু ভগবতী লক্ষ্মী, ভগবতী লক্ষ্মীর গুরু ইন্দ্রভূতি। ইন্দ্রভূতির ছেলে পদ্মসম্ভব শান্তরক্ষিতের ভগ্নীপতি। অতএব ইন্দ্রভূতির জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

Blue Annals এ দারিককে 'King Darika-pa' বলা হয়েছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'Sa-Skya-bka'-'bum' থেকে এঁর জীবন কাহিনী উদ্ধার করে লিখেছেন, "য়হ 'ওড়িসা' কে রাজা থে। জব সিদ্ধ লুইপা উড়ীসা গয়ে, তব য়হ ঔর ইনকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, জিনকা নাম পীছে ডেংগীপা (ডেংকীপা) পড়া, রাজ্য ছোড়কর উনকে শিষ্য বন গয়ে।"

লুইপার শিষ্য দারিকের জীবৎকাল নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের আগে বা পরে হবে না। ইন্দ্রভূতির সময় থেকে গণনা করলেও দারিককে এই সময়েই পাওয়া যায়।

কাহ্ন-পা

কাহ্নপার নামাঙ্কিত ১৩টি চর্যাপদ পাওয়া যায়। পদগুলির ভাব, ভাষা ও ভণিতা বিচার করলে সব এক লোকের লেখা বলে মনে হয় না। এক কাহ্নপা যে কৃষ্ণাচার্য ও কৃষ্ণপাদ নামেও পরিচিত ছিলেন, তা বিভিন্ন তিব্বতী গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। Blue Annals এর গুরুপরম্পরা থেকে দেখা যায়, কৃষ্ণাচার্যের সঙ্গে অতীশের ৫ জন গুরুর ব্যবধান। সুতরাং কৃষ্ণাচার্য নবম শতাব্দীর শেষ ও দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন ধরা যায়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন Sa-Skya-bka'-'bum অবলম্বনে লিখেছেন, "মহারাজ দেবপাল (৮০১-৮৪৯ ই:)

কে সময়মে য়হ এক পণ্ডিত ভিক্ষু থে ঔর কিতনে হী দিনোঁ তক সোমপুরী বিহার (পহাড়পুর) মে রহতে থে। পীছে য়হ সিদ্ধ জালন্ধরপাদকে শিষ্য হো গয়ে।" সুতরাং কাহ্নপার জীবৎকাল আনুমানিক ৮২০-৯০০ খৃঃ ধরা যায়।

Blue Annals এ কাহ্নপা বা কৃষ্ণাচার্যের গুরুর নাম লেখা রয়েছে জয়ন্ধর। কিন্তু Pag-Sam-Jon-Zan, Sa-Skya-bka'-'bum এবং অন্যান্য তিব্বতী গ্রন্থে এঁর নাম পাই জালন্ধরিপাদ। কাহ্নপার পদের ভণিতায় জালন্ধরিপাদের উল্লেখ পাই,

"শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।"

সুতরাং কাহ্নপা যে জালন্ধরিপাদেরই শিষ্য ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই জালন্ধরিপাদ নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান গুরু। এঁর নামান্তর হাড়ি-পা।

"পণ্ডিতাচার্য শ্রীকাহ্নপাদ" এর লেখা 'হেবজ্রপঞ্জিকা যোগরত্নমালা'র একটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। এটি লেখা হয়েছিল গোবিন্দপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে বা ১২০০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে।

নারো-পা বা দ্বিতীয় কাহ্ন-পা

নারো-পার নামে কোন চর্যাপদ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাহ্নপা-নামাঙ্কিত চর্যাপদগুলির ভাব, ভাষা ও ভণিতা বিচার করলে জালন্ধরিপাদের শিষ্য কাহ্নপা ভিন্ন এক দ্বিতীয় কাহ্নপার সন্ধান পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় কাহ্নপাই নারো-পা। Blue Annals এর ৩৭২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "Sri Nā-ro-pa, who was also known as Krsnapāda, the Junior" ইত্যাদি। নারোপার সঙ্গে অতীশের মাত্র দুই গুরুর তফাৎ।

Pag-Sam-Jon-Zanএ নারোপাকে মহীপালের (৯৭৪-১০২৬ খৃঃ) সমসাময়িক বলা হয়েছে। এই দুই দিক দিয়ে বিচার করলে নারো-পার জীবৎকাল দশম শতাব্দীর শেষার্ধে স্থির হয়।

শান্তি-পা

শান্তি-পার ভণিতায় দুটি চর্যাপদ (১৫, ২৬) পাওয়া যায়। Blue Annals এর বিবৃতি অনুযায়ী শান্তি-পা অতীশকে তন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং শান্তি-পা অতীশের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন ধরা যায়। রাহুল-

সাংকৃত্যায়ন লিখেছেন, "(শান্তি) ঘুমতে ঘামতে জব বিক্রম শিলা পঁহুছে, তব মহারাজ মহীপাল (৯৭৪-১০২৬) কী প্রার্থনা স্বীকার কর পূর্বদ্বারকে পণ্ডিত বনে।" Pag-Sam-Jon-Zanএও লেখা আছে শান্তিপা মহীপালের সমসাময়িক (Index, p.cx দ্রষ্টব্য)। অতএব শান্তি-পা যে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পূর্বোক্ত গুরুপ্রণালীতে নাম নেই, এমন দু'জন সিদ্ধাচার্যের সময় নির্ধারণের উপকরণ আমরা অন্য সূত্র থেকে পাচ্ছি।

ভুসুকু-পা

ভুসুকুর ভণিতায় ৮টি চর্যাপদ পাওয়া যায়। মনে হয় সবগুলি একই লোকের লেখা নয়। আমরা এপর্যন্ত দুজন ভুসুকুর সন্ধান পেয়েছি। এসিয়াটিক সোসাইটির ৯৯৯০ নং পুঁথি এবং তারনাথের গ্রন্থ থেকে এক ভুসুকুর কথা জানা যায়। তিনি শিক্ষাসমুচ্চয়, সূত্রসমুচ্চয়, বোধিচর্যাবতার প্রভৃতির লেখক বলে অভিহিত শান্তিদেবের সঙ্গে অভিন্ন এবং সৌরাষ্ট্রের অধিবাসী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন ইনি ৬৪৮ থেকে ৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন ; রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন ইনি দেবপালের (৮০৯-৮৪৯) সমসাময়িক। এদিকে তারনাথ অতীশের পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে এক ভুসুকুর উল্লেখ করেছেন। ইনিই সম্ভবতঃ সেই চর্যাগীতিটি লিখেছিলেন, যাতে "আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী" উক্তি আছে। এই চর্যাগীতির লেখক বাঙালী ছিলেন বলেই মনে হয়।

ভুসুকুর নামাঙ্কিত পদের মধ্যে দুই ভুসুকুর রচনাই মিশে আছে বলে মনে হয়। প্রথম ভুসুকু নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের এবং দ্বিতীয় ভুসুকু একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের লোক বলে আপাততঃ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। এক ভুসুকুর লেখা 'চতুরাভরণ' নামে একটি বইএর পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তার লিপিকাল নেওয়ারী সংবৎ ৪১৫ অর্থাৎ ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ।

ডোম্বী-পা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন যে ডোম্বীপা কাহ্নপার সমসাময়িক, অতএব তিনি নবম শতাব্দীর শেষার্ধের আগেকার লোক নন। Cordier এর Catalogue du Fonds Tibetain এর ২য় খণ্ডের ২১১-২১২ পৃষ্ঠায়

একটি গুরুপ্রণালী দেওয়া আছে, তার থেকে পাওয়া যায় যে, ডোম্বীপা দারিক-পার শিষ্যা সহজযোগিনী চিন্তার শিষ্য। দারিক-পা যদি নবম শতকের প্রথমার্ধের লোক হন, তাহলে তাঁর প্রশিষ্য ডোম্বী-পার জীবৎকাল নবম শতাব্দীর শেষার্ধের পরে যাবে না। অতএব নবম শতাব্দীর শেষার্ধই তাঁর জীবৎকাল।

এবারে, অন্যান্য চর্যাপদ রচয়িতাদের সময় নির্ধারণের চেষ্টা করা যাক্।

Blue Annalsএর ৮৬৭-৮৭৪ পৃষ্ঠায় Dam-pa নামে একজন বৌদ্ধ সিদ্ধের জীবনচরিত আলোচনা করা হয়েছে। ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয় ["This Dam-pa rMa was born in the year Wood-Female-Sheep (śin-mo-lug—1055 A. D)]। Blue Annalsএর ৮৬৮-৮৬৯ পৃষ্ঠায় এই Dam-paর গুরুদের নামের একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে এই তালিকায় এঁদের নাম পাওয়া যায়,

নাগার্জুন, প্রজ্ঞাভদ্র, গুণপ্রভা, ধর্মকীর্তি, আকারসিদ্ধি, শঙ্কর, জ্ঞানগর্ভ, অসঙ্গ, আর্যদেব, শান্তিদেব, ধর্মকীর্তি (দ্বিতীয়), বাগীশ্বর, বুদ্ধগুপ্ত, গোধরী, কর্মবজ্র, জবরি, জ্ঞানপাদ, নাগবোধি, আনন্দ, কৃষ্ণপাদ, বসুধরিন, পদ্মবজ্র, অনঙ্গবজ্র সরোরুহ, ইন্দ্রভূতি, ডোম্বী-পা, বজ্রঘণ্ট, তিল্লীপা, লীলাবজ্র, লুই-পা, বিরূ-পা, আনন্দগর্ভ, কুকুরী-পা, সরহ, চর্যা-পা, গুণরি (গুঞ্জরি), কোটালি, কোশ-পা, শবরী-পা, মৈত্রী-পা, সাগরসিদ্ধি, রবিগুপ্ত, রত্নবজ্র, বিমলা, পদ্মপাদ, কুমুদা, সুখাকরা, গঙ্গভদ্রী, চিন্তা, লক্ষ্মী, পর্ণী এবং সুখসিদ্ধি।

বলা বাহুল্য, এখানে গুরু অর্থে সাক্ষাৎ গুরুর কথা বলা হয়নি—কারণ নাগার্জুন, অসঙ্গ, আর্যদেব, শান্তিদেব প্রভৃতি ১০৫৫ খৃষ্টাব্দের বহুশত বছর আগে বর্তমান ছিলেন। Dam-pa এঁদের বই পড়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন, এই কথাই বলা হয়েছে। উদ্ধৃত তালিকায় অনেক চর্যাগীতি-রচয়িতারও নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের আবির্ভাবকাল ইতিমধ্যেই নির্ণয় করা হয়েছে। অন্যান্যেরা—অর্থাৎ বিরূ-পা (বা বিরূ-আ), কুকুরী-পা, গুণরি (বা গুঞ্জরী)—একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে বর্তমান ছিলেন বলে উদ্ধৃত তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে।

তারনাথের মতে কম্বলাম্বর, কুক্কুরীপা, ইন্দ্রভূতি, পদ্মবজ্র ও ললিতবজ্র পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন (Schiefner কৃত জার্মান অনুবাদ, পৃঃ ১৮৮)। এর থেকে কেউ কেউ কম্বলাম্বর ও কুক্কুরীপাদের সময় নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু

প্রাচীন তিব্বতী গ্রন্থগুলির সাক্ষ্য তারনাথের এই উক্তির বিরোধী। Buston এ লেখা আছে, ইন্দ্রভূতি শান্তরক্ষিতের শ্যালক পদ্মসম্ভবের পিতা, সুতরাং তিনি অষ্টম শতাব্দীর লোক। Blue Annals এ পাই যে, পদ্মবজ্র ইন্দ্রভূতির ঊর্ধ্বতন নবম গুরু (Vol. I, p. 362), সুতরাং তিনি আরও অনেক আগেকার লোক। এদিকে Blue Annals এ ললিতবজ্রকে তিল্লি-পার সাক্ষাৎ শিষ্য বলা হয়েছে (Vol. II, p. 1030)। তিল্লি-পা অতীশের ঊর্ধ্বতন চতুর্থ গুরু। সুতরাং, ইন্দ্রভূতি, পদ্মবজ্র ও ললিতবজ্র পরস্পরের সমসাময়িক হতে পারেন না। অতএব এর থেকে কম্বলাম্বর ও কুক্কুরীপার সময় নির্ধারণ করা যায় না।

যেসব চর্যাগীতিকারের সময় সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, তাঁরা ছাড়া আরও বহু সিদ্ধাচার্যের সময় সম্বন্ধে নির্দেশ রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'পুরাতত্ত্ব-নিবন্ধাবলী'তে পাওয়া যায়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিভিন্ন তিব্বতী গ্রন্থ থেকে এই সময়নির্দেশ পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন। এই সব তিব্বতীগ্রন্থ সকলের আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত রাহুলজী-প্রদত্ত সময়নির্দেশ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা চলে না। তবুও রাহুলজীর বইএ যা পাওয়া যায়, তা আমরা নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি,

সিদ্ধাচার্যের নাম	পরিচয়	সম্ভাব্য সময়
আর্যদেব	সরহপাদের শিষ্য নাগার্জুনের শিষ্য	অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ
কুক্কুরীপা	মীনপাদের গুরু	ঐ
মীনপা	দেবপালের সমসাময়িক	নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ
বিরুবাপা (বিরুআ)	কাহ্নপার গুরু	নবম শতাব্দীর শেষার্ধ
কম্বলাম্বরপা	দারিকের শিষ্য বজ্রঘণ্টের শিষ্য	ঐ
গুঞ্জরীপা	সরহের অধস্তন চতুর্থ শিষ্য	ঐ
তন্ত্রীপা	জালন্ধরিপা ও কাহ্নপার শিষ্য	ঐ
ভাদেপা বা ভদ্রপা	কাহ্নপার শিষ্য	দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ
মহীপা	ঐ	ঐ
কঙ্কণপা	কম্বলাম্বরপার শিষ্য	ঐ
বীণাপা	ভদ্রপার শিষ্য	দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ

উপসংহার

প্রাচীন তিব্বতী গ্রন্থ এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে সরহ, শবর, লুই, দারিক, কাহ্ন, শান্তি প্রভৃতি চর্যাগীতিকারেরা অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সুরু করে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। অবশিষ্ট চর্যাগীতিকারদের সম্বন্ধে কোর্ডিয়ারের ক্যাটালগ, Pag-Sam-Jon-Zan এবং তারনাথের গ্রন্থ থেকে কারও কারও আবির্ভাব-কালের যে হদিস্ পাওয়া যায় এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের প্রবন্ধে আমাদের অজ্ঞাত তিব্বতী সূত্র অবলম্বনে তাঁদের যে কালনির্দেশ পাওয়া যায়, তার থেকে দেখি তাঁরাও ঐ সময়েই বর্তমান ছিলেন। অতএব মোটামুটিভাবে ৭৫০ থেকে ১০৫০ খৃষ্টাব্দই চর্যাগীতিরচনার যুগ বলে নির্দিষ্ট করা যায়। চাটিল, ঢেণ্টণ, তাড়ক প্রভৃতি যে সমস্ত চর্যাগীতিকারের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন সূত্র পাওয়া যায় না, তাঁরাও ঐ সময়ের মধ্যেই বর্তমান ছিলেন ধরলে অন্যায় হবে না।

চর্যাগীতিগুলি রচিত হবার অনেক পরে মুনিদত্ত নামে একজন পণ্ডিত সেগুলিকে একত্র করে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নাম দিয়ে তাদের টীকা লেখেন। এই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'রই পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন এবং এরই তিব্বতী অনুবাদ ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী আবিষ্কার করেন। এই তিব্বতী অনুবাদের সময় সম্বন্ধে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেন, "অনুবাদ দ্বাদশ শতকের শেষে বা ত্রয়োদশ শতকে করা হয়েছিল। সে অনুবাদ যে ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী নয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ১১৯) তিব্বতী অনুবাদের বেশ কিছুকাল আগে মুনিদত্তের মূল টীকা রচিত হয় এবং তারও অনেক আগে চর্যাগীতিগুলি রচিত হয়। সবশুদ্ধতে ১৫০।২০০ বছর লাগবার কথা। এদিক থেকেও একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চর্যাগীতিগুলির রচনাকালের নিম্নতম সীমা নির্দিষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত হয়। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লেখা অতীশের 'চর্যাগীতি' নামে গ্রন্থের উল্লেখ তেঙ্গুর বা তান্-জুরের গ্রন্থতালিকায় পাওয়া যায়।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগীতির ভাষাকে দশম-একাদশ শতাব্দীর ভাষা বলেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন "চর্যাগীতিগুলির ভাষায় ও রচনারীতিতে কালগত বৈষম্য অলক্ষ্য" (চর্যাগীতি-পদাবলী, ভূমিকা, পৃঃ ৬),

এ জন্য সেগুলিকে প্রায় একই যুগের রচনা বলে মনে হয়। এই দুই ভাষাতত্ত্ব-বিদের অভিমত স্বীকার করে নিলেও তা চর্যাগীতিকারদের সময় সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে না। কারণ প্রাপ্ত চর্যাগীতিগুলির ভাষাকে রচনা-কালের সমসাময়িক বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। লোকের মুখে মুখে প্রচলিত থাকার দরুণ এদের মূল ভাষা অবিকৃত থাকেনি। ক্রমশঃ তা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হয়ে পড়েছিল এবং তারই ফলে প্রথম ও শেষ চর্যাগীতি-কারের ভাষার কালগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। অনুমান করা যায়, মুনিদত্ত যে সময় চর্যাগীতিগুলি সঙ্কলন করে তাদের টীকা রচনা করেছিলেন, প্রাপ্ত ভাষা প্রায় সেই সময়ের। অতএব ৭৫০-১০৫০ খৃষ্টাব্দকে চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল বলে গ্রহণ করার কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না।

॥ দুই ॥

জয়দেব

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সংস্কৃতে লেখা হলেও ভাষা, ভাব ও ছন্দের দিক দিয়ে এই কাব্যের সঙ্গে পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের যে সুনিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে, তাতে এই কাব্যকে বাংলা সাহিত্যের গঙ্গোত্রী বললে ভুল হয় না। জয়দেব 'গীতগোবিন্দে'র তৃতীয় সর্গের দশম শ্লোক ও দ্বাদশ সর্গের শেষ শ্লোকে তাঁর নিবাসভূমির নাম 'কেন্দুবিল্ব' বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা যেমন এই 'কেন্দুবিল্ব'কে বীরভূম জেলার কেঁদুলীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করি, মিথিলা ও উড়িষ্যার অধিবাসীরাও তেম্‌নি একে তাঁদের দেশের অনুরূপ নামের গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন; জয়দেবের অনেক পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি গ্রন্থে লেখা আছে যে, জয়দেবের বাড়ী উড়িষ্যায় ছিল (J. A. S. B., 1906, p.p. 163-166 দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বাংলার কিংবদন্তীর পিছনে জয়দেবের নিজের লেখারই সমর্থন রয়েছে। 'গীতগোবিন্দের' প্রথম সর্গের চতুর্থ শ্লোকে তিনি কয়েকজন কবির নাম করেছেন,

> বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাঃ-
> জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
> শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় বচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন-
> স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।

এই সমস্ত কবিদের মধ্যে প্রত্যেকেই বাঙালী ছিলেন। এছাড়া 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত একটি শ্লোকে দেখি, জয়দেব বাংলার রাজার প্রশস্তি করেছেন,

> লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সংকল্পকল্পদ্রুম
> শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয়।
> গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজকসভালঙ্কার কারার্পিত-
> প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম্॥

যাহোক্, জয়দেবের দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; তাঁর সময় সম্বন্ধেই আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করব।

জয়দেব যে বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ছিলেন, এ প্রসিদ্ধি বহুকালের এবং তা প্রমাণ করা কিছুমাত্র শক্ত নয়। 'গীতগোবিন্দে'র প্রথম সর্গের চতুর্থ শ্লোকে জয়দেব যে ক'জন কবির নাম করেছেন তাঁরা সকলেই লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। এঁদের মধ্যে ধোয়ী "সেনান্বয়নৃপ" "লক্ষ্মণ"কে নায়ক করে তাঁর 'পবনদূত' কাব্য রচনা করেছেন। সুতরাং জয়দেব লক্ষ্মণসেনের পূর্ববর্তী নন।

তারপর শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণমৃতে' 'গীতগোবিন্দে'র দুটী শ্লোক এবং জয়দেবরচিত ২৯টি নতুন শ্লোক সঙ্কলিত আছে। সদুক্তিকর্ণামৃতের সঙ্কলনকাল শ্রীধরদাস এইভাবে নির্দেশ করেছেন,

> "শাকে (চ) সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্
> শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশেহব্দে।
> সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেতু পরার্থহেতবে কুতুকাৎ
> শ্রীধরদাসেনেদং সদুক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥"

সুতরাং লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের "রসৈকবিংশ" বর্ষে ১১২৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে বা ১২০৬ খৃষ্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলিত হয়। অতএব জয়দেব যে তার আগে বর্তমান ছিলেন ও গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন, তা প্রমাণিত হল। জয়দেবের উর্ধ্বতম ও অধস্তম সীমা দুইই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে পড়ছে। অতএব জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক, তা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হল। উপরোদ্ধৃত শ্লোকের 'রসৈকবিংশ' শব্দের কেউ কেউ অর্থ করেন ৬+২১=২৭, আবার কেউ কেউ 'রাজ্যৈকবিংশ' বা 'রমৈকবিংশ' পাঠ ধরে অর্থ করেন ২১। যাহোক্ লক্ষ্মণসেন যে ১১৭৯ থেকে ১১৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং অন্ততঃ ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জয়দেবও ঐ সময়েই বর্তমান ছিলেন।

জয়দেব শুধু লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক নন, তাঁর সভাকবিও ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥" এই শ্লোকটি বহুলপ্রচলিত। লক্ষ্মণসেনের "সভার দ্বার দেশে প্রস্তরফলকে" শ্লোকটি ক্ষোদিত ছিল বলে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বহু গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সেই সভাগৃহের কোন সন্ধানই এখন আর পাওয়া যায় না। যাহোক্, অন্য সুপ্রাচীন

সূত্রেও এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ পাওয়া গেছে। মেবারের রাজা কুম্ভক 'রসিকপ্রিয়া' নামে 'গীতগোবিন্দে'র যে টীকা লিখেছিলেন, তাতে তিনি প্রথম সর্গের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, শ্রুতিধর এবং ধোয়ী এই ছজন পণ্ডিতের নাম করে লিখেছেন, "ইতি ষট্‌ পণ্ডিতাস্তস্য রাজ্ঞো লক্ষ্মণসেনস্য প্রসিদ্ধা ইতি রূঢ়িঃ।" কুম্ভকর্ণের ১৪৩৮ থেকে ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের শিলালিপি পাওয়া যায় (J. A. S. B., 1906, P. 165)। সুতরাং জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের সভায় ছিলেন, এই প্রসিদ্ধি পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাংলা দেশের অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে লেখা সনাতন গোস্বামী রচিত ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় আছে, "শ্রীজয়দেবসহচরেণ মহারাজ লক্ষ্মণসেন মন্ত্রীপ্রবরেণ উমাপতিধরেণ" ইত্যাদি। প্রায় ঐ সময়েই কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের (১৫৫৫-১৫৮৭খৃঃ) সভাকবি শুক্লধ্বজ 'গীতগোবিন্দে'র ১ম সর্গের ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন "লক্ষ্মণসেনসভাসদাং স্বরূপকথনেন নিজোৎকর্ষ প্রতিপাদনেন স্বকাব্যমাহাত্ম্যং সূচয়তি।" জয়দেব যে একজন গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন তা তাঁর গৌড়েন্দ্র-প্রশস্তি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেবের অবস্থানের প্রসিদ্ধিকে ঐতিহাসিক সত্য বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

ধোয়ী কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করবার পরে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্য লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে রচিত। সুতরাং 'গীতগোবিন্দ'ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই লেখা হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। Buhler কাশ্মীরে প্রাপ্ত 'গীতগোবিন্দে'র একটি পুঁথিতে লক্ষ্মণসেনের নামও দেখেছিলেন।

কোন কোন সূত্রের সাক্ষ্য উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ করুণাকর কর লিখেছেন, "It is written on the palm leaf records (Madla Panji) of Lord Jagannath that Ekajata Kamadeva known as Kamarnava who reigned form 1142 to 1156 A. D. never took his food without hearing the Gitagovinda." কিন্তু ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাব প্রমাণ করেছেন যে মাদলা-পঞ্জীর রচনা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে সুরু হয়েছিল। মাদলা-পঞ্জীতে প্রদত্ত ষোড়শ শতাব্দীর আগেকার ঘটনাগুলির বর্ণনা

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং জয়দেবের সময় সম্বন্ধে তার সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়।

তারপর বোম্বাইএর নির্ণয় সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত 'গীতগোবিন্দে'র একেবারে শেষে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়,

"ইত্থং কেলিততো বিহৃত্য যমুনাকুলে সমং রাধয়া
তদ্রোমাবলি মৌক্তিকাবলি যুগে বেণিভ্রমং বিভ্রতি।
তত্রাহ্লাদি কুচপ্রত্যাগফলয়োর্লিপ্সাবতোর্হস্তয়ো
র্ব্যাপারাঃ পুরুষোত্তমস্য দদতু স্ফীতাং মুদং সম্পদম্॥"

উড়িয়া পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, এই শ্লোকের শেষ চরণে উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেবের নাম করা হয়েছে, যিনি ১১৭০ থেকে ১১৯০ খৃঃ অবধি রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই শ্লোকটির রচনাশৈলী অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের এবং বাংলার কোন পুঁথিতে এটি পাওয়া যায় না। নিতান্ত অনাবশ্যকভাবে এটি কাব্যে স্থান পেয়েছে। সুতরাং শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। ৺সতীশচন্দ্র রায় শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। যাহোক্, এই শ্লোকটি থেকে 'গীতগোবিন্দে'র রচনাকাল নির্ণীত হয় না, কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়, এতে উল্লিখিত 'পুরুষোত্তম' কোন রাজা নন, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

তৃতীয়তঃ, চন্দ বরদাই রচিত 'পৃথ্বীরাজ রাসো' কাব্যের বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে এই দুটি ছত্র পাওয়া যায়,

জয়দ্দেব অঠ্ঠং কবী কবিরায়ং। জিনৈঁ কেবলং কিত্তি গোবিন্দ গায়ং॥

সাধারণের ধারণা চন্দ বরদাই পৃথ্বীরাজের সভাকবি ছিলেন। পৃথ্বীরাজ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে নিহত হন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে সুদূর আজমীঢ়ে যদি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য প্রচলিত হয়ে থাকে, তাহলে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে 'গীতগোবিন্দ' রচিত হওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু 'পৃথ্বীরাজ রাসো' কাব্যের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণের অধিকাংশই যে পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ, সে বিষয়ে সমস্ত বিশেষজ্ঞই একমত। কারও কারও মতে চন্দ বরদাই মোটেই পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক ছিলেন না এবং 'পৃথ্বীরাজ রাসো' কাব্যের সবটাই সপ্তদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের রচনা (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে 'কোশোৎসব-স্মারক গ্রন্থে'র ২৯-৬৬ পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ ওঝার প্রবন্ধ এবং জিনবিজয় মুনির লেখা 'পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহে'র ভূমিকা, পৃঃ ৮-১০ দ্রষ্টব্য)। অতএব 'পৃথ্বীরাজ-রাসো'র

উল্লেখের উপর নির্ভর করে যে জয়দেবের সময় নির্ধারণ করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য।

এই সমস্ত সূত্রের সাক্ষ্য বিশ্বাস করলে তার সঙ্গে 'গীতগোবিন্দে' উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধন, শ্রুতিধর ও ধোয়ীর উল্লেখের সামঞ্জস্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। যে শ্লোকে এঁদের উল্লেখ আছে, সেটি 'গীতগোবিন্দে'র সমস্ত পুঁথি ও টীকায় পাওয়া গিয়েছে, এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত 'রসিকপ্রিয়া' টীকায় এবং ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের পুঁথিতেও পাওয়া গিয়েছে। অতএব শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। সুতরাং জয়দেবের জীবৎকাল ও 'গীতগোবিন্দে'র রচনাকাল সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত আপাততঃ কোনমতেই খণ্ডিত হচ্ছে না।

আলোচনা শেষ করার আগে আর একটা কথা বলি। গীতগোবিন্দ এবং সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত শ্লোকগুলি ছাড়া জয়দেবের নামাঙ্কিত আর যে সমস্ত রচনা পাওয়া যায়, সেগুলির প্রাচীনতা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ না থাকার দরুণ এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ কোন কোন অঞ্চল ভিন্ন আর কোথাও তাদের প্রচলনের নিদর্শন না পাওয়ার জন্য সেগুলিকে মহাকবি জয়দেবের লেখা বলে গ্রহণ করা চলে না। ডাঃ করুণাকর কর Journal of the Kalinga Research Society তে জয়দেবের নামাঙ্কিত 'পীযূষলহরী' নামে যে একাঙ্ক নাটিকাটি প্রকাশ করেছেন, তার সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে।

॥ তিন ॥

লক্ষ্মণ-সংবৎ রহস্য

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করে না নিলে বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশ করা যাবে না। তাই এই অধ্যায়ে সেই বিষয়টিরই আলোচনা করছি।

কয়েকটি তারিখযুক্ত পুঁথি থেকে বিদ্যাপতির আবির্ভাবকালের হদিস্ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব তারিখের সঙ্গে বিক্রম সংবৎ, শকাব্দ প্রভৃতি অব্দের বদলে মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণসেন সংবৎ (সংক্ষেপে ল. সং) নামে একটি অব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এই লক্ষ্মণ সেন সংবৎকে খৃষ্টাব্দে রূপান্তরিত করার কোন সর্ববাদিসম্মত পদ্ধতি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কেন হয়নি, তা পরবর্তী আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে। এই লক্ষ্মণ সেন সংবতের প্রবর্তক কে, সে প্রশ্নও একটি রহস্য। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা এখানে কোন রকম আলোচনা করব না। তবে এ সম্বন্ধে ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর অভিমত (Sir Ashutosh Mukherjee Silver Jubilee Volumes, Vol. III, Orientalia, pp. 1-5 দ্রষ্টব্য) আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

লক্ষ্মণসেন সংবৎ মিথিলায় এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণসেন সংবৎ অনুসারে প্রতি বছর সুরু হয় মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে। মিথিলার আধুনিক পাঁজীর সাক্ষ্য অনুসারে ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ১১০৮ বছরের তফাৎ (J. A. S. B., 1926, p. 365)। সুতরাং ল. সং এর সঙ্গে ১১০৮ বছর যোগ করলেই খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাবে বলে কেউ কেউ ভাবতে পারেন। অনেকে ভেবেও ছিলেন তাই। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

লক্ষ্মণসেন সংবৎ সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত প্রথম করেন বেভারিজ। ১৮৮৮ সালের J. A. S. Bতে 'The Era of Lachhman Sen' নামে এক প্রবন্ধ লিখে তিনি আবুল ফজলের আকবরনামাতে উদ্ধৃত একটি

ফর্‌মানের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফর্‌মানটির অংশবিশেষের ইংরেজা অনুবাদ এই,

"In the country of Bang, dates are calculated from the beginning of the reign of Lachhman Sen. From that period till now there have been 465 years."

বেভারিজ লিখেছেন, "Then the forman goes on to mention the Salivahan and Vikramaditya eras and states that 1506 years of the Salivahan, and 1641 of the Vikramaditya era have elapsed."

সুতরাং আবুল ফজল উদ্ধৃত এই ফরমানে পাওয়া গেল, ৪৬৫ লক্ষ্মণসেন সংবৎ = ১৫০৬ শালিবাহন অব্দ বা শকাব্দ = ১৬৪১ বিক্রম সংবৎ। শকাব্দের সঙ্গে ল. সং এর ১০৪১ বছরের তফাৎ।

এর পরে কীলহর্ণ ১৮৯০ সালের Indian Antiquary তে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। কীলহর্ণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আকবর নামার ফর্‌মানেই লক্ষ্মণ সেন সংবৎ সম্বন্ধে সঠিক খবর দেওয়া হয়েছে, মিথিলার আধুনিক পাঁজীগুলির সাক্ষ্য ভুল। কীলহর্ণ তাঁর মতের সমর্থনে দেখান যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts এ বর্ণিত একটি পুঁথিতে একই সঙ্গে ৫০৫ ল. সং ও ১৫৪৬ শক এই দুই অব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এখানেও শকাব্দের সঙ্গে ল. সং এর ১০৪১ বছরের তফাৎ। এর থেকে কীলহর্ণ সিদ্ধান্ত করেন যে ১০৪১ শকাব্দ থেকেই ল. সং সুরু হয়েছিল। কীলহর্ণ তাঁর সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জ্যোতিষ-গণনারও আশ্রয় নেন।

কীলহর্ণের এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালের অধিকাংশ গবেষকই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই একটা ভুল করেছেন। ল. সং যদি কীলহর্ণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকেই সুরু হয়ে থাকে, তাহলে ল. সং এর প্রত্যেক বছরের প্রথম তিন মাসের সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ১১১৯ বছরের ব্যবধান হবে, শেষ নয় মাসের অর্থাৎ অধিকাংশেরই সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ব্যবধান হবে ১১২০ বছরের। অথচ কীলহর্ণের অনুবর্তীরা সেখানেই কোন ল. সং এর বছর পেয়েছেন তার সঙ্গে ১১১৯ বছর যোগ করে "খৃষ্টাব্দে রূপান্তরিত" করেছেন, যেখানে মাস উল্লিখিত আছে, সেখানেও ব্যতিক্রম

হয়নি। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ জায়গায় ১১২০ বছর যোগ করাই উচিত ছিল।

যাহোক্, কীলহর্ণের সিদ্ধান্তেও কিছু ভুল আছে। ল. সং ১১১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর বা কার্তিক মাসে সুরু হয়েছিল বলে তিনি যে ধারণা করেছিলেন, তার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। একটি মাত্র পুঁথির তারিখ তিনি পেয়েছিলেন, ৪৩৩ ল. সং কার্তিক বদি ৭ শুক্র (বার)। জ্যোতিষগণনা করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাস, বদি ৭ তিথি এবং শুক্রবারের যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এখানে খৃষ্টাব্দের সঙ্গে ল. সং এর ১১১৮ বছরের তফাৎ হয়। এই গোলযোগ লক্ষ্য করে কীলহর্ণ এক্ষেত্রে ৪৩৩ ল. সংকে "current year" ধরেছেন। এই গোঁজামিলের মধ্যে না গিয়ে তিনি যদি ল. সং এর সঙ্গে ১১২০ বছর যোগ করতেন; তাহলে দেখতে পেতেন ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দেও কার্তিক মাস, বদি ৭ তিথি এবং শুক্রবারের যোগাযোগ হয়েছিল। ঐদিন ২৭শে অক্টোবর তারিখ ছিল। কীলহর্ণ অন্য যে পাঁচটি তারিখ বিশ্লেষণ করেছিলেন, প্রত্যেকটিতেই ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ১১২০ বছরের তফাৎ হয়। যথা,

৪২৪ লসং পৌষ বদি ১০ শুক্র = ৪ঠা জানুয়ারী, ১৫৪৪ খৃঃ

৩৭৬ লসং পৌষ বদি ১৩ বুধ = ১৩ই জানুয়ারী, ১৪৯৬ খৃঃ

৩১৭ লসং চৈত্র শুদি ১ গুরৌ = ৭ই মার্চ, ১৪৩৭ খৃঃ

৩৯৯ লসং বৈশাখ বদি ৪ চন্দ্র = ১৮ই এপ্রিল, ১৫১৯ খৃঃ

৭৪ লসং বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ = ১৯শে মে, ১১৯৪ খৃঃ

সুতরাং কীলহর্ণ যে সব তথ্য পেয়েছিলেন, তার ভিত্তিতেও ১১১৯ খৃঃ র অক্টোবর মাসে ল. সং সুরু হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা চলে না।

কীলহর্ণের পর প্রমথনাথ মিশ্র ১৯২৬ সালের J.A.S.B. তে ল. সং সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি ১৬টি বার-মাস-তিথি যুক্ত ল. সং এর তারিখ জ্যোতিষগণনার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখান যে তার মধ্যে ৯টি তারিখ কীলহর্ণের ফর্মুলা অনুসারে মিলছে, কিন্তু বাকী ৭টি তারিখকে কোনমতেই মেলানো যায় না। এইভাবে গণনা করে তিনি লেখেন, "These results rather point to two different epochs of the Laksmana samvat era and make it more difficult to find a common epoch by which all the dates may work out satisfactorily."

এর পরে ল. সং সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল—১৯৩৪ সালের J. B. O. R. S.এ। জয়সোয়ালের আলোচনার একটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে এই যে তিনি প্রমথনাথ মিশ্রের মূল্যবান গবেষণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। যাহোক্, জয়সোয়ালের আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি অনেকগুলি পুঁথির মধ্যে ল. সং ও অন্য অব্দের একত্র উল্লেখ দেখিয়েছেন। তিনি এমন ১৮টি উল্লেখের এক তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি এই রকম,

ল. সং	উল্লিখিত অন্য অব্দ	[খৃষ্টাব্দ]	খৃষ্টাব্দের সঙ্গে ল. সং এর কত বছরের তফাৎ
৩৭৪	১৪১৬ শকাব্দ	[১৪৯৪]	১১২০
৪৯৫	১৬৭৩ বিক্রম সংবৎ	[১৬১৫]	১১২০
৪৯৯	১৫৪১ শকাব্দ	[১৬১৯]	১১২০
৫০৫	১৫৪৬ শকাব্দ	[১৬২৪]	১১১৯
৫০৫	১৫৪৬ শকাব্দ	[১৬২৪]	১১১৯
৫২২	১৫৫৯ শকাব্দ	[১৬৩৭]	১১১৫
৫৫৬	১৫৯৩ শকাব্দ	[১৬৭১]	১১১৫
৫৮৫	১৬১৯ শকাব্দ	[১৬৯৭]	১১১২
৬১৪	১৬৪৬ শকাব্দ	[১৭২৪]	১১১০
৬২৪	১৬৫৯ শকাব্দ	[১৭৩৭]	১১১৩
৬৩৩	১৬৬৩ শকাব্দ	[১৭৪১]	১১০৮
৬৪১	১১৫৬ সন	[১৭৪৮]	১১০৭
৬৫৩	১৬৮২ শকাব্দ ও ১৮১৭ বিক্রম সংবৎ	[১৭৬০]	১১০৭
৭২৭	১৭৫৯ শকাব্দ, ও ১৮৯৪ বিক্রম সংবৎ	[১৮৩৭]	১১১০
৭৩৫	১৭৬৫ শকাব্দ	[১৮৪৩]	১১০৮
৭৪২	১৭৭১ শকাব্দ ও ১৯০৫ বিক্রম সংবৎ	[১৮৪৯]	১১০৭
৭৪৩	১৭৭৩ শকাব্দ, ১৯০৭ বিক্রম সংবৎ ও ১২৫৮ সন	[১৮৫১]	১১০৮
৭৮৫	১৯৫০ বিক্রম সংবৎ	[১৮৯২]	১১০৭

জয়সোয়াল ল. সং এর উদ্ভব সম্বন্ধে কীলহর্ণএর সিদ্ধান্তকেই অভ্রান্ত বলে মনে করেছিলেন। অথচ উপরোক্ত তারিখগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ব্যবধান ১১২০ বা ১১১৯ বছর নয়। এগুলির মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেগুলিতে ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম। এই সমস্ত গোলযোগ দেখে জয় সোয়াল বলেন, "In the time of Akbar, beginning with 1556 A. D., the Fasli era—a lunar reckoning—was promulgated...In that epoch Lakshmanasena years receive a lunar (instead of the earlier luni-solar) calculation...That La. Sam. years were so treated becomes clear from the varying, gradually increasing difference in the La Sam. years..."। এই মত যে শুধু কাল্পনিক তা নয়, যে তথ্য এর ভিত্তি, তার সঙ্গেও এর সঙ্গতি নেই। জয়-সোয়াল যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ব্যবধান দিন দিন হ্রাস পেয়েছে বলে দেখা যায় না। ৫৮৫ ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ১১১২ বছরের তফাৎ, ৬১৪ ল. সং এ এই ব্যবধান কমে দাঁড়াল ১১১০ বছর, আবার ৬২৪ ল. সং-এ ব্যবধান বেড়ে হল ১১১৩ বছর, আবার ৬৪১ ল. সং এ কমে হল ১১০৭ বছর। অতএব এ মত টেঁকে না।

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত History of Bengal (Vol. I) এ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিশদ ভাবে বিচার করে জয়সোয়ালের মতের অযৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "This theory is not, however, borne out by facts as the following examples will show :

La Sam	Year in A. D. as counted by the equivalent Saka era.	Difference
(1) 505	1624	1119
(2) 522	1637	1115
(3) 614	1724	1110
(4) 624	1737	1113
(5) 633	1741	1108
(6) 727	1837	1110

It will be seen that in one case (Nos. 1 and 2), within a period of seventeen years, there was a difference of four years in the reckoning of *La Sam*, whereas in another case (Nos. 3 and 6) there was no difference after an interval of 113 years, Again, during ten years (Nos. 3 and 4), the difference was three years, but during the next nine years (4 and 5) the difference is one of five years. Besides, the difference is not one of gradual increase or decrease with each passing year, as Nos. 3-6 would show."

ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের কত বছর ব্যবধান ধরা উচিত, সে সম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, "the initial year of the Era, as reckoned at different times and places, varied between 1108 and 1120 A. D." ডঃ মজুমদারের এই সিদ্ধান্ত ল. সং সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে তার জটিল স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছে।

ডঃ মজুমদারের পরে ডঃ সুভদ্র ঝা তাঁর সম্পাদিত 'Songs of Vidyapati'র (১৯৫৪) ভূমিকায় এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ডঃ ঝা কীলহর্ণ ও জয়সোয়ালের মতকে আরও নানা যুক্তি দেখিয়ে খণ্ডন করেছেন। তিনি আরও তিনটি পুঁথি থেকে ল. সং ও শকাব্দের একত্র উল্লেখের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। এগুলি নীচে তালিকার আকারে উল্লিখিত হল,

ল. সং	শকাব্দ	[খৃষ্টাব্দ]	ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের কত বছরের তফাৎ
৫৬৬	১৬০৫	[১৬৮৩]	১১১৭
৬৩৮	১৬৬৭	[১৭৪৫]	১১০৭
৬৪৯	১৬৭৮	[১৭৫৬]	১১০৭

দীর্ঘ আলোচনার পরে ডঃ সুভদ্র ঝা শেষ পর্যন্ত ল. সং সম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্তকেই যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নিয়েছেন।

এবার এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করব। ডঃ রমেশচন্দ্র

মজুমদারের সিদ্ধান্তের প্রথম অংশ "the initial year of the Era, as reckoned at different times and places, varied" এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু "between 1108 and 1120 A. D." এই অংশ আমরা মানতে পারিনা। তার কারণ একে একে নিবেদন করছি। Cunningham তাঁর Indian Eras বইতে লিখেছেন যে তিনি মিথিলাতে কতকগুলি পুরোণো পাঁজী পেয়েছেন, তাতে ল. সং এর আদি বছর (initial year) ১১০৫, ১১০৬, ১১০৯ প্রভৃতি বিভিন্ন খৃষ্টাব্দে পড়ছে। সুতরাং ডঃ মজুমদারের "Varied between 1105 and 1120 A D" লেখা উচিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে বিদ্যাপতিকে প্রদত্ত বলে কথিত শিবসিংহের নামাঙ্কিত দানপত্রে ২৯৩ ল. সং = ১৩২১ শক দেখা যায়; এখানেও ল. সং এর সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ১১০৬ বছরের তফাৎ।

কিন্তু ল. সং এর আদি বছর (initial year) কে ১১০৫-১১২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও সীমাবদ্ধ রাখা চলে না। কেন চলে না, তার কারণস্বরূপ আমরা দুটি প্রাচীন পুঁথির পুষ্পিকার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

প্রথমটি হচ্ছে ভারত সরকার সংগ্রহের ৪০২৬ নং পুঁথি। এটি হচ্ছে কৃত্যকল্পতরু নামে একটি স্মৃতিগ্রন্থের দানকাণ্ডের পুথি। ৺মনোমোহন চক্রবর্তী ১৯১৫ সালের J. A. S. B র ৩৫৭-৫৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এই পুঁথির লিপিকাল সূচক অংশটি উদ্ধৃত করেন। আমরাও এই অংশটি অবিকল উদ্ধৃত করছি,

"লসং ৩৭৪ কার্ত্তিক শুদি ৫ বুধে অজিনৌলিগ্রামে সমস্তপ্রক্রিয়াবিরা...... নে মহাবর কুমার শ্রীমদ্গদাধরসিংহদেবপাদানামাজ্ঞয়া শ্রীশুভপতিনা লিখিতমিদং পুস্তকমিতি ॥ শাকে ১৪২৬ ॥"

এই পুঁথি এখন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় আছে। আমি সেখানে গিয়ে পুঁথিটি দেখেছি। পুঁথির ১৩১ ক পৃষ্ঠায় উপরোদ্ধৃত অংশটি আছে। ল. সং এবং শকাব্দের অঙ্কে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই। পুঁথির শেষে আছে "গত লক্ষ্মণসেনদেবীয় চতুঃসপ্তাধিক শতত্রয়াব্দীয় কার্ত্তিক-শুক্লপঞ্চম্যাং রৌহিণেয়ে"।

এই পুঁথি থেকে পাওয়া গেল ৩৭৪ ল. সং = ১৪২৬ শকাব্দ। এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হবার জন্যে আমি পুষ্পিকায় উল্লিখিত মাস, তিথি ও বার জ্যোতিষ-গণনায় যাচাই করে নিয়েছি। তার ফলে দেখলাম ১৪২৬ শক

এখানে অতিক্রান্ত বছর (expired year) নয়, চল্‌তি বছর (current year)। ১৪২৬ শকাব্দের চল্‌তি বছরে অর্থাৎ ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাসের শুদি ৫ বা শুক্লা পঞ্চমী তিথি বুধবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ২৫শে অক্টোবর। সুতরাং এখানে খৃষ্টাব্দের সঙ্গে ল. সং এর ১১২৯ বছরের তফাৎ।

দ্বিতীয় পুঁথিটি হচ্ছে নেপাল রাজদরবারের ৩৫৮ নং পুঁথি—ভাগবত দশম স্কন্ধের। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর Catalogue of the palm-leaf and selected paper manuscripts of Nepal Durbar Libraryর Vol. I এ ১৩ পৃষ্ঠায় এই পুঁথির সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র লিখেছেন,

"ভাগবতম্

(দশমস্কন্ধমাত্রম্।) মৈথিলীমক্ষরম্।

ল. সং ৩৯৭। শকাব্দাঃ ১৩৯৯। লিপিরিয়ং শ্রীমদুমাপতিশর্ম্মণাম্।"

এখানে ল. সংএর সঙ্গে শকাব্দের মাত্র ১০০২ বছরের তফাৎ দেখে আমি এই পুঁথি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আগ্রহী হই এবং এর লিপিকাল যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করি। ১৯৫৬ সালে আমার একজন গবেষক বন্ধু রাজদরবার ও অন্যান্য জায়গার পুঁথি পরীক্ষার জন্যে নেপালে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে উপরোক্ত ৩৫৮ নং পুঁথির লিপিকালটি ভালভাবে পরীক্ষা করতে ও তার সম্পূর্ণ পুষ্পিকাটি অবিকল নকল করে আমায় পাঠাতে অনুরোধ করি। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করে ঐ পুঁথির পুষ্পিকা অবিকল নকল করে দিয়েছেন। এই নকল নীচে উদ্ধৃত হল,

"মিথিলামহীমহেন্দ্র......শাকে সংবৎসরে ১৩৯৯ তথা ল. সং ৩৯৭ সংবৎসরে রচিতমিদম্। শুভমস্তু। লিপিরিয়ং কবিচক্রবর্ত্তী শ্রীমদুমাপতিশর্ম্মণাম্।"

১৩৯৯ শকাব্দ=১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ। অতএব এক্ষেত্রে খৃষ্টাব্দের সঙ্গে ল. সং এর ব্যবধান ১৪৭৭ – ৩৯৭ = ১০৮০ বছর।

এই দুই নবাবিষ্কৃত প্রমাণের বলে আমরা এখন অনায়াসেই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্তকে সংশোধন করে বলতে পারি, মিথিলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের ল. সং প্রচলিত ছিল এবং খৃষ্টাব্দের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ১০৮০ বছর থেকে সুরু করে ১১২৯ বছর পর্যন্ত হত।

কিভাবে এবং কবে থেকে লক্ষ্মণ সংবতের মধ্যে এই গোলযোগ দেখা দিল, তা আমরা বলতে পারি না। তবে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই মিথিলায় অন্ততঃ তিন রকমের ল. সং প্রচলিত হয়েছিল।

প্রথম ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের পার্থক্য ছিল ১১২০ বছর। আবুল ফজলের আকবরনামায় দেখি ৪৬৫ ল. সং=১৫০৬ শকাব্দ। জয়সোয়ালের তালিকায় উল্লিখিত পুঁথিগুলিতে দেখি ৪৯৫ ল. সং=১৬১৫ শকাব্দ, ৪৯১ ল. সং=১৫৪১ শকাব্দ, ৫০৫ ল. সং=১৫৪৬ শকাব্দ; এগুলি এই প্রথম ল. সং এর দৃষ্টান্ত। অবশ্য এদের মধ্যে কোথাও শকাব্দের সঙ্গে ১০৪১ বছরের আবার কোথাও ১০৪২ বছরের তফাৎ। কিন্তু এরকম হবেই, কারণ ল. সং সুরু হত মাঘ মাসে আর শকাব্দ সুরু হত চৈত্র মাস থেকে। সুতরাং প্রতি ল. সং এর প্রথম দুমাস শকাব্দের সঙ্গে ১০৪১ বছর এবং শেষ আটমাস ১০৪২ বছর পার্থক্য হত, কিন্তু খৃষ্টাব্দের সঙ্গে প্রায় সারা বছরই ১১২০ বছর পার্থক্য থাকত, কারণ দুই এরই আরম্ভ জানুয়ারী মাসে।

এই ল. সং এর প্রচলন অন্য জায়গা থেকেও দেখনো যায়। এর কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

নেপাল দরবার সংগ্রহের শ্রীদত্তের 'একাগ্নিদানপদ্ধতি'র একটি পুঁথির (Nep. cat. I, p. 129 দ্রঃ) লিপিকাল' "ল. সং ২৯৯ পৌষ শুদি ৯ চন্দ্রে"। ২৯১+১০২০=১৪১৯ খৃষ্টাব্দে পৌষ শুদি ৯ তিথি সোমবার পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ২৫ শে. ডিসেম্বর।

'সেতুদর্পনী'র একটি পুঁথির (J. A. S. .B, 1915, p. 426 দ্রঃ) লিপিকাল "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবীয়ৈকবিংশত্যধিক শতত্রয়তমাব্দে কার্ত্তিকামবস্যায়াং শনৌ" (৩২১ ল. সং এর কার্তিক অমাবস্যা শনিবার)। ৩২১+১০২০=১৪৪১ খৃষ্টাব্দে কার্তিক অমাবস্যা শনিবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ১৪ই অক্টোবর।

মহাভারতের কর্ণপর্বের একটি পুঁথির (J. B. O. R. S., 1924, pp. 42-43 দ্রঃ) লিপিকাল "ল. সং ৩২৭ ভাদ্র শুদি ১০ রবৌ।" ল. সং ৩২৭+১০২০=১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র শুদি ১০ তিথি রবিবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ২০শে আগষ্ট।

মিথিলার হাবিডিহা গ্রামের একটি শিলালিপির (J. A. S. B., 1926, p. 368 দ্রঃ) তারিখ

> অব্দে নেত্র শশাঙ্ক পক্ষ গণিতে শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে
> মাসি শ্রাবণ সজ্ঞকে মুনিতিথৌ স্বাত্যাং গুরৌ শোভনে।

(২১২ ল. সং শ্রাবণ শুদি ৭ বৃহস্পতিবার স্বাতী নক্ষত্র)

২১২+১০২০=১৩৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণ মাসের শুদি ৭ তিথি বৃহস্পতিবার পড়েছিল এবং ঐদিন স্বাতী নক্ষত্রও ছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ৩০শে জুলাই।

কীলহর্ণ যে তারিখগুলি উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলির মধ্যেও এই প্রথম ল. সং এরই দৃষ্টান্ত মেলে।

দ্বিতীয় ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের পার্থক্য ছিল ১১২৯ বছর। পূর্বোল্লিখিত কৃত্যকল্পতরুর পুঁথির লিপিকালে এর দৃষ্টান্ত পাই। এবারে অন্য জায়গা থেকে এই দ্বিতীয় ল. সং এর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি।

নেপাল দরবারের একটি ভাগবতটীকার পুঁথির (Nep. Cat., II, p. 63 দ্রঃ) তারিখ "ল. সং ৩৯৩ মাঘ শুদি ১৪ শনৌ"। ৩৯৩+১১২৯=১৫২২ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের শুদি ১৪ তিথি শনিবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ১১ই জানুয়ারী।

নেপাল দরবারের রক্ষিত রুদ্রধরের ব্রতপদ্ধতির একটি পুঁথির (Nep. Cat., II, p. 95 দ্রঃ) লিপিকাল "লসং ২৮৬ জ্যেষ্ঠস্য কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং বুধবাসরে"। ২৮৬+১১২৯=১৪১৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি বুধবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ৫ই জুন।

নেপাল দরবারেরই একটি মাঘকাব্যটীকার পুঁথির (Nep. Cat., II, p. 95 দ্রঃ) লিপিকাল "লসং ৪২৮ মাঘ শুক্লপূর্ণিমায়াং গুরৌ।' ৪২৮+১১২৯=১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি 'গুরু'বার অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ১৪ই জানুয়ারী।

বিদ্যাপতির নিজের হাতে লেখা বলে কথিত ভাগবতের পুঁথির (J. A. S. B., 1915, p. 392 দ্রঃ) লিপিকাল "লসং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে"। ৩০৯+১১২৯=১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণ মাসের শুদি ১৫ বা পূর্ণিমা তিথি 'কুজ' বা মঙ্গলবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ৫ই আগষ্ট।

নেপাল দরবার সংগ্রহের পার্বণশ্রাদ্ধবিধি নামে গ্রন্থের এক পুঁথির (Nep. Cat., I, p. 20) লিপিকাল "লসং ১৭১ মার্গ বদি ৩ চন্দ্রে"। ১৭১+১১২৯= ১৩০০ খৃষ্টাব্দে মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের বদি ৩ তিথি সোমবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ৩১শে অক্টোবর।

নেপাল দরবারের নারসিংহপুরানমে'র একটি পুঁথির (Nep. Cat, I, p. 29 দ্রঃ) লিপিকাল "লসং ৩৩৯ শ্রাবণ শুদি ষষ্ঠ্যাং রবিবাসরে"। ৩৩৯+

১১২৯=১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণ মাসের শুদি ষষ্ঠী তিথি রবিবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ২৪ শে জুলাই।

নেপাল দরবারের 'তাৎপর্যপরিশুদ্ধি' (Nep. Cat., I, p. 31 দ্রঃ) নামে একটি গ্রন্থের এক পুঁথির লিপিকাল "লসং ৩৩৯...ভাদ্র শুদি ষষ্ঠ্যাং কুজে"। ৩৩৯+১১২৯=১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র মাসের শুদি ৬ তিথি মঙ্গলবার পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ২৩শে আগষ্ট।

ল. সং সম্বন্ধে কীল্‌হর্ণের সিদ্ধান্তকে যাঁরা এখনও অভ্রান্ত মনে করেন, তাঁদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, উপরোল্লিখিত তারিখগুলির মধ্যে একটিরও মাস-তিথি-বার কীল্‌হর্ণের ফর্মুলা অনুসারে মেলে না। উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, অন্ততপক্ষে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মিথিলার বহু জায়গায় এই দ্বিতীয় ল. সং প্রচলিত ছিল, যার সঙ্গে খৃষ্টাব্দের পার্থক্য ছিল ১১২৯ বছর।

তৃতীয় ল. সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের পার্থক্য ছিল ১০৮০ বছর। এর দৃষ্টান্ত আমরা নেপাল দরবারের পূর্বোক্ত ভাগবত দশম স্কন্ধের পুঁথিতে পেয়েছি। এবার অন্যত্র থেকে এই ল. সং ব্যবহারের নিদর্শন দেখাচ্ছি।

নেপাল দরবারের 'স্মৃতি পরিভাষা' নামে একটি গ্রন্থের পুঁথির (Nep. Cat., I, p. 32 দ্রঃ) লিপিকাল "লসং ৩৮৮ শ্রাবণ কৃষ্ণৈকাদশ্যাং শুক্রে"। ৩৮৮+১০৮০=১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণমাসের (পুর্ণিমান্ত) কৃষ্ণা একাদশী তিথি সোমবারে পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ১৫ই জুলাই।

পক্ষধর লিখিত বিষ্ণুপুরাণের এক পুঁথির (J. A. S. B., 1926, p. 373 দ্রঃ) লিপিকাল ৩৪৫ ল. সং অগ্রহায়ণ শুদি ৬ বৃহস্পতিবার,

> "বাণৈর্বেদযুতৈঃ সশম্ভুনয়নৈঃ সংখ্যাং গতে হায়নে
> শ্রীমদ্‌গৌড়মহীভুজো গুরুদিনে মার্গে চ পক্ষে সিতে।
> ষষ্ঠ্যান্তামমরাবতিমধিবসন্‌ যা ভূমিদেবালয়া
> শ্রীমৎপক্ষধরঃ পুস্তকমিদং শুদ্ধং ব্যলেখীদ্রুতম্‌।"

৩৪৫+১০৮০=১৪২৫ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণের মাসের শুদি ৬ তিথি ১৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ৪টা ৫ মিনিটের পর থেকে বাকী সময় অবধি ছিল (উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে 'ল. সং'এর বদলে 'শ্রীমদ্‌গৌড়মহীভুজো' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এর থেকে বোঝা যায়, অন্য কোন লক্ষ্মণসেন যদি এই সংবতের

প্রবর্তন করে থাকেন, তাহলেও কালক্রমে এর সঙ্গে বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেনের নাম যুক্ত হয়ে গিয়েছে।)

এই দীর্ঘ আলোচনার পরে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মিথিলায় অন্ততঃ তিন রকমের ল. সং প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ল. সং এর মধ্যে আরও জটিলতা সৃষ্টি হয়। জয়সোয়ালের তালিকার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই জটিলতা ছিল। কানিংহাম বিভিন্ন পাঁজীতে অন্ততঃ চার রকমের ল.সং দেখেছিলেন। কীল্‌হর্ণ লিখেছিলেন, "the modern almanacs of Tirhut, disagreeing as they do among themselves" ইত্যাদি।

এই কারণে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সব তারিখে ল. সং এর উল্লেখ দেখা যায়, সে সেই ক্ষেত্রে অন্য অব্দের উল্লেখ না থাকলে সঠিক বছর বার করা খুবই শক্ত। কিন্তু ষোড়শ বা তার পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে ল. সং এর সঙ্গে যদি মাস, তিথি ও বার উল্লিখিত থাকে, তাহলে জ্যোতিষ-গণনা করে বছরটি এক রকম ঠিক করা যায়। কিন্তু যেখানে ল. সং এর সঙ্গে তিথি-মাস ও বার উল্লিখিত হয়নি, সেখানে 'ল. সং+১০৮০' এবং 'ল. সং+১১২৯' খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ বছর পড়েছিল বলে ছেড়ে দিতে হবে।

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত জ্যোতিষ গণনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য স্বামী কান্নু পিল্লাই এর Indian Ephemeries থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কোন একটি দিনের তিথি নির্ণয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষে দুরকম পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে স্বামী কান্নু পিল্লাই লিখেছেন, "The tithi or nakshatra which is identified with a day is that tithi or nakshatra which was current at sunrise on the day in question······Nevertheless it is the case that in numerous well-attested inscriptions, the tithi or nakshatra quoted is not that which was current at sunrise on the day in question but that which commenced at some part of the day and would be current at sunrise only on the next day" (Indian Ephemeries, Vol. I, Pt. I, p. 5) আমাদের ব্যবহৃত নিদর্শনগুলিতে এই দুরকম পদ্ধতিরই দৃষ্টান্ত আছে।

॥ চার ॥

বিদ্যাপতি

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য তার নিজস্ব রূপ নিয়ে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হল। এই শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই শতাব্দীর আর একজন কবি বাঙালী না হয়েও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গেছেন। তিনি হচ্ছেন মৈথিল কবি বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতির পদ শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করেছিলেন। বাংলার আরও শত শত ভক্ত ও কাব্যরসিক বিদ্যাপতির পদের অমৃতরসে মুগ্ধ হয়েছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথম প্রমাণ করেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। তারপর বহু মনস্বী গবেষক বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বিদ্যাপতির বহু অজ্ঞাতপূর্ব রচনাও আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়। ক্রমশঃ বিদ্যাপতির দেশের লোকেরাও সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁরা বিদ্যাপতির উপর বাংলার দাবীকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত সমস্ত রচনার উপরেই আজ নিজেদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং অতিউৎসাহে বাঙালী কবি গোবিন্দদাসকেও মৈথিল বলে দাবী করে বসেছেন। এই অবস্থায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম নির্ণয় প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা বেশ একটু দুঃসাহসের কাজ।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা কেন করছি, তার কিছু কৈফিয়ত এখানে দিতে চাই। প্রথমতঃ, বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত যে সব ভাল ভাল পদ তাঁর কবিখ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের অধিকাংশ বাংলা দেশ থেকেই আবিষ্কৃত। মিথিলা ও নেপালে বিদ্যাপতির যেসব পদ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি এত উঁচুদরের নয়। দ্বিতীয়তঃ, এইসব শ্রেষ্ঠ পদের সমস্তই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির লেখা নয়। যে সমস্ত পদের সঙ্গে মিথিলা বা নেপালে প্রাপ্ত পদের সম্পূর্ণ বা আংশিক মিল আছে, এবং যাদের মধ্যে বিদ্যাপতির সমসাময়িক

রাজারাজড়াদের নাম আছে—সেগুলিকে বাদ দিলে আর যে সমস্ত পদ থাকে, তাদের নির্বিচারে মৈথিল বিদ্যাপতির লেখা বলে চালানো যায় না। অথচ সংখ্যায় এই জাতীয় পদই বেশী এবং এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অন্য কবির লেখা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপতির যে পদসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাতে তিনি মৈথিল বিদ্যাপতির প্রতি প্রচুর পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও ২০৩ টি পদ মৈথিল বিদ্যাপতির লেখা বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। অন্যান্য পদের মধ্যে 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত পীতাম্বর দাসের অষ্টরসব্যাখ্যায় ও পদরসসার, কীর্তনানন্দ প্রভৃতি পদসঙ্কলনগ্রন্থে এবং পদকল্পতরুর অনেকগুলি পুঁথিতে 'শেখর' ভণিতায় পাওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন পাঠ এবং অধিকাংশ আকরগ্রন্থের সাক্ষ্য—দুই বিচারেই পদটি বিদ্যাপতির লেখা নয় বলে প্রমাণিত হয়। আর একটি বিখ্যাত পদ 'কি পুছসি অনুভব মোয়' পদকল্পতরুর সমস্ত পুঁথিতে 'কবিবল্লভ' ভণিতায় পাওয়া যাচ্ছে এবং এর অংশবিশেষ উজ্জ্বলনীলমণির অংশ-বিশেষের আক্ষরিক অনুবাদ, তা সত্ত্বেও এটিকে জোর করে বিদ্যাপতির বলে চালানোর কোন অর্থ হয় না। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত 'মাধব বহুত মিনতি কর তোয়'; 'জতনে জতেক ধন পাপে বটোরল' এবং 'তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম' এই তিনটি প্রার্থনার পদ তাঁর কবিখ্যাতির অমরত্ব লাভে অনেকখানি সাহায্য করেছে। অথচ এই তিনটি পদ বা এদের অনুরূপ ভাবের কোন পদ মিথিলা বা নেপালে পাওয়া যায়নি। পদ তিনটি পড়লে মনে হয়, এগুলি কোন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্তের লেখা। মৈথিল বিদ্যাপতি যে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন, তার পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নেই। মৈথিল পণ্ডিতেরা বিদ্যাপতির বৈষ্ণবতা স্বীকার করেন না। মিথিলা ও নেপালে প্রাপ্ত তাঁর অসন্দিগ্ধ পদগুলিতে ভক্তিভাবের কোন চিহ্ন মেলেনা। সুতরাং এই পদ তিনটি তাঁর লেখা বলে স্বীকার করতে বাধা আছে। আসল কথা বিদ্যাপতি মহাকবি ছিলেন বলে অন্য কবিরা নিজেদের পদে বিদ্যাপতির নাম যোগ করে দিয়েছেন, যেমন করে কালিদাসের নামে অনেক লোক নিজেদের গ্রন্থ চালিয়ে দিয়েছেন। গায়েন বা লিপিকরদের হস্তক্ষেপের ফলেও অন্য কবির অনেক পদ ভণিতা পালটে বিদ্যাপতির নামে চলে গেছে। বিদ্যাপতি নামের একাধিক বাঙালী কবিও ছিলেন। সুতরাং বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত যে পদসমষ্টি আমরা বাংলাদেশে পাচ্ছি, তা এক লোকের লেখা নয়, তার মধ্যে এক বিরাট কবি-

গোষ্ঠীর লেখা মিশে আছে। মূল কবি বিদ্যাপতি ভিন্ন এই গোষ্ঠীর আর প্রত্যেকটি কবিই বাঙালী। মৈথিল বিদ্যাপতি এই কবিগোষ্ঠীর প্রবর্তক। তাঁর বহু ভাল ভাল পদ বাংলায় সংরক্ষিত ছিল বলেই লুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই সমস্ত কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত কোন আলোচনায় বিদ্যাপতির প্রসঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, বাংলা সাহিত্যের উপর বিদ্যাপতির প্রভাবকে এত-দিন অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে। বিদ্যাপতির পদের অনুকরণে আমাদের বিশাল ও সমৃদ্ধ ব্রজবুলীসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, এই ধারণা আগে প্রায় সকলেই পোষণ করতেন, এখনও অনেকে করছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির রচনা বাংলাদেশে আসবার আগেও বাংলাদেশে ব্রজবুলী ও তার জ্ঞাতি অবহট্ট ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হত। কৃত্তিবাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক বা ঈষৎ পরবর্তী। তাঁর রামায়ণের কোন কোন সুপ্রাচীন পুঁথিতে ব্রজবুলী ভাষায় লেখা 'রাম-রাস' পাওয়া গিয়েছে। চণ্ডীদাসের ভণিতাতেও কয়েকটি ব্রজবুলী পদ মিলেছে। বাঙালী পণ্ডিত গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির আগে রচিত হয়, ১৪২৫ খৃষ্টাব্দের পরে এর রচনাকাল কিছুতেই নয়, এতে এই অবহট্ট ভাষার পদাংশটি উদ্ধৃত হয়েছে,

রাই দোহড়ী পঢ়ন শুনি হসিউ কাহ্ন গোআল। বৃন্দাবন ঘন কুঞ্জঘর চলিউ কমন রসাল॥

যাহোক্, এসমস্ত বিষয়ের আলোচনায় আর কালক্ষেপ না করে এখন বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করা যাক।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নিয়ে আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন রাজ-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তারপর সার গ্রীয়ার্সন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনন্দন ঠাকুর, ডঃ উমেশ মিশ্র, ডঃ শহী-দুল্লাহ, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ডঃ জয়কান্ত মিশ্র, ডঃ সুভদ্রা ঝা এবং আরও অনেক মনস্বী গবেষক এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়টির সুষ্ঠু ও সর্ববাদিসম্মত মীমাংসা সম্ভব হয়নি।

অথচ বিদ্যাপতির জীবৎকাল সম্বন্ধে সমসাময়িক দলিলের কিছু অভাব নেই। বিদ্যাপতির নাম ও তারিখ যুক্ত কয়েকটি পুঁথি পাওয়া গেছে। আরও কয়েকটি পুঁথি থেকে তাঁর কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকের রাজত্বকালের কয়েকটি বৎসর জানা যায়। তবুও এসম্বন্ধে বিতর্কের শেষ হয়নি, তার কারণ, এই সমস্ত পুঁথিতে

লক্ষ্মণ সংবতে তারিখ দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্মণ সংবৎকে খৃষ্টাব্দে রূপান্তরিত করার প্রশ্ন যে কত জটিল, তা আমরা আগের প্রবন্ধে দেখিয়েছি। এও আমরা দেখিয়েছি যে মিথিলার বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্মণ সংবতের সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ব্যবধান ১০৮০ বছর থেকে সুরু করে ১১২৯ বছর পর্যন্ত হত এবং পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে মিথিলায় অন্ততঃ তিন রকমের লক্ষ্মণ সংবৎ প্রচলিত ছিল।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এর আগে যে সব পূর্বাচার্য আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মিথিলার বর্তমান পাঁজী অনুসরণ করে ল.সং এর সংগে ১১০৮ বছর যোগ করে তাকে খৃষ্টাব্দে রূপান্তরিত করেছেন। কয়েকজন কীলহর্ন এর মত অনুসরণ করে ১১১৯ বছর যোগ করেছেন, এঁরাই সংখ্যায় বেশী। ডঃ সুভদ্র ঝা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে ল.সং এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের পার্থক্য ১১০৮ থেকে ১১২০ বছর অবধি হত বলে মনে করেছেন। ল.সং সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার দরুণ এঁদের সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তিতেই ত্রুটি থেকে গেছে। এঁদের গবেষণার মূল্য কোনদিনই কমবে না, কিন্তু উপরোক্ত কারণের জন্য এঁদের মত বিস্তৃতভাবে বিচার করবার দরকার নেই। তাই এসম্বন্ধে যাবতীয় প্রাচীন ও নবীন তথ্য একত্র করে আমরা নতুনভাবে বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

আজ অবধি দুটি পুঁথিতে বিদ্যাপতির জীবৎকালের দুটি বৎসর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে শ্রীধর বিরচিত কাব্যপ্রকাশবিবেকের পুঁথি। স্বয়ং বিদ্যাপতির আজ্ঞায় এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহের রাজত্বকালে এটি নকল করা হয়েছিল। এর পুষ্পিকাটি এই—

"ইতি তর্কাচার্য্য ঠক্কুর শ্রীশ্রীধর বিরচিতে কাব্যপ্রকাশবিবেক দশম উল্লাসঃ॥ শুভমস্তু॥ সমস্ত বিরুদাবলী মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহদেব সংভুজ্যমান তীরভুক্তৌ শ্রীগজরথপুর নগরে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রীবিদ্যা-পতীনামাজ্ঞয়া খৌয়াল সং শ্রীদেবশর্ম্ম বলিয়াস সং শ্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈষা হস্তাভ্যাং লসং ২৯১ কার্ত্তিক বদি ১০"

অপরটি হচ্ছে বিদ্যাপতির ছাত্র রূপধরের নকল করা হলায়ুধমিশ্রের ব্রাহ্মণ-সর্বস্বের পুঁথি। এর পুষ্পিকায় বিদ্যাপতির নাম 'শ্রী'যুক্ত হয়ে উল্লিখিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় বিদ্যাপতি ঐ সময় বেঁচে ছিলেন। পুষ্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত হল—

"লসং ৩৪১ মুড়িয়ার গ্রামে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় নিজকুলকুমুদিনী চন্দ্র বাদিমত্তভ সিংহ পরম সচ্চরিত্র পবিত্র শ্রীবিদ্যাপতি মহাশয়েভ্যঃ পঠিতা ছাত্র শ্রীরূপধরেণ লিখিতমদঃ পুস্তকম।" (ডঃ সুকুমার সেন সর্বপ্রথম এই পুঁথির পুষ্পিকার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লসং ৩৪১ = ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ ধরেছিলেন।)।

দুঃখের বিষয়, দুটি পুঁথির কোনটিতেই লসং এর সঙ্গে অন্য কোন অব্দের উল্লেখ নেই। তাই প্রথম পুঁথির লসং ২৯১—১৩৭১ থেকে ১৪২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন্ সময়ে পড়েছিল তা জানা যাচ্ছে না এবং দ্বিতীয় পুঁথির লসং ৩৪১—১৪২১ থেকে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কবে পড়েছিল, তাও বলবার উপায় নেই। এই দুটি পুঁথির সাক্ষ্য থেকে শুধুমাত্র এইটুকু নিঃসংশয়ে স্থির করা যায় যে, ১৪২০-২১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন। দুটি পুঁথিতেই বিদ্যাপতিকে 'সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায়' বলা হয়েছে, এর থেকে মনে হয় এদের লিপিকালের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী নয়।

বিদ্যাপতির সময় নির্ধারণের আর একটি সূত্র হচ্ছে তাঁর 'লিখনাবলী' গ্রন্থ। এই বইটিতে বিদ্যাপতি সাধারণ লোকদের চিঠি লেখার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। বইটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দ্বারভাঙ্গা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য। ৺মনোমোহন চক্রবর্তী লিখেছিলেন, 'লিখনাবলী' তে যে সব আদর্শ চিঠি দেওয়া হয়েছে, তাদের অনেকগুলিতেই ল.সং ২৯৯ তারিখ দেখা যায় (J. A. S. B, 1915, p. 422)। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে ডঃ উমেশ মিশ্র 'লিখনাবলী' দেখেছেন, তিনিও ঐ কথা বলেন। সুতরাং ২৯৯+১০৮০=১৩৭৯ থেকে ২৯৯+১১২৯=১৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'লিখনাবলী' রচিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি নবাবিষ্কৃত সূত্রের সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। সূত্রটি হচ্ছে লক্ষ্মণসেন নামে একজন উত্তরভারতীয় কবির ব্রজভাষায় লেখা 'হরিচরিত্র বিরাট পর্ব' নামে একটি কাব্য। এই কাব্যের রচনাকাল ১৪৮২ সংবৎ বা ১৪২৫ খৃষ্টাব্দ। এতে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কীর প্রশস্তি আছে। এর এক জায়গায় কবি লিখেছেন,

> জৈদেব চলে সর্গ কী বাটা ঔ গএ ঘৰ সুরপতি ভাটা।
> নগর নরিন্দ্র জে গএ উনারী বীত্তাপতি কই গএ লাচারী॥

বিশ্বভারতী হিন্দী ভবনের জনৈক অধ্যাপক এর অর্থ করেছেন,

'জয়দেব স্বর্গের পথে গিয়েছেন, ঘঘ (জনৈক পল্লীকবি) এবং স্বরপতি ভাটও গিয়েছেন, নগর নরিন্দ্র (তাঁদের) অনুসরণ করে গেলেন, বিদ্যাপতিকে বিবশ করে দিয়ে।' অবশ্য এই অর্থের একটা ত্রুটি এই যে, বিষয়টা এতে স্পষ্ট হচ্ছে না। 'নগর নরিন্দ্র' অর্থে যদি শিবসিংহকে নেওয়া যায়, তাহলে কষ্টকল্পনার সাহায্যে ব্যাপারটা একরকম ব্যাখ্যা করা যায়।

যাহোক্, উপরোদ্ধৃত শ্লোকটি থেকে একটা কথা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বিদ্যাপতি ১৪৮২ সংবৎ বা ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

বিদ্যাপতির জীবৎকাল সম্বন্ধে আর দুটি সূত্রের সাক্ষ্যও এই প্রসঙ্গে বিচার্য।

প্রথমটি হচ্ছে রাজা শিবসিংহের নামাঙ্কিত একটি তাম্রশাসন। এটিতে লেখা রয়েছে ২৯৩ লসং এর শ্রাবণ শুদি সপ্তমী তিথিতে শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসফী গ্রাম দান করেছিলেন। কিন্তু অনেকে এই দানপত্রকে জাল মনে করেন। তার কারণ দানপত্রের তারিখ লক্ষ্মণ সম্বৎ ২৯৩, শক ১৩২১ (১৩৯৯ খৃষ্টাব্দ), সম্বৎ ১৪৫৫ (১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ) ও সন ৮০৭ লিখিত ছিল। আকবর এর প্রায় দুশো বছর পরে ফসলি সন প্রবর্তন করেন। ঐ তারিখের উল্লেখ থাকায় দানপত্রখানি জাল মনে করা হয়। "চার রকম অব্দে যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহার কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। সেজন্যও উহাকে জাল বলা হইয়াছে।"

এছাড়া দানপত্রটি দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। মিথিলায় দেবনাগরী অক্ষরের ব্যবহার আধুনিক কালেই সুরু হয়েছে। সুতরাং এটি মহারাজ শিবসিংহ প্রদত্ত মূল দানপত্র কিছুতেই হতে পারেনা। কিন্তু এর সমস্তটাই ভুয়ো বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ এর মধ্যে অনেকগুলি খাঁটি তথ্য পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালের একজন জালিয়াতের পক্ষে সহজে জানা সম্ভব নয়। যথা,

(১) দানপত্রে বলা হয়েছে শিবসিংহের রাজধানী গজরথপুরে ছিল। আগে যে কাব্যপ্রকাশবিবেকের পুঁথির পুষ্পিকা উদ্ধৃত করেছি, তাতে এই কথার সমর্থন আছে।

(২) দানপত্রে বিদ্যাপতির নামের সঙ্গে 'অভিনব জয়দেব' ও 'মহারাজপণ্ডিত' উপাধি যুক্ত আছে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে বিদ্যাপতির সত্যিই অভিনব জয়দেব উপাধি ছিল (বিদ্যাপতি, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ ৫।৴০)। বিদ্যাপতির

'গোরক্ষবিজয়' নাটকে তাঁর 'মহারাজপণ্ডিত' উপাধি পাওয়া যায় (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৩, পৃঃ ২৭৪)।

(৩) দানপত্রে চার রকম অব্দের যে তারিখ দেওয়া হয়েছে, তাদের "কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই" বলা ঠিক নয়। এক সন বাদ দিলে বাকী তিনটি তারিখের মিল নেই বলা চলে না। শক ১৩২১ = ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দ। ১৪৫৫ সংবৎ অর্থে যদি দক্ষিণী সংবৎ হয় তাহলে তার শ্রাবণ মাস ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দেই পড়ে। লক্ষ্মণ সংবৎ সম্বন্ধে আগে আমরা যে আলোচনা করেছি, তাতে দেখিয়েছি যে লক্ষ্মণ সংবৎ নানারকমের ছিল। সুতরাং ২৯৩ লসং = ১৩৯৯ খৃঃ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। দানপত্র অনুসারে দানের তিথি শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী বৃহস্পতিবার। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী বৃহস্পতিবারেই পড়েছিল (J. A. S. B., 1926, p. 369 দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে, শিবসিংহ সত্যিই বিদ্যাপতিকে ঐ তারিখে বিসফী গ্রাম দান করেছিলেন। এই দানের মূল তাম্রশাসন কালক্রমে নষ্ট হবার উপক্রম হলে তার থেকে বর্তমান তাম্রশাসনটি তৈরী করা হয় এবং যাঁরা তৈরী করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী তার মধ্যে 'সন ৮০৭' তারিখটিও ঢুকিয়ে দেন।

বিদ্যাপতির সময় সম্বন্ধে আর একটি সূত্র হচ্ছে একখানি ভাগবতের পুঁথি। লোকে বলে এটি নাকি বিদ্যাপতি নিজের হাতে নকল করেছিলেন। এই পুঁথির শেষে লেখা আছে "শ্রীবিদ্যাপতে লিপিরিয়মিতি।" এই পুঁথি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের অধিকাংশের মতে পুঁথির লিপিকাল "লসং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে।" কিন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন পুঁথির লিপিকাল ৩৪৯ ল. সং (নানা প্রবন্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ২৭), তিনি অবশ্য নিজে এই পুঁথি দেখেননি, "মিথিলা হইতে" "সংবাদ" পেয়েছিলেন, সুতরাং এবিষয়ে তাঁর কথার উপর নির্ভর করা যায় না। পুঁথিটির লিপিকালের অঙ্ক এখন আর পড়া যায় না। "লসং ৩০৯" যদি পুঁথির লিপিকাল হয়, তাহলে তা ৩০৯ + ১১২৯ = ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দ হওয়া সম্ভব। ঐ বছরে শ্রাবণ মাসের শুদি ১৫ বা পূর্ণিমা তিথি মঙ্গলবারে পড়েছিল এবং ঐদিন তারিখ ছিল ৫ই আগষ্ট।

এছাড়া, বিদ্যাপতির লেখা 'দানবাক্যাবলী'র একটি ৩৫১ ল. সংএ নকল করা পুঁথি বর্তমানে নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে আছে বলে শুনেছি। পুঁথিটি নাকি বিদ্যাপতি নিজের হাতে সংশোধন করেছিলেন। পুঁথিটির বিস্তৃত

বিবরণ প্রকাশিত হলে বিদ্যাপতির জীবৎকাল সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত হবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যাপতি কবে থেকে কবে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তার একটা মোটামুটি হিসাব করা যেতে পারে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজাদের সময় থেকে। কিন্তু কোন্ রাজা কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, তা এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হয়নি। সুতরাং আগে সেই চেষ্টাই করতে হবে।

বিদ্যাপতির পদাবলী ও গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর যে সমস্ত পৃষ্ঠপোষকের নাম জানা যায়, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছেন কামেশ্বরের পুত্র রাজা ভোগীশ্বর। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংগৃহীত একটি পদে এঁর নাম পাওয়া গেছে; পদটির ভণিতা এই,

> বিদ্যাপতি কবি গাবিআ রে তোঁকে অছ গুণক নিধান।
> রাউ ভোগিসর গুণ নাগরা রে পদমা দেবি রমান॥

ভোগীশ্বরের কালনির্ণয়ের নির্দেশ পাওয়া যায় বিদ্যাপতির কীর্তিলতার মধ্যে। তাতে তিনি ভোগীশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন,

> ভোগীসরাঅ বরভোগপুরন্দর। হুঅহুআসনতেজি কন্তি কুসুমাউ হসুন্দর॥
> জাচকসিদ্ধি কেদারদান পঞ্চম বলি জানল। পিঅসখ ভণি পিঅরোজ সাহ সুরতান সমানল॥

এই 'পিঅরোজ সাহ সুরতান' হচ্ছেন তোঘলক বংশের সুলতান ফিরোজ শাহ। ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল ১৩৫১—১৩৮৮ খৃঃ। ফিরোজ শাহ যাঁকে প্রিয়সখা বলেছিলেন, সেই ভোগীশ্বরের সময়ও মোটামুটি ওই হবে। তাহলে বিদ্যাপতি যদি ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে ১৩৮৫ খৃঃ বা তার কাছাকাছি সময়ে ভোগীশ্বরের নাম নিয়ে পদ লিখতে পারেন। পদটির ভাষা ও ভাব অত্যন্ত কাঁচা, সুতরাং এটিকে বিদ্যাপতির অল্প বয়সের লেখা বলে নিতে কোন বাধা নেই।

কিন্তু উপরে ভোগীশ্বরের সময় ও বিদ্যাপতির জন্মসাল সম্বন্ধে যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করলাম, তার বিরুদ্ধে যে যুক্তি উঠতে পারে, সেটির জবাব দেওয়া দরকার। কীর্তিলতা থেকে জানা যায় যে, ভোগীশ্বরের ছেলে গএনেস অসলান নামে একজন শত্রুর হাতে নিহত হন। কীর্তিলতার সংশ্লিষ্ট অংশটি এই,

> "লখ্খন সেন নরেশ লিহিঅ জবে পখ্খ পঞ্চ বে।
> তম্মহুমাসহি পঢ়ম পখ্খ পঞ্চমী কহিঅজে॥
> রজ্জলুব্ধ অসলান বুদ্ধি বিক্কমবলে হারল।
> পাস বইসি বিসবাসি রাএ গএনেসর মারল॥"

শ্লোকটির অর্থ তলিয়ে না দেখে কেউ কেউ এটি থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে গএনেসকে "অসলান ২৫২ লক্ষ্মণ সম্বতের মধুমাসের (চৈত্র মাসের) কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে হত্যা করেন।" কীল্‌হর্নের মত অনুসারে এঁরা ধারণা করেছিলেন যে ২৫২ লক্ষ্মণ সংবৎ=১৩৭১-৭২ খৃষ্টাব্দ। এই ভুল ধারণা থেকেই এঁদের আর একটি সিদ্ধান্ত এল যে,"১৩৭১ খৃষ্টাব্দে ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বর নিহত হন। ঐ পদটি বিদ্যাপতির রচনা হইলে ১৩৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভোগীশ্বরের রাজ্যকালে কবির বয়স অন্ততঃ ১৫।১৬ হওয়া দরকার অর্থাৎ ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার জন্ম হইয়াছিল মানিতে হয়।" কিন্তু 'কীর্তিলতা'র গএনেসের হত্যা সংক্রান্ত উপরোদ্ধৃত অংশটির প্রকৃত অর্থ এই,

"যখন লক্ষ্মণ সেন রাজার ২৫২ বৎসর লেখা হইল, সেই সময় মধুমাস প্রথম পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাজ্যলুব্ধ অসলান গণেশ্বরের বুদ্ধি ও বিক্রম বলে হারিয়া গেল। কিন্তু সে পাশে বসিয়া যে গণেশ্বর তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহাকে মারিয়া ফেলিল।" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুবাদ)

২৫২ লক্ষণ সংবৎ=২৫২+১১২৯=১৩৮১ খৃঃ ও হতে পারে। ঐ বছরে গএনেস অসলানকে বুদ্ধি ও বিক্রম বলে হারিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর হাতে নিহত হন নি। অসলান তারপর বন্ধু সেজে গএনেসের বিশ্বাস অর্জন করে তাঁকে হত্যা করে। সুতরাং ২৫২ লসং এর বেশ কয়েকবছর বাদে গএনেসের হত্যা ঘটে। গএনেসের হাতে অসলানের পরাজয়ের সময় ভোগীশ্বরের জীবিত থাকতে কোন বাধা নেই। সুতরাং ভোগীশ্বরের রাজত্বকাল ও বিদ্যাপতির জন্মতারিখ সম্বন্ধে আমরা যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করেছি, তা পরিবর্তনের কোন কারণ নেই।

ভোগীশ্বরের ছেলে গএনেস; তাঁর ছেলে বীরসিংহ, কীর্তিসিংহ ও রাঅসিংহ। 'কীর্তিলতা'য় বলা হয়েছে গএনেস অসলানের হাতে নিহত হলে বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ জোনাপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তা লাভ করে অসলানকে উচ্ছেদ করেন। এই জোনাপুর ও ইব্রাহিম শাহ যে যথাক্রমে জৌনপুর ও শার্কী বংশের ইব্রাহিম শাহ (১৪০১-১৪৪০ খৃঃ), তাতে কোন সন্দেহ নেই (এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে শিবপ্রসাদ সিংহ রচিত 'কীর্তিলতা ঔর অবহট্ট ভাষা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪-১৬ দ্রষ্টব্য), কারণ সমসাময়িক ইতিহাস তারিখ-ই-মোবারকশাহী থেকে জানা যায় যে, মিথিলা ঐ সময় জৌনপুরের সামন্তরাজ্য ছিল। এর থেকে বোঝা যায়,

ইব্রাহিম শার্কীর সিংহাসনে আরোহণের অর্থাৎ ১৪০১ খৃষ্টাব্দের বেশী আগে গএনেসের হত্যা ঘটেনি। যাহোক্, অসলান পরাস্ত হলে ইব্রাহিম শাহ কীর্তিসিংহকেই রাজা করেন। কীর্তিসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৪০১ খৃষ্টাব্দের পরে বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' লেখেন। 'কীর্তিলতা' যে 'কীর্তিপতাকা' নামে বিদ্যাপতির অপর একখানি বইএর আগে লেখা হয়েছিল, তাতে কোন সংশয় নেই। কারণ 'কীর্তিলতা'র মধ্যে যেমন কীর্তিসিংহের, 'কীর্তিপতাকা'র মধ্যে তেমনি শিবসিংহের বীরত্বকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দুটি কাব্যের সমাপ্তিও একই ধরণের। কিন্তু 'কীর্তিলতা'র নামকরণ করা হয়েছে কীর্তিসিংহের নামের দিকে লক্ষ্য রেখে, 'কীর্তিপতাকা'র নামকরণে তো সেরকম উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে বিদ্যাপতি নতুন নাম উদ্ভাবনের কষ্ট স্বীকার না করে পুরোনো নামকেই একটু বদলে নিয়েছেন। 'কীর্তিপতাকা' শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের আগে (পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য) লেখা। সুতরাং এখন সিদ্ধান্ত করা যায়, কীর্তিলতা ১৪০১ খৃষ্টাব্দের কয়েক বছর পরে ও ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের কয়েক বছর আগে লেখা হয়েছিল। 'কীর্তিলতা'র মুদ্রিত গ্রন্থে উপসংহারের সংস্কৃত শ্লোকটির শেষে 'খেলনকবের্বিদ্যাপতের্ভারতী' লেখা আছে, কিন্তু এই পাঠ অশুদ্ধ ও অর্থহীন। অথচ অনেক গবেষক এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। শুদ্ধ পাঠ 'খেলতু কবের্বিদ্যা-পতের্ভারতী' (Songs of Vidyapati, ed. by Dr. Subhadra Jha, Introd., p. 26)।

কীর্তিসিংহ কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, তা বলা যায় না। বিদ্যাপতির আর কোন বইএ তাঁর বা তাঁর কোন বংশধরের নাম পাই না। বিদ্যাপতির অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকরা ঐ বংশেরই ভিন্ন শাখার লোক। এবার এঁদের নাম ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে আলোচনা করছি। এঁরা কীর্তিসিংহের মৃত্যুর পরে মিথিলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন, এই ধারণা ঠিক্ নয়। মিথিলার এই রাজারা আসলে ছিলেন জমিদার এবং এঁদের রাজ্যের সীমাও খুব বড় ছিল না। একই সময়ে একাধিক লোকের রাজত্ব করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি, দেবসিংহ-শিবসিংহ, নরসিংহ-ধীরসিংহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেখি, পিতাপুত্র একই সময়ে রাজত্ব করছেন।

বিদ্যাপতির 'ভূপরিক্রমা' রাজা দেবসিংহের আজ্ঞায় লেখা হয়েছিল। বিদ্যাপতি কয়েকটি পদ 'হাসিনি দেবিপতি দেবসিংহ নরপতি'র নামে উৎসর্গ

করেছেন। এঁর বিরুদ ছিল গরুড়নারায়ণ। বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা', 'কীর্তিপতাকা', 'গোরক্ষবিজয়' নাটক এবং অসংখ্য পদ রচিত হয়েছিল রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালে। 'পুরুষপরীক্ষা' থেকে জানা যায় যে, শিবসিংহ দেবসিংহের পুত্র ও ভবসিংহের পৌত্র। বর্ধমানের 'গঙ্গাকৃত্যবিবেক' থেকে জানা যায় যে, এই ভবসিংহ কামেশ্বরের পুত্র এবং কীর্তিসিংহের পিতামহ ভোগীশ্বরের ভাই। শিবসিংহের বিরুদ ছিল রূপনারায়ণ। বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের মত শিবসিংহ ও বিদ্যাপতির নাম অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত হয়ে আছে।

শিবসিংহ কখন সিংহাসনে বসেন তা জানা যায় না। তবে তিনি যে পিতার জীবদ্দশাতেই রাজত্ব করতেন, তার প্রমাণ আছে; সে কথা পরে বলছি। বিসফীদানপত্রের কথা সত্যি হলে বলতে হবে, ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে বা তারও আগে শিবসিংহ রাজা হয়েছিলেন।

বিদ্যাপতির আদেশে নকল করা 'কাব্যপ্রকাশবিবেকে'র পুঁথি থেকে জানা যায়, শিবসিংহ ২৯১ লক্ষ্মণসেন সংবতে রাজত্ব করতেন। কিন্তু এখানে ২৯১ ল. সং যে ঠিক কত খৃষ্টাব্দের সমান, তা আমরা জানিনা।

বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত একটি অবহট্ট পদে পাওয়া যায় যে, দেবসিংহ ২৯৩ ল. সংএ পরলোক গমন করেন। পদটির কতকাংশ নীচে উদ্ধৃত হল,

> অনল রন্ধ্র কর লক্খন নরবএ সক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
> চৈত কারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপ্পএ জাউলসী ॥
> দেবসিংহে জং পুহবী ছড্ডিঅ অদ্ধাসন সুর রাএ সরূ।
>
> ... ...
>
> সিংহাসন সিবসিংহ বইঠ্ঠো উচ্ছবৈ বৈরস বিসরি গএও ॥

(২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ, ১৩২৪ শকে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র মিলিত বৃহস্পতিবার দিবাবসানে দেবসিংহ পৃথিবী ছেড়ে সুররাজের অর্ধাসন পেলেন··· শিবসিংহ সিংহাসনে বসলেন। লোকেরা উৎসবে বিষাদ ভুলে গেল।)

কিন্তু এই পদটি নিঃসন্দেহে জাল। তার প্রমাণ, (১) পদটিতে বলা হয়েছে শিবসিংহ ১৩২৪ শকাব্দে পিতা দেবসিংহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু 'পুরুষপরীক্ষা'র শেষাংশ থেকে জানা যায় যে, শিবসিংহের রাজত্বকালেও দেবসিংহ জীবিত ছিলেন। কারণ শেষ শ্লোকে বিদ্যাপতি শিবসিংহকে রাজা বলেও দেবসিংহ সম্বন্ধে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার

করে লিখেছেন, "ভাতি যস্ত জনকো রণজেতা দেবসিংহগুণরাশিঃ।" (২) ১৩২৪ শকাব্দের চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে বৃহস্পতিবার এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ছিল না। এই অসঙ্গতির জন্যে অনেকে উদ্ধৃত পদটিতে 'কর'এর জায়গায় 'পুর' ধরেন, তাতে ১৩৩৪ শক হয়। কিন্তু তাতেও সুবিধা হয় না, কারণ ১৩৩৪ শকাব্দের চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে বৃহস্পতিবার ছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ছিল না। (৩) পদটিতে বলা হয়েছে দেবসিংহ ১৩২৪ শক বা ১৪০২-০৩ খৃষ্টাব্দ পরলোক গমন করেছিলেন। কিন্তু দেবসিংহ যে যে অন্ততঃ ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তা একটি নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। এবার সেই কথাতেই আসছি।

১৯৪৮ সালের Bengal, Past and Present পত্রিকায় সৈয়দ হাসান আস্কারি একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধের একটি পাদটীকা (p. 36, f. n. 31) নীচে অবিকল উদ্ধৃত করছি,

"Moulvi Muhammad Ilyās Rahman, a friend of the writer, has discovered a *Bayax* of Mullā Taqyya, a courtier of Akbar and Jahāngir, and copied in 1023 by Mullā Abul Hasan of Darbhanga, and in it we find references to 'Rājā Kāns', a Hindu Zamindār, acquiring ascendency in Bengal, oppressing the Muslims, and instigating Sheo Singh, the 'rebellious son of Deva Singh, the Rājā of Tirhut,' to commit depredations upon the Muslims. Sheo Singh is said to have killed many holy personages and contemplated a similar action against 'Makhdūm Shāh Sultān Hussain', the Khalifā of Makhdūm Alā-ul-Huq of Pandua. We are also told that Sultān Ibrāhim Sharqi of Jaunpur, being requested by Mukhdūm Nūr Qutb Ālam, marched against Bengal, but had to face the opposition of Sheo Singh in Tirhut. The latter was defeated, pursued and captured, and his stronghold, Lehra, was taken. His father, the dispossessed Rājā of Tirhut, was restored to power on condition of allegiance and loyalty."

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সভাসদ মুল্লা তকিয়া যা লিখেছেন, তার সমর্থক প্রমাণও অনেক আছে। প্রথমতঃ তিনি লিখেছেন যে, শিবসিংহ দেবসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজে রাজা হয়েছিলেন। শিবসিংহ যে পিতার জীবিতাবস্থাতেই রাজত্ব করছিলেন, একথা বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' থেকেই জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাপতির 'ভূপরিক্রমা' রচিত হবার সময় দেবসিংহ নৈমিষারণ্যে বাস করছিলেন, একথা 'ভূপরিক্রমা'র সূচনা থেকে জানা যায়। সম্ভবতঃ পুত্র কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে দেবসিংহ নৈমিষারণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ মুল্লা তকিয়া লিখেছেন, বাংলার রাজা কান্‌স্ বা গণেশের সঙ্গে শিবসিংহের বন্ধুত্ব ছিল। শিবসিংহ ও গণেশের আবির্ভাবকাল সমসাময়িক। চতুর্থতঃ, মিথিলায় পুরোণো প্রবাদ আছে যে শিবসিংহ দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত, বন্দী ও রাজ্যচ্যুত হন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (পৃঃ ২৯) বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এইভাবে প্রবাদটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন,

"শিবসিংহ এতদুর সাহসী হইয়াছিলেন যে তিনি আপনাকে মুসলমানের অধীন বলিয়া মনে করিতেন না।......দিল্লীশ্বরের সৈন্যদল মিথিলা ঘেরোয়া করিল। দেবসিংহ পলায়ন করিলেন। শিবসিংহ একাকী শত্রুসেনায় প্রবেশ করিলেন। তাহার পর শিবসিংহ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন, সেখানে কারাগারে তাঁহার স্থান হইল। দেবসিংহ বশ্যতা স্বীকার করিলেন, তাঁহার রাজ্য বজায় রহিল।"

মুল্লা তকিয়ার বয়াজের সঙ্গে উদ্ধৃত অংশের প্রায় পরিপূর্ণ ঐক্য আছে, কেবল জৌনপুরের জায়গায় দিল্লীর নাম বসেছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছিলেন প্রবাদে উল্লিখিত দিল্লীশ্বর আসলে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কী (বিদ্যাপতি, ভূমিকা, পৃঃ ১৮৶০—২৸০)। ইব্রাহিমের সঙ্গে শিবসিংহের যে আগে থাকতেই বিরোধ ছিল, তারও প্রমাণ আছে। এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি (রাজা গণেশের আমল, ভূমিকা, পৃঃ ৷০—৷৴০)।

সুতরাং আমরা দেখতে পারছি, দেবসিংহ ও শিবসিংহ দুজনেই অন্তত ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, কারণ ঐ বছরেই রাজা গণেশের সঙ্গে ইব্রাহিমের সংঘর্ষ ঘটে। শিবসিংহ তারপরে আর মুক্তি পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না, যদিও মিথিলায় প্রবাদ আছে বিদ্যাপতি তাঁর অলৌকিক শক্তির বলে শিবসিংহকে মুক্ত করে এনেছিলেন। ইব্রাহিম শার্কী শিবসিংহের ধৃষ্টতা মার্জনা

করেছিলেন বলে মনে হয় না। সুতরাং অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ১৪১৫ খৃষ্টাব্দেই শিবসিংহের রাজ্যাবসান ঘটেছিল বলে সিদ্ধান্ত করতে হবে।

শিবসিংহ ইব্রাহিম শার্কীর হাতে বন্দী হবার পরে দেবসিংহ মিথিলার সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হন। কিন্তু কতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন এবং বিদ্যাপতির সঙ্গে এই সময় তাঁর কি সম্পর্ক ছিল, তা জানা যাচ্ছে না। তাঁর অপর পুত্র পদ্মসিংহও কিছু দিনের জন্য রাজা হয়েছিলেন। বিদ্যাপতি তাঁর শৈবসর্ব্বস্বসার পুরাণ সংগ্রহ ও গঙ্গাবাক্যাবলীতে এবং একটি পদে পদ্মসিংহ ও তাঁর স্ত্রী বিশ্বাসদেবীর নাম করেছেন। এঁদের রাজত্বকাল সঠিকভাবে জানা যায় না।

বিদ্যাপতির 'লিখনাবলী' লেখা হয়েছিল দ্রোণবারের রাজা পুরাদিত্যের আজ্ঞায়। এঁরও সম্বন্ধে আমরা কিংবদন্তী ছাড়া বিশেষ কিছু জানি না।

অতঃপর আমরা দেখি, বিদ্যাপতি শিবসিংহের খুড়তুতো ভাই নরসিংহ ও তাঁর স্ত্রীপুত্রদের আজ্ঞায় কয়েকটি বই লিখছেন। বিভাগসার লেখা হয়েছিল নরসিংহের আদেশে, দানবাক্যাবলী তাঁর স্ত্রী ধীরমতী দেবীর আদেশে এবং দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী তাঁর ছেলে ভৈরবসিংহের আদেশে। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর সূচনায় বিদ্যাপতি নরসিংহ এবং তাঁর দুই পুত্র ধীরসিংহ ও ভৈরবসিংহের প্রশস্তি রচনা করেছেন। এই প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, ধীরসিংহ তাঁর পিতার জীবদ্দশাতেই রাজা হয়েছিলেন।

নরসিংহের রাজত্বকালের একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া গেছে তাঁরই রাজত্বকালে উৎকীর্ণ মাধেপুরা মহকুমার কানদাহা গ্রামের একটি শিলালিপি থেকে (J. B. O. R. S., 1934, pp. 15-19 দ্রঃ)। শিলালিপিটির তারিখ শক শরাশ্বমদনঃ = ১৩৭৫ শক = ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ। ধীরসিংহের রাজত্বকালে লেখা দুটি পুঁথি পাওয়া গেছে। একটি সেতুদর্পণীর পুঁথি, এর লিপিকাল ৩২১ লসং। অপরটি মহাভারতের কর্ণপর্বের পুথি, এর লিপিকাল ৩২৭ ল সং। আবার সেই গোলমেলে লসং! যাহোক্, সেতুদর্পণীর পুঁথির লিপিকাল ৩২১ + ১১২৯ = ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী হতে পারেনা। সুতরাং নরসিংহ ও ধীরসিংহ একই সঙ্গে রাজত্ব করছিলেন, বিদ্যাপতির এই উক্তি সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। পিতাপুত্রের একই সঙ্গে রাজত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে হয় না। সুতরাং দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ১৪৫০ খৃষ্টাব্দেরই কাছাকাছি সময়ে যে রচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এরও পরে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন কিনা, এবার দেখা যাক্।

বিদ্যাপতির তিনটি পদে রাঘবসিংহের, এবং দুটি পদে রুদ্রসিংহের নাম পাওয়া যায়। ধীরসিংহের পুত্র ও পৌত্রের নাম যথাক্রমে রাঘবসিংহ ও রুদ্রসিংহ, কেউ কেউ মনে করেন বিদ্যাপতি এঁদেরই নাম করেছেন। কিন্তু এঁরা ভোগীশ্বরের পাঁচ ও ছয় পুরুষ পরের লোক। যিনি ভোগীশ্বরের সমসাময়িক, তিনি আবার এঁদেরও সমসাময়িক হতে পারেন বলে ভাবা যায় না। মিথিলার পঞ্জী থেকে জানা যায় যে, শিবসিংহের দুই জ্ঞাতিভ্রাতার নাম রাঘবসিংহ ও রুদ্রসিংহ, বিদ্যাপতি এঁদেরই নাম করেছেন বলে মনে হয়।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংগৃহীত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত একটি পদে হুসেন শাহের নাম ছিল। কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, পদটি বিদ্যাপতির লেখা নয়, যশোধর নামে অপর একজন কবির লেখা। একটি পদে নসরৎ শাহের নাম আছে। এই নসরৎ শাহ বাংলার সুলতান হুসেন শাহের ছেলে নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খৃঃ) হতে পারেন না, কারণ তাহলে বিদ্যাপতি অসাধারণ রকম দীর্ঘজীবী হয়ে পড়েন। সুতরাং যতদূর মনে হয়, এই নসরৎ শাহ দিল্লীর সুলতান নসরৎ খান তুঘলক (১৩৯৪-১৩৯৯ খৃঃ)। অবশ্য পদটি বিদ্যাপতির লেখা নয় বলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন।

যাহোক দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনার পরে যে বিদ্যাপতি আর বেশীদিন বেঁচে ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর ছাত্র রূপধরের লেখা পুঁথির লিপিকাল ৩৪১ লসং। ৩৪১ লসং যদি ৩৪১+১১২৯=১৪৭০ খৃষ্টাব্দ হয়, তাহলে বিদ্যাপতির জীবৎকাল আরও একটু প্রসারিত করা দরকার হবে। কিন্তু বিদ্যাপতি অতদিন বেঁচে ছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ ঐ সময় যাঁরা মিথিলায় রাজত্ব করছিলেন, তাঁদের নাম তাঁর কোন বই বা পদে পাওয়া যায় না।

এর আগে যাঁরা বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তাঁদের প্রায় কেউই নির্বিঘ্নে কোন সিদ্ধান্তে পৌছোতে পারেননি। যে সমস্ত তথ্য তাঁদের সিদ্ধান্তের বিরোধী, সেগুলিকে তাঁরা কৃত্রিম বলে মনে করেছিলেন। লক্ষ্মণ সংবৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাবই তাঁদের গবেষণার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন মোটামুটিভাবে সমস্ত জট ছাড়িয়ে আমরা জানতে পারছি যে বিদ্যাপতি ১৩৭০খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাজা ভোগীশ্বরের নামে পদ লেখেন, ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে

রাজা শিবসিংহের কাছ থেকে বিসফী গ্রাম লাভ করেন (?), ১৪০১ ও ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা, পুরুষপরীক্ষা, গোরক্ষবিজয় নাটক ও বহু পদ রচনা করেন, ১৪১৫ ও ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শৈবসর্বস্বসার, দানবাক্যাবলী ও বিভাগসার রচনা করেন, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করেন, এবং তার কিছু পরে, সম্ভবতঃ ১৪৬০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে পরলোকগমন করেন।

বিদ্যাপতির লেখা পদগুলিই তাঁকে অমর করেছে। এই পদগুলির বেশীর ভাগই তাঁর প্রথম বয়সের লেখা বলে মনে হয়। কারণ নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ প্রভৃতি যেসমস্ত রাজা ও রাজপুত্রের তিনি শেষ জীবনে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন, তাঁদের নাম প্রায় কোন পদেই পাওয়া যায় না। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপতির পদকে কালানুযায়ী সাজাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। সফল না হবার প্রধান কারণ, বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অনেকের পরিচয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। 'বিদ্যাপতি'র ভূমিকার এক জায়গায় তিনি "রাঘবসিংহকে শিবসিংহের খুড়তুত ভাই" (পৃঃ ১৷/০) এবং রুদ্রসিংহকে শিবসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতা" (পৃঃ ১৷৵০) বলছেন, কিন্তু অন্যত্র তিনি রাঘবসিংহকে "শিবসিংহের পৌত্রপর্যায়ভুক্ত" (পৃঃ ৭৶০, পৃঃ ১৫৩) এবং রুদ্রসিংহকে শিবসিংহের চার পুরুষ পরবর্তী (পৃঃ ১৫৪) বলেছেন। ডঃ মজুমদার বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনায় অন্য সূত্র দ্বারা অসমর্থিত অনেক কিংবদন্তীর উপরেও নির্ভর করেছেন। আমরা কিন্তু এই কিংবদন্তীগুলির বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে মনে করি না। এই সমস্ত কারণে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে "কালানুক্রমিক" বিন্যাস ডঃ মজুমদার করেছেন, তা আমরা স্বীকার করতে পারিনা।

॥ পাঁচ ॥

চণ্ডীদাস

আজকের দিনে চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে বস্‌লে সর্বপ্রথমেই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে—কোন্ চণ্ডীদাস? বাস্তবিক, চণ্ডীদাস নামের সঙ্গে চণ্ডীদাস-সমস্যা আজ এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তাকে বাদ দিয়ে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা যায় না। তাই বর্তমান প্রবন্ধে আমরা একই সঙ্গে চণ্ডীদাস-সমস্যা সমাধানের ও চণ্ডীদাসের বা চণ্ডীদাসদের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করব। এর আগেও এ চেষ্টা অনেকে করেছেন, কিন্তু তাঁরা সংস্কার ও হৃদয়াবেগকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি বলে তাঁদের সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। উপরন্তু তাঁদের আলোচনা প্রকাশিত হবার পরে কিছু কিছু নতুন তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। এইকারণে এই সমস্ত মতের পুনরালোচনা না করে সোজাসুজি মূল বিষয়ের আলোচনা সুরু করাই সঙ্গত মনে করছি।

বড়ু চণ্ডীদাস

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' চারবার লিখেছেন যে চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন,

(১) বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥
(আদিলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ)

(২) চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥
(মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)

(৩) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
(মধ্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ)

(৪) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
(অন্ত্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার এক প্রত্যক্ষদর্শী স্বরূপ দামোদরের লেখা কড়চা পড়ে ও আর এক প্রত্যক্ষদর্শী রঘুনাথ দাসের কাছে শুনে চৈতন্যচরিতামৃত লিখেছেন। সুতরাং এই উক্তির যাথার্থ্য সন্দেহাতীত। উপরন্তু চৈতন্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (রচনাকাল আনুমানিক ১৫৫৫ খৃঃ) কৃষ্ণদাসের উক্তির পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। জয়ানন্দ পূর্ববর্তী কবিদের যে বন্দনা করেছেন, তার মধ্যে জয়দেব ও বিদ্যাপতি—চৈতন্যপূর্ববর্তী এই দুজন কবির সঙ্গে একই ছত্রে চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করেছেন,

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

এছাড়া প্রেমবিলাসের ১৯শ বিলাসে খেতরীর মহোৎসবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হওয়ার প্রসঙ্গ দেখা যায়, কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা এই ১৯শ বিলাসকে জাল বলে প্রমাণ করেছেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে সংকলিত গোপাল দাসের 'শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী'র কোন কোন পুঁথিতে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় দু একটি পদ পাওয়া যায়, কিন্তু তা প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ হয় (সা. প. প., ১৩৩৭, পৃঃ ১১৮-১১৯ দ্রঃ)। এই বইএর অন্য পুঁথিতে বড়ু চণ্ডীদাস বা তাঁর পদের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না (সা. প. প., ১৩৩৯, পৃঃ ১৪৫ দ্রঃ)। 'সংগ্রহতোষণী' নামে একটি সহজিয়া গ্রন্থে রায়শেখরের ভণিতাযুক্ত একটি চণ্ডীদাস বন্দনার পদ পাওয়া যায় (বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮ দ্রঃ)। কিন্তু পদটির ভাষা ও ভাব বিচার করে দেখলে সেটিকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি রায়শেখরের রচনা বলে মনে হয় না। এইসব সূত্রের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও জয়ানন্দের সাক্ষ্য থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে, চৈতন্যদেবের আগে চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন এবং তিনি জয়দেব ও বিদ্যাপতির মত কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে 'গীত' লিখেছিলেন।

বর্তমানে চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যে সমস্ত রচনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোন্‌গুলি এই চণ্ডীদাসের লেখা তা স্থির করা এক সুকঠিন সমস্যা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়ে যে বইটি প্রকাশিত হয়, তা যে এই চণ্ডীদাসেরই লেখা, সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই একমত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই প্রাচীনত্ব বিভিন্ন বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে সমর্থিত হয় কিনা, তা দেখা দরকার।

এতদিন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিকে খুব প্রাচীন বলে মনে করা হত। তারই উপর নির্ভর করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে প্রাচীন কাব্য বলা হত। কিন্তু সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন এই পুঁথি পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা নীচে উদ্ধৃত করছি,

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে লেখা হয় নাই তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি কিছুদিন পূর্বে [শ্রাবণ ১৩৬১]। এই সময়ে একটু সুযোগ মিলিয়া গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটি আদ্যন্ত ভালো করিয়া পরীক্ষা করিবার। দেখিলাম কালি অত্যন্ত জ'লো, এবং কাগজ অত্যন্ত অর্বাচীন, পাতলা এবং প্রায় যেন কলে তৈরী। আমার সুনিশ্চিত অভিমত যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আনুমানিক ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা হইয়াছিল।"

—বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০৯

এবং "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যের রচনাকাল জানা নাই। পুঁথিতে তিন ছাঁদের লিপি আছে, একটি ছাঁদ খুব পুরানো, আর একটি ছাঁদ আধুনিক, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের। পুথির কাগজ ও কালী দেখিয়া বোঝা যায় যে, পুথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির মধ্যে একটুকরা কাগজ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তারিখ আছে ১০৮০ মল্লাব্দ। পুথির লিপিকাল ইহারই কাছাকাছি।)"

—বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ২১

সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে আমিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিখানি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পুঁথির কাগজ ও কালি দেখে খুব পুরোনো বলে মনে হল না। এতে লেখার তিনরকম ছাঁদ আছে; তার মধ্যে একটি ছাঁদকে প্রাচীন বলে মনে হয়, কিন্তু সেইসঙ্গে আধুনিক ছাঁদও আছে। পুঁথির ২১৭ ও ২২২ পাতায় প্রাচীন ও আধুনিক দুরকম হাতের লেখাই আছে, সুতরাং

আধুনিক লেখার অংশগুলি পরে যোগ করা হয়েছে বলা চলবে না। অতএব প্রাচীন ছাঁদের লিপি দিয়ে পুঁথির বয়স নির্ধারণ করা চলে না। মোটের উপর ডঃ সুকুমার সেনের মত বিশেষজ্ঞ যখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিকে আধুনিক বলছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিকে প্রাচীন বলা আর নিরাপদ নয়।

যাহোক্, পুঁথি আধুনিক হলেই যে বই আধুনিক হবে, তার কোন মানে নেই। সুতরাং এসম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণ যা আছে, সেগুলি বিচার করে দেখা দরকার। কিছুদিন আগে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বিশ্বভারতী পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ডঃ মজুমদার লিখেছেন, "(শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের) 'রাধা-বিরহ'খণ্ডে দেখি রাধা বড়াইকে বলিতেছেন, 'প্রাণনাথ কাহ্নাঞির উদ্দেশে চল।' কোথায় কোথায় কৃষ্ণকে খুঁজিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিতে যাইয়া রাধা বলিতেছেন—

তথাহো চাহিআ যবে না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথী কূলে।
তথাহোঁ না পাইলে চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবে স পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে॥
তবেঁ সুধি পাইবে যথা বসে জগন্নাথে।
আদি অন্ত সব কথা কহিল তোমাতে॥

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সঙ্গে ভাগীরথীকূলের কোনো সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য মনে হয় উদ্ধৃত অংশের রচয়িতা বলিতে চাহেন—'নিতান্তই যদি ব্রজমণ্ডলের কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানে খোঁজ কর। সেখানে না পাওয়া গেলে সাগরের কাছে সন্ধান করিও, কেননা শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্য সাগরে প্রায়ই যান। আর সেখানেও না পাইলে সকল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিও, তাহা হইলে 'সুধি পাইবে', সন্ধান বা তত্ত্ব পাইবে যেখানে জগন্নাথ বাস করেন। এই

তোমাকে ভাগীরথীকূলের আদিলীলা ও জগন্নাথ ধামের অন্ত্যলীলা 'আদি অন্ত কথা সব কহিল তোমাতে'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামধেয় গ্রন্থখানিতে শ্রীচৈতন্যলীলার আরও দুই ধরনের ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, শ্রীরাধার প্রণয়মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন স্বরূপদামোদর কর্তৃক প্রচারিত (চৈ. চ. ১।৪।৯১) এই সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের কোনো কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া গেলে তাহা শ্রীচৈতন্য-পরবর্তীযুগের যোজনা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 'দান-খণ্ডের' এক জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বলাইয়াছেন—

অসুর কুলদলন হরি মোর নাম।
এবেঁ তোর তরেঁ কৈল আবতার কাহ্ন ॥

আর 'ভারখণ্ডে' দেখি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

তোহ্মার কারণে রাধা কৈলোঁ আবতার।

দ্বিতীয়তঃ বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্য-রচিত 'নিমেষেণ যুগায়িতং, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং' শ্লোকের ভাব লইয়া দুইটি গীতাংশ রচনা করিয়াছেন। 'নিমেষেণ যুগায়িতং' শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এক নিমেষকাল একযুগ বলিয়া মনে হয়, এই ভাবের প্রতিধ্বনি পাই বড়ু চণ্ডীদাসের—

কাহ্ন বিণি মোর এবে এক খন
এক কুল যুগ ভাএ।

আর 'চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং' এর ভাব পাই

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পানী।"

কিন্তু এই যুক্তিগুলির ভিত্তি খুবই দুর্বল। প্রথমে 'ভাগীরথীকূলে' ইত্যাদির কথা ধরা যাক্। এর মধ্যে যে চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত আছে, এই অভিমত ডঃ মজুমদারের বহু আগে আর একজন ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর নাম দক্ষিণারঞ্জন বসু। যাহোক, ডঃ মজুমদার লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সঙ্গে ভাগীরথীকূলের কোন সম্বন্ধ নাই।" 'সম্বন্ধ নাই'—একথা ডঃ মজুমদার বলেছেন চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বৃন্দাবনলীলা বর্ণনার দিকে লক্ষ্য রেখে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধে কি tradition ছিল, সে সম্বন্ধে খুবই

কম তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভাগীরথীকূলের যোগাযোগ নিয়ে হয় তো কোন কাহিনী ছিল, বড়ু চণ্ডীদাস তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন, এরকম মনে করাই স্বাভাবিক। উপরোক্ত অংশটি যিনি লিখেছেন, তাঁর যদি চৈতন্যলীলা জানা থাকত, তাহলে তিনি এত অস্পষ্ট ভাবে চৈতন্যলীলার আভাস দিতেন না। 'সাগর' এখানে গোয়ালার নাম এবং জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। অন্য ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনাপ্রসূত।

তারপর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ রাধার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলা হয়েছে, এর সঙ্গে "শ্রীরাধার প্রণয়মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন"—এই ব্যাপারের কি সাদৃশ্য আছে? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ যেভাবে রাধাকে উপভোগ করেছিলেন, তার সঙ্গে চৈতন্য-দেবের রাধার প্রণয়মাধুরী আস্বাদনের পদ্ধতির কি বিন্দুমাত্রও মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ডঃ মজুমদার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুটি অংশে 'নিমেষেণ যুগায়িতং, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং'এর প্রতিধ্বনি পেয়েছেন বলেছেন। এ বিষয়েও তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ দয়িতের বিরহে মুহূর্ত যুগের মত মনে হয় একথা যেমন পুরোনো, অশ্রুবর্ষণের সঙ্গে বর্ষার তুলনাও তেম্নি চিরাচরিত। চৈতন্যদেবকে এই দুটি idea-র সৃষ্টিকর্তা ভাবার কোন কারণ নেই। বড়ু চণ্ডীদাস যদি চৈতন্যদেবের শ্লোকটির ভাবানুবাদ করতেন, তাহলে ডঃ মজুমদার কর্তৃক উদ্ধৃত উক্তি দুটি পরপর থাকত, কিন্তু তা নেই।

মোটের উপর, কষ্টকল্পিত কোন ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত স্বীকার করা যায় না। অতএব এর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আধুনিকতাও প্রমাণ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে বলে এক সময়ে এর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে বিরোধীপক্ষ প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু দুটি অকাট্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁরা নীরব হয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে এই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ পালার অন্তর্গত 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' পদটি অন্য কয়েকখানি পুঁথিতে অন্যান্য চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদের সঙ্গে পাওয়া গেছে, তবে এইসব পুঁথিতে পদটির ভাষা অল্প আধুনিক হয়েছে। দ্বিতীয় প্রমাণ, ৺মণীন্দ্রমোহন বসু দুটি পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন, যার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি পদ চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অন্যান্য পদের সঙ্গে পাওয়া গেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে অতএব আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এর পুঁথি আধুনিক হওয়াতেও কিছু যায় আসে না, কারণ তাতে গ্রন্থের আধুনিকতা প্রমাণ হয় না। এর প্রাচীনতা সম্বন্ধে কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, সেগুলি নীচে উল্লেখ করছি।

(১) ৺সতীশ চন্দ্র রায় দেখিয়েছিলেন যে সনাতন গোস্বামী রচিত ভাগবতের টীকা বৃহৎবৈষ্ণবতোষণীতে (রচনাকাল ১৫৫৪-৫৫ খৃঃ) ভাগবতের 'শরৎ কাব্য কথা' উক্তির 'কাব্য' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখিত হয়েছে, "কাব্যশব্দেন পরম-বৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত-দানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়া"। আজ অবধি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভিন্ন চণ্ডীদাস রচিত অন্য কোনও দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড আবিষ্কৃত হয়নি। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত দানলীলা ও নৌকাবিহারের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদ পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু ভাব ও ভাষা বিচার করলে সেগুলি যে আধুনিক কালের রচনা, তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। অতএব চণ্ডীদাস রচিত অন্য দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড যতদিন পর্যন্ত না আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততদিন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডই সনাতন গোস্বামীর উদ্দিষ্ট বলে মানতে আমরা বাধ্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের আগে লেখা।

(২) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নানা স্তরের ভাষা পাওয়া যায়। কতক অংশের ভাষা খুবই প্রাচীন স্তরের, কতক অংশের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এর থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রাচীন স্তরের ভাষাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল ভাষা। গায়েনদের কণ্ঠে ও লিপিকরদের হাতে পড়ে বাকী অংশে এই ভাষা আধুনিক হয়ে গেছে। যেসব অংশের ভাষা গায়েন ও লিপিকরদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, তাদের সঙ্গে আধুনিকতর ভাষার তুলনা করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কত আগে রচিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় এসম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করছি,

"(দানখণ্ডের) 'নীলজলদ সম' ইতি পদে,

(ক) দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিলা তোহ্মারে।

(দানখণ্ডেরই) 'ষোলকলা সংপুন্ন' ইতি পদে,

(খ) সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥

(খ) বাক্যটি (ক) বাক্যের অনুবাদ। যদি উভয় বাক্যের দেশ এক হয়, (খ) টি অন্ততঃ দুই শত বৎসর পরে রচিত।.........

গেলান্ত গেলা, দেন্ত দেউ, করিবাক করিতেঁ, জায়িবাক জায়িতেঁ জাইবারে, ইত্যাদি পদের প্রথমটি হইতে দ্বিতীয় রূপে আসিতে দুই শত আড়াই শত বৎসর লাগিয়া থাকিবে। বিভক্তি প্রত্যয়ের দ্বিবিধ রূপ একই কালে প্রচলিত থাকিতে পারে না। একটি নয়, দুইটি নয়, অনেক আছে।......অর্থাৎ কবির পদ প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসর গীত ও শোধিত হইবার পর কৃ-পুথীতে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে) প্রাপ্ত আকারে আসিয়াছিল।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে পুঁথি পাওয়া গেছে, তা যদি মাত্র দুশো বছরের পুরোনো ধরি এবং এর আধুনিক-লক্ষণাক্রান্ত ভাষাকে যদি পুঁথির সমসাময়িক ধরি, তাহলে প্রাচীন ভাষা চারশো বছরের পুরোনো হয়। ঐ ভাষাই যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকালের সমসাময়িক হয়, তাহলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অন্ততঃ চারশো বছর আগেকার রচনা হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের আগে লেখা, পরে নয়।

(৩) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সঙ্গে পরবর্তী কালের বাংলা ভাষার যেমন মিল আছে, অসমীয়া ভাষার সঙ্গেও তেমনি মিল আছে। একথা অসমীয়া পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেছেন। তাঁদের মধ্যে ৺বাণীকান্ত কাকতির উক্তি আমি উদ্ধৃত করছি, "Another important work which has been claimed as a purely Bengali work, but which nevertheless preserves the earliest Assamese formations is Krsna-Kirtana of Badu Candidasa. Like the Dohas, Krsna-Kirtana represents the pre-Bengali and pre-Assamese dialect groups......In Krsna-Kirtana, for instance, the first personal affixes of the present indicative are -i and-o ; the former is found in Bengali at present and the latter' in Assamese. Similarly, the negative particle na- assimilated to the initial vowel of the conjugated root, which is characteristic of Assamese, is also found in Krsna-Kirtana. Modern Bengali places the negative particle after the conjugated root. With the development of linguistic self-consciousness the

parallel forms were isolated and each dialect group became clearly demarcated and different parallel forms became leading characteristics of the dialect groups."

ষোড়শ শতাব্দী থেকে অসমীয়া ও বাংলা ভাষা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা প্রায় সকলেই একমত। এই কারণে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রভৃতি ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা গ্রন্থের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত অসমীয়া ভাষার সঙ্গে মিল দেখা যায় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা (অবশ্য প্রাচীন অংশ) অসমীয়া ও বাংলা ভাষা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আগেকার অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর আগেকার ভাষা বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

(৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন বহু জিনিসের উল্লেখ মেলে, যা আরও প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগের কোন রচনায় আদৌ পাওয়া যায় না (সা. প. প., ১৩৩৪, পৃঃ ২৩৩-২৪৮ দ্রঃ)। এর দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কবি কৃষ্ণকে 'গরুড়বাহন' বলেছেন,

(১) চড়িলা কালীয়নাগ শীরে।
গরুড়বাহন মহাবীরে ॥

(২) শঙ্খচক্র গদা করে গরুড়বাহন ল
আহ্মে দেব সারঙ্গধরে।

পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণের বাহনের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই, কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে (১।১৯) কৃষ্ণকে 'গরুড়াসন' বলা হয়েছে।

তারপর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণের লম্বা চুল ছিল। এই ধরনের চুলের বিশিষ্ট নাম দেওয়া হয়েছে 'ঘোড়াচুল'। দ্বাদশ শতাব্দীতে অমরকোষের বাঙালী টীকাকার সর্বানন্দ 'ঘোটাচুড়' এর উল্লেখ করেছেন—"কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচুড় ইতি খ্যাতে। ক্ষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্যে।" বলা বাহুল্য 'ঘোটাচুড়' 'ঘোড়াচুলে'র সংস্কৃত রূপ। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(৫) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ভারখণ্ড' নামে একটি অধ্যায় আছে। এতে রাধাকে সন্তুষ্ট করতে কৃষ্ণের ভার বহন করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যপরবর্তী যুগের অসংখ্য বৈষ্ণবগ্রন্থের কোথাও এই লীলার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু 'প্রেমামৃত' নামে একটি সংস্কৃত চম্পূকাব্যে এই লীলা বর্ণিত দেখা যায়।

প্রেমামৃত রূপ গোস্বামীর পূর্ববর্তী রচনা, কারণ রূপ গোস্বামী এই বই থেকে তাঁর 'পদ্যাবলী'তে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এর থেকে যেমন ভারবহন-লীলার প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই লীলা বর্ণিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরও প্রাচীনতা সূচিত হয়।

(৬) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাচ্ছি, তার মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। এর কিছু উদাহরণ দিই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাতটি পদে বড়ু চণ্ডীদাস নামের সঙ্গে 'অনন্ত' শব্দ যুক্ত দেখা যায়। এই সাতটি পদের ভণিতা নীচে উদ্ধৃত করছি (পৃষ্ঠাসংখ্যা তৃতীয় সংস্করণের),

"মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ।
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥" (দানখণ্ড, পৃঃ ২২)

"অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলীচরণে॥" (ঐ, পৃঃ ২৪)

"গাইল অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীগণে॥" (ঐ, পৃঃ ২৫)

"অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলীগণে॥" (বৃন্দাবন খণ্ড, পৃঃ ৮৪)

"বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডাদাসে॥" (বংশীখণ্ড, পৃঃ ১২৭)

"বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে॥" (রাধাবিরহ, পৃঃ ১৩৩)

"বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে॥" (রাধাবিরহ, পৃঃ ১৩৪)

এই সমস্ত ভণিতা থেকে অনেকে মনে করেছিলেন, চণ্ডীদাসের আর এক নাম ছিল 'অনন্ত'; সম্ভবতঃ অনন্তই আসল নাম, চণ্ডীদাস উপাধি আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় সর্বপ্রথম এই ধারণার বিরোধিতা করে লেখেন, "অনন্ত নামক এক গায়নের সাতটি পদ কৃ-পুথীর অঙ্গীভূত হইয়াছে।" উপরে উদ্ধৃত ভণিতাগুলি বিচার করে দেখলে যোগেশবাবুর মতের সমর্থনে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও যোগেশবাবু নিজে তা লক্ষ্য করেননি। অনন্ত যদি চণ্ডীদাসেরই নাম হত, তাহলে দু' জায়গায়

"অনন্ত (আনন্ত) বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে"

ভণিতা থাকত না। এর একমাত্র সঙ্গত অর্থ 'অনন্ত নামে বড়ু—চণ্ডীদাস (চণ্ডীদাস রচিত পালা) গান করল'। 'অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল'—এরও অর্থ তাই। দ্বিতীয় প্রমাণ, রাধাবিরহের ১৩৩ পৃষ্ঠার পদটিতে 'গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে' ভণিতা ছন্দোদুষ্ট—'আনন্ত' এখানে অতিরিক্ত শব্দ, সুতরাং প্রক্ষিপ্ত। সুতরাং 'অনন্ত' কবির নামান্তর নয়—গায়েনেরই নাম।

তারপর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে সমস্ত সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাদের সবগুলি না হোক্, কতকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অংশের সামঞ্জস্য নেই। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় নৌকাখণ্ডের উপসংহারের দুটি শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ করেছেন (সা. প. প.,১৩৪২, পৃঃ ৪২-৪৩)। ডঃ সুকুমার সেন দানখণ্ডের একটি শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলে দেখিয়েছেন (বা. সা. ই, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১৭৯, পা. টী.)। আমার মনে হয়, প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি অনন্ত নামক গায়েনই রচনা করেছিলেন, কারণ অনন্তের ভণিতাযুক্ত দানখণ্ডের "হাতে খড়ী করী বোলোঁ কাহ্ন" পদটি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির আনুষঙ্গিক ও পরিপূরক,

"সতীত্বং তব বিজ্ঞাতং রাধিকে বদ মাধিকং।
অধুনা মম দানস্য গণনায়াং মনঃ কুরু ॥"

পদটি যদি পরে সন্নিবিষ্ট হয়, তাহলে শ্লোকটিও তাই। কারণ পদটিকে বাদ দিলে শ্লোকটির কোন প্রয়োজনই থাকে না। অতএব শ্লোক ও পদ একই লোকের লেখা এবং একই সঙ্গে সন্নিবিষ্ট বলে মনে হয়।

যাহোক্, অনন্ত ভণিতাযুক্ত পদগুলি এবং কিছু সংস্কৃত পদ যখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে, তখন মূল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বয়স যে বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণের তুলনায় বেশী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান প্রচলিত সংস্করণকে যদি মাত্র ৩০০ বছরের পুরোনো ধরা যায়, তাহলেও মূল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অন্ততঃ ৪০০ বছরের পুরোনো বলতে হয়।

(৭) মৈথিলী ভাষার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণরত্নাকর চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে বর্ণরত্নাকরের ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন পদে রাগের ও তালের উল্লেখের সঙ্গে প্রায়ই কতকগুলি অপ্রাপ্তপূর্ব পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়, যেমন দণ্ডক, লগনী, চিত্রক লগনী, দণ্ডক লগনী, প্রকীর্ণক লগনী, বিচিত্র লগনী দণ্ডক, প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী, প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী

দণ্ডক, বিচিত্র, চিত্রা, বিচিত্রা প্রভৃতি। বর্ণরত্নাকরেও দণ্ডক, বিচিত্র, চিত্রা, বিচিত্রা, লগনী প্রভৃতি শব্দ এবং তাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই শব্দগুলি "গীত-অভিনয় সংকেতের নির্দেশক"। বর্ণরত্নাকরের সময় গীত অভিনয়ের যেসব সঙ্কেত, পদ্ধতি ও কলাকৌশল ছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যখন তাই পাওয়া যাচ্ছে, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

তারপর, ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, "জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণরত্নাকরে (চতুর্দ্দশ শতক) কুট্টিনীর যে বর্ণনা আছে তাহাতে [শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের] বড়ায়িরই প্রতিচ্ছবি পাই। পাণ্ডুরভঞ্ঞু শঙ্খাবদাত কেশ সঙ্কুলিত ত্বচ উন্নতি শিরা নির্মাংস কায় ভাঙ্গল কপোল ঝলল দাঁত বলে জীনল বএস বএসে জীনল বল বোল বোলইতেঁ জিহহি ওঠহিঁ লগা রাগী হস্তক সানে মেলাপক য়োআব মার্কণ্ডেক সহোদর জেঠি বহিনি অইসনি।"

বর্ণরত্নাকরের সঙ্গে এই মিল প্রাচীন ধারার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যোগ প্রমাণিত করে। এ দিক দিয়েও মনে হয়, এই বই ষোড়শ শতাব্দীর আগে রচিত হয়েছিল।

উপরে যে প্রমাণগুলি দেওয়া হল, তার পরে আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের রচনা এবং চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ শুনতেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তাঁরই লেখা হবার ষোল আনা সম্ভাবনা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে সমস্ত বিখ্যাত পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রয়েছে এবং গীতচন্দ্রোদয়, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদরসসার, কীর্তনামৃত প্রভৃতি পদসংকলনগ্রন্থে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত যে সমস্ত পদ ধৃত হয়েছে, সেগুলি কার লেখা?

একসময়ে সকলের ধারণা ছিল যে এই পদগুলি সমস্তই চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের লেখা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পরে এবং চৈতন্যপরবর্তী দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবার পরে হাওয়া বদলে গেল। তখন আবার একদল লোক বলতে লাগলেন এইসব বহুলপ্রচলিত পদগুলির একটিও চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের লেখা নয়। এই পদগুলি কার লেখা, সে সম্বন্ধেও দুরকম মত দেখা দিল। একদল বললেন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদই আস্বাদন করতেন। কিন্তু এ মত স্রেফ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের আগে বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা চিরকাল ধরে পদকর্তা চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপূর্ববর্তী বলে জেনে এসেছেন। তার বিপরীত

জিনিষটাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হলে অকাট্য প্রমাণের দরকার। সে রকম কোন প্রমাণ এঁরা দিতে পারেননি। এঁদের একমাত্র যুক্তি এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে এই পদগুলির ভাষা ও রুচির দিক দিয়ে আমূল পার্থক্য। ভাষার ব্যাপারে বলা চলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী দুয়ের কারোই মূল ভাষা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ নেই। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বলে তাতে ঐ অঞ্চলের আধুনিক ভাষার ছাপ পড়েছে। আর পদাবলীর প্রচার সারা বাংলায় ছিল বলে তাতে যে আধুনিক ভাষার ছাপ পড়েছে তা বাংলার আদর্শ ভাষা (Standard Bengali)। এই কারণে দুয়ের ভাষায় পার্থক্য দেখা যায়। রুচির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে সমগ্রভাবে দেখলেই আধুনিক রুচির বিচারে তাতে কিছু কিছু অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা দোষ ধরা পড়ে। কিন্তু এই অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা জয়দেবের গীতগোবিন্দের চেয়ে নিম্ন স্তরের নয়। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন এবং ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের উপর তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল বলে তাঁর কাব্যকে আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়ে কম অশ্লীল বলে মনে হয়। চণ্ডীদাসের বিচ্ছিন্ন পদগুলিতে যে অপেক্ষাকৃত উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিচ্ছিন্ন পদ বলেই। বৈষ্ণব ভক্তদের উন্নত রুচিবোধ চণ্ডীদাসের রুচিবিগর্হিত পদগুলিকে বাদ দিয়ে এই পদগুলিকেই সংগ্রহ করে সযত্নে রক্ষা করেছে। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ পদই আধুনিক রুচির বিচারেও উত্তীর্ণ হবে। আর একটা কথা। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সমস্ত পদেই যে খুব বিশুদ্ধ স্বর্গীয় রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ সম্বন্ধে যে সব চণ্ডীদাসনামাঙ্কিত পদ পাওয়া যায়, তার অনেকগুলিই নায়িকার উদগ্র দেহসৌন্দর্যের নিরাবরণ বর্ণনা এবং নায়কের জৈব ক্ষুধার অভিব্যক্তিতে পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে এই পদগুলির রুচির পার্থক্য খুব বেশী নয়। সুতরাং ভাষা ও রুচির দিক দিয়ে বিচার করলে চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের হাতে দিয়ে এই পদগুলির একটিও বেরোতে পারে না, এমন কথা বলা যায় না।

৺সতীশচন্দ্র রায় আর এক অভিনব মত প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাস (বড়ু) কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখেছিলেন আর চৈতন্যপরবর্তী চণ্ডীদাস (দীন) একখানি আখ্যানকাব্য মাত্র লিখেছিলেন (যার কথা আমরা পরে বলব)। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত বিখ্যাত

পদগুলি এঁদের কারও লেখা নয়, এগুলি জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বলরামদাস প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের লেখা, গায়েনরা ভণিতা পাল্টে চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছে। সতীশবাবুর এই সিদ্ধান্তের অন্য সব দিকের কথা বাদ দিলেও এর মধ্যে যে বিরাট অসঙ্গতি রয়েছে, তা সকলেই উপলব্ধি করবেন। এই পদগুলির জন্যেই চণ্ডীদাসের এত খ্যাতি, এরই জন্যে তাঁর নাম বাঙালীর স্মৃতিতে ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, আর সতীশবাবু বলছেন চণ্ডীদাস নামক কোন কবি এদের একটিও লেখেননি। যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও যে আখ্যানকাব্যের নামও কিছুদিন আগে বিশেষ কেউ শোনেননি, সেইগুলি ছাড়া চণ্ডীদাস নামক কবিদের আর কোন কীর্তি নেই! এমনিতেই এ মত বিবেচনার যোগ্য হতে পারেনা। বলা বাহুল্য এ মতের স্বপক্ষে প্রমাণও কিছু নেই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখক চণ্ডীদাস এই পদগুলির সব না হোক্, অনেকগুলির যে লেখক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা এবং বাশলী বা বাসলীর বন্দনা দেখা যায়। পদাবলীর মধ্যেও অনেক জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা ও বাশলী বা বাশুলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর, চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদগুলি বিরহের আকুল আর্তি এবং আত্মবিস্মৃত প্রেমের অভিব্যক্তির জন্যই প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ড ও বিরহখণ্ডেও ঠিক এই ভাবই পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত বহু পদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ড ও বিরহখণ্ডের সুরসাম্য দেখিয়েছেন (সা. প. প., ১৩৩৬, পৃঃ ১৯৯-২১৪ দ্রঃ)। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদই আস্বাদন করতেন বলেও বিশ্বাস করা যায় না। মহাপ্রভু যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করতেন তাহলে এই কাব্য ভক্ত বৈষ্ণবদের মাথার মণি হয়ে থাকত, এরকম ভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত না। আসল কথা হচ্ছে এই যে, চৈতন্য-পূর্ববর্তী চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়াও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বহু বিচ্ছিন্ন পদ লিখেছিলেন। এই পদগুলিই শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করেছিলেন এবং এই পদগুলিই চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতিকে চিরদিন অম্লান রেখেছে। আধুনিক সমালোচকদের কেউ কেউ এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে "শ্রেষ্ঠ কাব্য" বলেছেন বটে, কিন্তু সে যুগের রসবোধ চণ্ডীদাসের মত মহাকবির রচনা হওয়া সত্ত্বেও এবং সনাতন গোস্বামীর সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে স্বীকার করেনি।

উপরে আমরা যে মন্তব্য করলাম, তার সমর্থনে কিছু প্রাচীন নজীর উদ্ধৃত করা দরকার মনে করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে নরহরি চক্রবর্তী চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের চরণ বন্দনা করেছেন,

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ন গাওত জগত জনে॥
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপ-পতি শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া
যার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ লৈয়া॥

এবং তাঁর কিছু পরে বৈষ্ণবদাস জয়দেব ও বিদ্যাপতির সঙ্গে চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের বন্দনা করেছেন,

জয় জয়দেব কবিনৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল গদ্যপদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় রামানন্দ সহিত॥

নরহরি চক্রবর্তী একখানি পদসংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম 'গীতচন্দ্রোদয়'। বৈষ্ণবদাসের পদসঙ্কলন গ্রন্থ 'পদকল্পতরু'র নাম সকলেই জানেন। এই দুই সঙ্কলন-গ্রন্থে চণ্ডীদাস ভণিতার বহু পদ উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটিও পদ নেই। অথচ এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের প্রচার নিশ্চয়ই ছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি এরই কাছাকাছি সময়ে লিপিকৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়, এবং মহাপ্রভু তা আস্বাদন করেননি জেনেই নরহরি ও বৈষ্ণবদাস তাকে উপেক্ষা করেছেন, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ৩য় পরিচ্ছেদে বলেছেন যে, সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরে মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ীতে আসেন, তখন সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত তাঁকে এই গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন,

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জরে॥
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ্।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ্ তাহাঁ উড়ি যাঙ্॥

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি পাতড়াতে এই গানটি আরও ছটি কলি সমেত চণ্ডীদাসের ভণিতায় পেয়েছেন (চণ্ডীদাস পদাবলী. হরেকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ২১-২২)। এর থেকেও বোঝা যায়, চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করতেন না, চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বিচ্ছিন্ন পদই আস্বাদন করতেন।

চণ্ডীদাস যে পদাবলী এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক আখ্যানকাব্য দুইই লিখেছিলেন, এসম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকেই কিংবদন্তী আছে। ১২৮০ বঙ্গাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখেছিলেন, "পদাবলী ব্যতীত চণ্ডীদাসের আর কোন গ্রন্থ আছে কিনা জানা যায় না। কেবল কৃষ্ণকীর্তন নামে একখানি গ্রন্থ ছিল, কোন কোন পুস্তকে এই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় (মহাজনপদাবলী, পৃঃ ৪৬)। ১৩০০ বঙ্গাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখেছিলেন, 'তাঁহার (চণ্ডীদাসের) পূর্ণগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাওয়া যায় নাই. কয়েকটি খণ্ডকবিতামাত্র পাওয়া গিয়াছে" (নব্যভারত, ১৩০০ ফাল্গুন)। ১৩০১ বঙ্গাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, "তিনি (চণ্ডীদাস) কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে যে কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই" (বিদ্যাপতি, পৃঃ ৫০)। ১৩১১ বঙ্গাব্দে ব্রজসুন্দর সান্যাল লিখেছিলেন, "চণ্ডীদাসের পুস্তকের নাম গীতচিন্তামণিই হউক বা কৃষ্ণকীর্তনই হউক, তিনি যে ধারাবাহিক রূপে কৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই (চণ্ডীদাসচরিত, পৃঃ ১০০)।

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কতকগুলি যে প্রাচীন যুগের রচনা, তা তাদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে বোঝা যায়। এরকম একটি প্রমাণ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "চণ্ডীদাসের নামীয় প্রাচীন পদাবলীতে কৃষ্ণের তুলনা দিতে অতসী ফুলের নাম পাওয়া যায়। অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনায়র—চণ্ডীদাস (নীলরতন) পৃঃ ৩১৬। প্রাচীন কালে অতসী ফুল যেনীলবর্ণের হইত, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতেই জানা যায়—,

(১) নীল অতসীর ফুল তাহে ছিল।—চণ্ডীদাস (নীলরতন), পৃঃ ৫২।

(২) অতসীর ফুল তুলি মনোহর
যতন করিয়া পরি।—ঐ পৃঃ ২৫০

প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যাতেও অতসীকে পরিষ্কার ভাবে 'নীলপুষ্প' বলা হইয়াছে। তার পর, নানা গ্রন্থেও অতসী ফুলের নীলবর্ণের কথা আছে—

(১) অতসীকুসুমশ্যামঃ।—বৃহৎ সংহিতা—৫৮.৩২

(২) অতসীপুষ্পসঙ্কাশং—পদ্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড ৭৩.২. ২১২; ৩৬; বৃহন্নারদীয়পুরাণ ১৫।৬৮, ৩৬।৪০......

এই নীলবর্ণ অতসী পরবর্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে পীতবর্ণরূপে গণ্য হইয়াছে। এখন আমরা যে অতসীর কথা জানি, তাহা পীতবর্ণ। রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, তিন শত বৎসর হইতে অতসীর সাহিত্যিক বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তিনি কবিকঙ্কণচণ্ডীর নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে দেখাইয়াছেন, অতসী তখন পীতবর্ণরূপে গণ্য হইয়াছে—অতসীকুসুম বর্ণ।—কবিকঙ্কণচণ্ডী (বঙ্গবাসী সং) পৃঃ ৫৮।"

সুতরাং চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত যেসব পদে নীল অতসীর উল্লেখ আছে, সেগুলি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের শতাধিক বর্ষ পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা বলেই মনে হয়।

যা হোক্, চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাস যে পদরচনা করেছিলেন, এবং সেইজন্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সমস্ত পদই যে চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের লেখা, সে কথা কোন মতেই বলা চলে না। এর মধ্যে বহু পদ অন্যান্য চণ্ডীদাসের লেখা, যাঁদের সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। কতক পদ অন্য অনেক বিখ্যাত কবির লেখা, এগুলি গায়েন বা লিপিকরদের অসাবধানতায় ভণিতা পাল্‌টে চণ্ডীদাসের নামে চলে গেছে। অনেক পদ পরবর্তী কালের কবিরা লিখে চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন, যেমন অনেক গ্রন্থকার কালিদাসের নামে নিজেদের গ্রন্থ চালিয়ে দিয়েছেন, এঁদের উদ্দেশ্য নিজেরা অখ্যাতনামা থেকে নিজের রচনাকে অমর করা। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর পদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু এদের বাদ দিলে যা থাকে, তা চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসেরই রচনা। অবশ্য চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের লেখা পদগুলি চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অন্যান্য পদ থেকে বাছাই করে নেওয়া খুবই শক্ত, এমনকি অসম্ভব বললেও হয়। আপাততঃ যে সমস্ত পদে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা এবং বাশুলীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলিকে চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের লেখা বলেই নিতে পারি। ডঃ শহীদুল্লাহর মতে এই জাতীয় পদেরও কতকগুলি চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের লেখা নয়। তাঁর যুক্তি,

(১) এই সমস্ত পদের ভণিতার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতার মিল নেই।

(২) এই সব পদের দু একটির ভাষা ও ভাবে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম যুক্তিটি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বহু

আগেই খণ্ডন করেছেন। এই সব বিচ্ছিন্ন পদের ভণিতা সম্পূর্ণভাবে গায়েনদেরই মর্জির উপর নির্ভর করত। তাই একই পদের বহুরকম ভণিতা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত সুসংবদ্ধ আখ্যানকাব্যে ভণিতার যে স্থৈর্য ও ঐক্য থাকা স্বাভাবিক, এদের মধ্যে তা আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বড়ু চণ্ডীদাস আখ্যানকাব্যের মধ্যে একরকম ভণিতা দিয়েছেন বলে বিচ্ছিন্ন পদের মধ্যে আর একরকম ভণিতা দিতে পারেন না, এরকম মনে করার কোন অর্থ হয় না।

ডঃ শহীদুল্লাহর দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা যায়, চণ্ডীদাসের মত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবির পদ লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকলে তার মধ্যে স্থানে স্থানে আধুনিক ছাপ পড়া শুধু স্বাভাবিক নয়, অনিবার্য। তাছাড়া যেসব ভাবকে ডঃ শহীদুল্লাহ আধুনিক বলে মনে করছেন, তা যে চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে ছিল না, সেরকম কথা জোর করে বলা যায় না।

মোটের উপর, বড়ু চণ্ডীদাস ও বাশুলীর নামযুক্ত ভণিতা যেসব পদে পাওয়া যায়, অকাট্য বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকলে তাদের বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা বলেই গ্রহণ করা চলে। কিন্তু চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অন্যান্য পদগুলির থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বেছে নেওয়া শক্ত। যে সমস্ত পদে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা পাওয়া যায় এবং যেগুলি প্রাচীন পুঁথিতে অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া যায়, সেগুলি যে বড়ু চণ্ডীদাসের নয়, তা সহজেই বলা যায়। যে সমস্ত পদে শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতা আছে, আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে তাদেরও মধ্যে কতকগুলিকে চৈতন্যপরবর্তী যুগের রচনা, সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা নয় বলে প্রমাণ করা যায়। এই জাতীয় পদের কিছু দৃষ্টান্ত দিই।

(১) আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে-আল।

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এইরূপ হইবে কোন্ দেশে॥

(২) অকথন বেয়াধি কহনে নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলী যেন ধূলায় লোটায়॥

(৩) কানড় কুসুম করে পরশ না করি ভরে এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সদাই শুনিতে পাই কানে কানে কহে ওনা কথা॥

চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা॥

এই তিনটি পদে শ্রীচৈতন্যদেবকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে স্বতঃই মনে হয়।

(৪) আগো, রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকই একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
মহাযোগিনীর পারা॥

(প্রচলিত পাঠে 'মহাযোগিনীর পারা'র জায়গায় 'যেমতি যোগিনী পারা' দেখা যায়, কিন্তু 'যেমতি' ও 'পারা'র একত্র প্রয়োগের জন্য এই পাঠ সুষ্ঠু নয়। এই কারণে হরেকৃষ্ণ ও সুনীতিকুমার সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী'র ৫১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠান্তর 'মহাযোগিনীর পারা'কেই প্রকৃত পাঠ বলে আমরা মনে করি।)

এই কবিতাংশটি উজ্জ্বলনীলমণির নিম্নোদ্ধৃত অংশের ভাবানুবাদ বলে মনে হয়,

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি॥

—ব্যভিচারিবিবৃতি প্রকরণ, শ্লোক ৬৭

বিখ্যাত 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' পদের সঙ্গে রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' শ্লোকের অংশবিশেষের অনুরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ঐ পদটি সর্বত্র 'দ্বিজ চণ্ডীদাসে'র ভণিতায় পাওয়া যায় বলে এখানে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(৫) বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥

'এলে' (<আইলে) এই অভিশ্রুতিনিষ্পন্ন পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থাকতে পারে না। 'এলে'র সঙ্গে 'গেলে'র মিল থেকে সহজেই বোঝা যায়, এই পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে রচিত।

যাহোক্, চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের কীর্তি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া গেল। এখন, তিনি ঠিক্ কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন, তা স্থিরভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক্। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকটি আরবী-ফারসী শব্দ পাওয়া যায়; যেমন, মজুরী, মজুরিআ, খরমুজা, বাকী, কুতঘাট। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে মুসলমানরা বাংলাদেশ জয় করেন। সুতরাং আরবী-ফারসী শব্দগুলি বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যেতে, বিশেষ করে 'মজুর' এর সঙ্গে 'ইআ' প্রত্যয় যোগ করে 'মজুরিআ' শব্দ গঠিত হতে অন্ততঃ দুশো বছর সময় লেগেছিল বলে ধরতে পারি। এই হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব-কালের উর্ধ্বতম সীমা ১৪০০ খৃষ্টাব্দের আগে যাবে না।

১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণ করেন ও তার অব্যবহিত পরেই চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করেন বলে চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায়। অতএব ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ধরা যায়।

চণ্ডীদাসের এই নিম্নতম সীমা নির্ধারণ আর এক দিক থেকেও সমর্থিত হয়। 'প্রেমামৃত' বা 'গোপালচরিত' নামে একটি প্রাচীন সংস্কৃত চম্পূকাব্যে বসন-চৌর্য, ভারকাণ্ড, নৌকাকাণ্ড ও দানখণ্ড নামে কৃষ্ণের চারটি লীলা পাওয়া গিয়েছে। রূপ গোস্বামী তাঁর 'পদ্যাবলী'তে এই প্রেমামৃতের তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন এবং তাদের মধ্যে দুটিকে 'মনোহরকস্য' বলে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, 'প্রেমামৃত' রচয়িতা ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের আগেই বর্তমান ছিলেন, এবং তাঁর নাম ছিল মনোহর। ৺সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণিত লীলার সহিত 'প্রেমামৃত' কাব্যের 'বসন-চৌর্য্য', 'ভার-কাণ্ড', 'নৌকা-কাণ্ড' ও 'দান-খণ্ড' লীলা-চতুষ্টয়ের···বর্ণনার চমৎকার ঐক্য" আছে। এর থেকে মনে হয়, 'প্রেমামৃত'-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অনুসরণ করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কার 'প্রেমামৃত'কে অনুসরণ করেছেন বলা চলবে না, কারণ সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসকে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের আদি প্রবর্তক বলেছেন। অতএব চণ্ডীদাস ১৫০০ খৃষ্টাব্দেরও আগে বর্তমান ছিলেন বলে এর থেকে প্রতীয়মান হয়।

এখন আমরা দেখাবার চেষ্টা করব যে, চণ্ডীদাস মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। এসম্বন্ধে 'পদকল্পতরু'র (সাহিত্য-পরিষৎ সং) ২৩৮৮ নং পদটির সাক্ষ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদটি এই;

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁজন পিরীতি প্রেম-মুরতিময় কাঁতি।
যে করিল দুহুঁজন লীলাগুণ বর্ণন নিতি নিতি নব নব ভাতি॥
দুহুঁ-গুণ শুনি চিত দুহুঁ উৎকণ্ঠিত দুহু দোহাঁ দরশন লাগি।
দোহাঁর রসিকপন শুনি শুনি দুহুঁজন দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি।
নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল তা সঞে করত বিচার।
তাহে নিতি নবিন পরম সুখ পাওত আনন্দ প্রেম অপার॥
রূপনরায়ণ বিজয়নরায়ণ বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মীলন ভাবি দুহুঁক করু বর্ণন তছু পদ-কমলক ভৃঙ্গ॥

পদটিতে বলা হয়েছে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি নিজেদের সহচরদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেমরস উপভোগ ও বিচার করতেন। এই সহচরদের মধ্যে চারজনের নামও উল্লিখিত হয়েছে—রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহ। এঁদের মধ্যে শিবসিংহের নাম বিখ্যাত। কিন্তু অপর নামগুলি অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ, এবং একমাত্র সমসাময়িক ভিন্ন আর কোন কবির পক্ষে এই নামগুলি বসিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বিজয়নারায়ণের নাম কেবলমাত্র মিথিলার রাজপঞ্জীতে পাওয়া যায় আর বৈদ্যনাথের নাম পাওয়া যায় কেবলমাত্র মিথিলায় প্রচলিত কয়েকটি হরগৌরী বিষয়ক পদে। অথচ আলোচ্য পদটি কেবলমাত্র বাংলাদেশেই পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির বিভিন্ন পদে শিবসিংহের 'রূপনারায়ণ' বিরুদের কথা পাওয়া যায়; সে সময় মিথিলার রাজপরিবারে অন্য কোন রূপনারায়ণ ছিলেন বা থাকতে পারেন, সে রকম কোন আভাস তাদের মধ্যে মেলে না। অথচ শিবসিংহের সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র ভৈরবসিংহেরও 'রূপনারায়ণ' বিরুদ ছিল, বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' এবং সমসাময়িক স্মার্ত গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্রের 'মহাদাননির্ণয়' থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পদটিতে (১) বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথ—বাংলাদেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিদ্যাপতির এই দুজন পৃষ্ঠপোষকের নাম এবং (২) শিবসিংহ ছাড়াও বিদ্যাপতির আর একজন 'রূপনারায়ণ' নামে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—বাঙালীর অগোচর এই তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। পরবর্তী যুগের কোন বাঙালী কবি একটি জাল পদে সত্যের প্রলেপ দেবার জন্যে মিথিলায় গিয়ে বিস্তর গবেষণা করে এই সব নাম উদ্ধার

করেছেন—এরকম কল্পনা আশা করি কেউ করবেন না। মিথ্যার উপর সত্যের প্রলেপ দেবার এরকম সূক্ষ্ম ফন্দি তখনকার লোকে জানতেন বলে ভাবা যায় না। তাছাড়া বিদ্যাপতির বাড়ী যে মিথিলায় ছিল, একথাও ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালীরা জানতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় আমরা পদটিতে বর্ণিত ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য।

সুতরাং চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে মিলন হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিলনের আগে যখন দুজনের মধ্যে গীতিবিনিময় চলছিল, তখন শিবসিংহ বর্তমান ছিলেন বলে উদ্ধৃত পদটি থেকে জানা যায়। কিন্তু তাই বলে শিবসিংহের রাজত্বকালেই দুই কবির মধ্যে মিলন ঘটেছিল, এরকম মনে করবার কারণ নেই।

পূর্বোক্ত পদটি ছাড়া 'পদকল্পতরু'র (সা. প. সং) ২৩৮৯, ২৩৯০ ও ২৩৯১ সংখ্যক পদেও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন বর্ণিত হয়েছে। ২৩৮৯ সংখ্যক পদে বলা হয়েছে. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা করবার জন্য রূপনারায়ণকে নিয়ে যাত্রা করেন, চণ্ডীদাসও কিছুদূর এগিয়ে যান, পথে দুজনের দেখা হয়। এই পদটি ২৩৮৮ সংখ্যক পদেরই অনুবৃত্তি এবং প্রামাণিক পদ বলে আমাদের মনে হয়। কিন্তু ২৩৯০ ও ২৩৯১ সংখ্যক পদকে আমরা অপ্রামাণিক পদ বলে বিবেচনা করি। কারণ এই দুটি পদে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে দিয়ে সহজিয়া তত্ত্ব আলোচনা করানো হয়েছে। ২৩৯০ সংখ্যক পদের ভণিতাই তার অপ্রামাণিকত্বের প্রমাণ,

> পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুনতহি রূপনরাণ।
> কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ লছিমা পদ করি ধ্যান॥

মিথিলার বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' উপাধি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' থেকে জানা যায় যে, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের 'কবিরঞ্জন' নামে এক শিষ্য কবি ছিলেন এবং তাঁর উপাধি ছিল 'ছোট বিদ্যাপতি'। কিন্তু তিনি 'লছিমা পদ' ধ্যান করবেন কি করে? অর্বাচীন সহজিয়ারা মৈথিল বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির পার্থক্য জানতেন না বলে মনে হয়। তাঁদেরই মধ্যে কোন একজন লোক এই জাল পদটি লিখেছিলেন সন্দেহ নেই। অথচ এই জাল পদটির উপর নির্ভর করেই কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করে বসেছিলেন যে চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির

মধ্যে দেখা হয়নি, চৈতন্যপরবর্তী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি ও দীন চণ্ডীদাসের মধ্যে দেখা হয়েছিল।

আসলে, নিজেদের স্বার্থে সহজিয়ারা চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মুখ দিয়ে সহজিয়া তত্ত্ব বর্ণনা করিয়ে এই দুটি পদ ও এই জাতীয় আরও বহু পদ লিখেছিলেন। এপর্যন্ত তিনটি পুঁথিতে এরকম কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়েছে (সা. প. প., ১৩৪৬, পৃঃ ২০৩-২০৬ এবং কোচবিহার দর্পণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ দ্রষ্টব্য)। প্রামাণিক বলে বিবেচিত 'পদকল্পতরু'র ২৩৮৮ ও ২৩৮৯ সংখ্যক পদ দুটি তাদের মধ্যে পাওয়া যায় নি, সুতরাং এ দুটি সহজিয়াদের লেখা নয়, তা সহজেই বোঝা যায়।

চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটি সূত্রের দিকে ডঃ সুকুমার সেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন নামে একজন পণ্ডিত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের গণপাঠের বৃত্তি রচনা করেছিলেন 'গণমার্ত্তণ্ড' নামে। 'গণমার্ত্তণ্ডে'র প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে নৃসিংহ পূর্বপুরুষদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন, তার থেকে জানা যায়, তাঁর উর্ধ্বতন দশম পুরুষের নাম ছিল চণ্ডীদাস। নৃসিংহ পিতাকে বলেছেন "চণ্ডিদাসকুলাব্জার্ক" এবং নিজের পরিচয় বার বার দিয়েচেন "চণ্ডিদাস-কুলোৎপন্ন", "চণ্ডিদাসকুলোদ্ভব" প্রভৃতি বলে। এই কারণে ডঃ সুকুমার সেন এঁকেই কবি বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে অভিন্ন ধরতে চান। নৃসিংহ যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান থাকেন, তাহলে তাঁর উর্ধ্বতন দশম পুরুষ চণ্ডীদাস নিশ্চয়ই পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং সময়ের দিক দিয়ে তাঁর বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে অভিন্ন হতে বাধা নেই। কুলগ্রন্থের মতে 'গণমার্তণ্ড'-কার নৃসিংহের পূর্বপুরুষ চণ্ডীদাস কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠতাত ভৈরবের পৌত্র অর্থাৎ কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র (প্রবাসী, ১৩৫৬, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৭ দ্রঃ)। 'গণমার্তণ্ড'কার নিজেই কুলগ্রন্থের উক্তির সমর্থন করেছেন চণ্ডীদাসকে "ধীরশ্রীনৃসিংহজে মুখকুলে জাত" বলে। কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম নৃসিংহ মুখটি, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে যিনি 'নারসিংহ ওঝা' নামে উল্লিখিত হয়েছেন। ইনি ভারতচন্দ্রেরও পূর্বপুরুষ, কারণ ভারতচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে অন্নদামঙ্গলে বলেছেন, "ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়"। সুতরাং কুলগ্রন্থে প্রদত্ত নৃসিংহের বংশপরিচয় সত্য বলেই মেনে নিতে পারি। কৃত্তিবাস পঞ্চদশ

শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন এবং ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষে বা চতুর্থ পাদের প্রথমে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তা আমরা এই বইএর অন্যত্র দেখাবার চেষ্টা করেছি। সুতরাং তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র চণ্ডীদাসও পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। এই চণ্ডীদাস যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা হন, তাহলে বলতে হবে বাংলার দুই প্রাচীন মহাকবির মধ্যে খুড়ো-ভাইপো সম্পর্ক ছিল। এরকম হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয়, সময়ের দিক দিয়েও বাধা নেই; কিন্তু এই দুই চণ্ডীদাসকে অভিন্ন বলার পক্ষে আরও স্পষ্ট ও দৃঢ় তথ্যপ্রমাণ দরকার।

চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত জানালাম। এখন আর একটি প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। সেটি হচ্ছে এই যে, তাঁর দেশ কোথায় ছিল। এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা এই চণ্ডীদাসকে অন্যান্য চণ্ডীদাসদের থেকে পৃথক করা যাবে।

বাঁকুড়ার ছাতনা আর বীরভূমের নান্নুর, এই দুই জায়গাই নিজেদের চণ্ডীদাসের দেশ বলে দাবী করে। দুটি জায়গার প্রসিদ্ধিই বেশ পুরোনো। নান্নুর বা নাদুড়ের নাম অকিঞ্চনের বিবর্তবিলাস, তরুণীরমণের সহজ-উপাসনাতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এছাড়া নরহরি ও রায়শেখরের নামাঙ্কিত দু' একটি পদেও পাওয়া যায়, যাদের অকৃত্রিমতা সন্দেহের বিষয়। চণ্ডীদাসের বাড়ী যে ছাতনায় ছিল এই কথা শুধু 'পদ্মলোচন শর্মা' রচিত 'বাসলীমাহাত্ম্য' এবং 'কৃষ্ণপ্রসাদ সেন' রচিত 'চণ্ডীদাস-চরিত' নামে বই দুটিতে পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়। দুটি বইএর কোনটিই অকৃত্রিম নয়। বিশেষ করে 'চণ্ডীদাস-চরিতে'র প্রত্যেকটি পংক্তিই যে একান্ত আধুনিক কালের জাল, তা ৺বসন্তরঞ্জন রায় ও ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমাণ করেছেন। এর থেকে অনেকের ধারণা হয়েছে ছাতনায় চণ্ডীদাসের বাসভূমি সম্বন্ধে কোন প্রাচীন প্রবাদ ছিল না। ছাতনার কয়েকজন পক্ষপাতী নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে দুটি জাল বই খাড়া করেছিলেন। তার ফলে সাধারণে তাঁদের প্রতি সমর্থন হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ছাতনায় চণ্ডীদাসের দেশ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি যে নতুন নয়, তার প্রমাণ আমি অন্য সূত্র থেকে পেয়েছি। এখানে চারটি প্রমাণ উল্লেখ করছি,

(১) ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বেগলার The Reports of the Archœological Survey of India, Vol. VIII এ ছাতনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "Tradition identifies chhātnā with Vāsuli or Vāhuli nagara,

At Daksha's sacrifice, it is said, one of the limbs of Pārvati fell here, which thence derived its name of Vāsuli Nagara or Bāhulya Nagara, a name mentioned in the old Bengali poet Chandi Dās."

(২) ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর ২৯ পৃষ্ঠায় ন্যায়রত্ন মশায় লিখেছেন, "বিষ্ণুপুরস্থ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মহাশয় বিদ্যাপতির বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য ঐ প্রদেশে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল লোকপরম্পরায় এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঁকুড়া জেলার ছাতনা প্রদেশে বিদ্যাপতির বাস ছিল।" এক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের সেই "শিক্ষক মহাশয়" অথবা তাঁর সংবাদদাতা উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে 'চণ্ডীদাসে'র জায়গায় 'বিদ্যাপতি' করেছেন বলে মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বিদ্যাপতির দেশ যে মিথিলায়, তা তখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

(৩) ১৯৫৫ সালে ডঃ সুকুমার সেন রূপরামের ধর্মমঙ্গলের একটি পুঁথির দিক্-বন্দনা পালার দুটি ছত্রের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এটি হচ্ছে বর্ধমান সাহিত্য সভার ৫৫৬ নং পুঁথি। ছত্র দুটি এই,

"ছাতনার বাসলি বন্দো বন্দ্যা কত কবি।
বিষ্ণুপুরের বাহিরে বন্দিব চেঙ্গডুবি॥"

প্রথম ছত্রের অর্থ এই—'ছাতনার বাসলীকে বন্দনা করি, যাঁকে বন্দনা করে কত লোক কবি হয়েছে'। এখানে নিঃসন্দেহে চণ্ডীদাসের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নান্নুর আর ছাতনা দুজায়গাতেই চণ্ডীদাসকে দাবী করে, এর মধ্যে একটি নিগূঢ় কারণ আছে। সেটি হচ্ছে এই, বাংলাদেশে চণ্ডীদাস নামে দুজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। একজন চৈতন্যপূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস, যাঁর কথা সবেমাত্র বলেছি। আর একজন চৈতন্যপরবর্তী দ্বিজ চণ্ডীদাস, এঁর কথা একটু পরেই বলব। এঁদের মধ্যে একজনের বাড়ী ছিল ছাতনায়, আর একজনের নান্নুরে। কার বাড়ী কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে আমাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে চৈতন্যপরবর্তী দ্বিজ চণ্ডীদাসেরই বাড়ী ছিল নান্নুরে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূলে প্রমাণ একটু পরেই দেখাব। আপাততঃ বড়ু চণ্ডীদাসের দেশ ছাতনায় ছিল—এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপিত করছি। বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বারবার 'বাশলী'র বন্দনা করেছেন। ছাতনা গ্রামে

সত্যই বাশলী বা বাশুলী দেবীর মূর্তি ও মন্দির রয়েছে। নান্নুরে তা নেই। নান্নুরে এই শতাব্দীর প্রথমে মাটী খুঁড়ে একটি প্রতিমা পাওয়া গেছে, এটি বাগীশ্বরী বা সরস্বতীর মূর্তি। এক সময় অনেকে 'বাশুলী'কে 'বাগীশ্বরী'র অপভ্রংশ ধরে এই মূর্তিকেই বাশুলীর মূর্তি ভাবতেন। কিন্তু এখন পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার ফলে এই মত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বিচিত্র সাহিত্য' প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১০৫, পাদটীকা) লিখেছেন, "নান্নুরের মূর্তি কিছুতেই বাশুলী নয়।" ধর্মপূজাবিধানে বাশুলীর যে ধ্যান পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ছাতনার মূর্তির পরিপূর্ণ মিল আছে, কিন্তু নান্নুরের মূর্তির কোনই মিল নেই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি এবং তার কয়েকটি পদ সংবলিত পুঁথি দুখানি বিষ্ণুপুরেই ছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সঙ্গে বাঁকুড়ার ভাষার সাম্যও দেখিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত একটি পদে পাওয়া যায়, 'শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠস্থান'—সেখানে চণ্ডীদাসের সাধনা সুরু হয়েছিল। ছাতনার থেকে অদূরে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘটী থানায় 'শালতোড়া' নামে একটি গ্রাম আছে। এই নামের আরও অনেকগুলি গ্রাম বাঁকুড়া ও মানভূম জেলায় আছে, বীরভূম জেলায় আছে বলে শুনিনি। এইসব বিষয় মিলিয়ে দেখে আমাদের মনে হয়, চৈতন্যপূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে একটি বিষয় সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেক জায়গায় 'গাইল চণ্ডীদাস বাসলী গণ' ভণিতা পাওয়া যায়। 'গণ' শব্দের অর্থ শিষ্য, পার্ষদ, সঙ্গী। তাহলে 'বাসলী' কি মূলে মানুষ ছিলেন এবং চণ্ডীদাস তাঁর 'গণ' ছিলেন? আশ্চর্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হবার আগে অনেকে ঠিক্ এই কথা বলেছেন। 'নব্যভারত' পত্রিকার ১২শ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যায় একজন লেখক লিখেছিলেন, "নিত্যা দেবীর যে কয়েকটি সহচরী বা ডাকিনী ছিল, তাহার মধ্যে বাশুলী নামা দ্বিজ কন্যা প্রধানা ছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে ('নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল', 'পুন আর বার আসি তরাতর' ও 'শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠ-স্থান'), যাদের মধ্যে বাসলীকে মানবী সিদ্ধা বা ডাকিনী এবং চণ্ডীদাস ও রামীর সংযোগস্থাপিকা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের মৃত্যুর পর দেবতায় রূপান্তরিত হবার নিদর্শন এদেশে বহু পাওয়া যায়,

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ভানু'র উল্লেখ করা যায়। বাশুলীর বেলায়ও যদি তাই হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়ে, যেহেতু দেবতা বাশুলীর ঐতিহ্য অন্ততঃ তিনশো সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "দেবী বাসলীচরণে", "দেবী বাসলীগণ", "দেবী বাসলীবরে," "বন্দিআঁ দেবী বাসলী" প্রভৃতি উক্তি দেখা যায় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে "শ্রীরাধার গণ", "বিশাখার গণ" প্রভৃতি প্রয়োগ পাওয়া যায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না। তবুও বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে অনুসন্ধান করা উচিত।

দ্বিজ চণ্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় আমরা চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত কতকগুলি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি যে, এই পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এগুলি পড়লেই মনে হয় চৈতন্যদেবের আদর্শ সামনে রেখে এরা রচিত। উপরন্তু এদের রসের ক্রমের সঙ্গে চৈতন্যপরবর্তী যুগের আলঙ্কারিক গ্রন্থ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির রসের ক্রমের প্রায়-অভিন্নতা দেখা যায়। কয়েকটি পদের উপর 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি চৈতন্যপরবর্তী গ্রন্থের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পদগুলি এত চমৎকার যে কোন মহাকবি ভিন্ন আর কেউ এদের রচয়িতা হতে পারেন বলে ভাবা যায় না। এইজাতীয় অত্যুৎকৃষ্ট পদ পদকল্পতরু প্রভৃতি পদসঙ্কলনগ্রন্থে এবং অন্যত্র অনেকগুলিই পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে বাঙালী এই পদগুলির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন এবং অনেকাংশে এই পদগুলির জন্যেই চণ্ডীদাস নামটি অমরত্ব লাভ করেছে। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই পদগুলি কার লেখা ?

অবশ্য এই পদগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি সেইসব কবিরই লেখা, চণ্ডীদাসের নয় মনে করলে কোন অন্যায় হবেনা। কিন্তু তাছাড়াও বহু শ্রেষ্ঠ পদ রয়েছে যা চণ্ডীদাস ছাড়া আর কারও ভণিতায় পাওয়া যায় নি। যেমন, সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, আগো রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা, বঁধু কি আর বলিব আমি, এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, সই কহবি কানুর পায়, তড়িৎ বরণী হরিন নয়নী দেখিনু আঙিনা মাঝে, যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে, পিয়া সে পরশ মণি ইত্যাদি।

এই পদগুলির রচনাকর্তৃত্ব বড়ু চণ্ডীদাসের উপর অর্পণ করা চলে না, কারণ এগুলি চৈতন্যপরবর্তী যুগের প্রভাবযুক্ত। সুতরাং চৈতন্যপরবর্তী যুগে

চণ্ডীদাস নামে একজন কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনিই এগুলি লিখেছিলেন বলে মনে করতে হয়। চৈতন্যপরবর্তী যুগে দীন চণ্ডীদাস নামে একজন কবির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের অসন্দিগ্ধ রচনার সঙ্গে এই পদগুলির রচনাশৈলীর এতখানি তফাৎ যে একই কবি এই দুই শ্রেণীর রচনা লিখতে পারেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া, শ্রেষ্ঠ পদগুলির একটিতেও 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতা পাওয়া যায়নি, প্রামাণিক পদসঙ্কলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে একটিও 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত পদ ধৃত হয়নি এবং দীন চণ্ডীদাসের লেখা পদসমষ্টির যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে জনপ্রিয় পদগুলির একটিও পাওয়া যায়নি। এইসমস্ত কারণে মনে হয়, চৈতন্য-পরবর্তী যুগে আর একজন চণ্ডীদাস নামে কবি ছিলেন, তিনিই এই অমর পদগুলি রচনা করে গিয়েছেন। এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা আছে। এক পদকল্পতরুতেই 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতায় ২০টি পদ পাওয়া যায়। সেজন্যে মনে হয় এই কবির বিশিষ্ট নাম ছিল 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'।

উপরে যে আলোচনা করা হল, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে একজন চৈতন্যপরবর্তী যুগের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান হয়না। কিন্তু পদকর্তাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপরবর্তী বলাতে কোন কোন ভক্ত হয়তো ক্ষুব্ধ হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে জনশ্রুতি এই চণ্ডীদাসকে চিরদিন পরোক্ষভাবে চৈতন্যপরবর্তী যুগেই স্থাপন করে এসেছে। বীরভূম অঞ্চলে ব্যাপক জনশ্রুতি আছে যে, চণ্ডীদাসের সঙ্গে নবাবের বেগমের প্রণয় হওয়াতে নবাব তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হন এবং নাটমন্দিরে যখন কবি ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন করছিলেন, তখন নাটমন্দির কামান দিয়ে উড়িয়ে দেন। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের আগে এদেশে কামান আসেনি। অতএব উল্লিখিত কিংবদন্তী যদি সত্য হয়, তাহলে চণ্ডীদাসকে তার পরবর্তীই বলতে হয়। নাট-মন্দিরে কীর্তন করা প্রভৃতির বর্ণনা থেকেও মনে হয়, চণ্ডীদাস চৈতন্যপরবর্তী যুগের একজন ভক্ত বৈষ্ণব কবি ছিলেন। সুখের বিষয়, এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কেবলমাত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য ও প্রমাণও পাওয়া গেছে। সেগুলি পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি।

শিবরতন মিত্র বীরভূম অঞ্চলে ভগবদ্‌গীতার বাংলা অনুবাদের একটি পুঁথি পেয়েছিলেন (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪২, পৃঃ ৪৫৭-৫৮ দ্রঃ)। অনুবাদকের নাম

সদানন্দ সিন্ধু। এই পুঁথির লিপিকাল ১২১২ বঙ্গাব্দ (=১৮০৫ খৃঃ), সুতরাং রচনাকাল তার পূর্ববর্তী। কত পূর্ববর্তী তা বলবার উপায় নেই। এই সদানন্দ সিন্ধু বারবার নিজের প্রপিতামহ দ্বিজ চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করেছেন,

"আছিল প্রপিতামহ দ্বিজ চণ্ডীদাস।"
"দ্বিজ চণ্ডিদাসের মহেসপুত।
রত্নেশ্বর দ্বিজ চণ্ডিদাসের সুত॥
শ্রুত জয়স্তি ঘটক রায়।
তৎসুত সদানন্দ ভণে পায়॥"

কবি যেভাবে নিজেকে দ্বিজ চণ্ডীদাসের বংশধর বলে পরিচয় দিয়েছেন, তার থেকে মনে ধারণা জন্মায় যে ইনিই কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস।

অবশ্য, এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের উল্লেখ কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভাল প্রমাণও আছে। সে প্রমাণ অল্পদিনই আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্বভারতীর পুঁথিশালার ৩৬৮ নং পুঁথিতে এই কয় ছত্র পাওয়া গেছে (পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১ দ্রঃ),

"পুর্ব্বে গ্রামেতে ছিলা কবি দ্বিজ চণ্ডিদাস।
করিম্নাহার গ্রামেতে তাহার হইল নির্ব্বাস॥
তাহার পুজিৎ আছেন দেবি বিশালাক্ষি।
সেই পাদপদ্ম মোই হৃদে করি ধ(া) কি॥
ইষ্টদেবের য়াশীবর্বাদ আ [র] রমণির কৃপাতে।
রচিল পয়ার গ্রন্থ ভাবিয়া মনেতে॥
শিশুমতি অল্পবুদ্ধি কি বর্ন্নিতে পারি।
সত্যের আনন্দে বন্দ মুখে বল হরি॥"

এই পুঁথির লিপিকাল দেওয়া হয়েছে "১১৮২ সাল, তারিখ ৩ মাঘ। রবিবার অষ্টমী"। জ্যোতিষগণনা করে দেখা গেছে, তারিখের সঙ্গে বার ও তিথির সম্পূর্ণ মিল আছে। বীরভূম জেলার নান্নুর চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বলে প্রসিদ্ধ, এই নান্নুরে বিশালাক্ষীর মন্দির ও মূর্তি আছে। সুতরাং 'গ্রামেতে' বলতে এখানে 'নান্নুরে'র কথাই বলা হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি। নান্নুরের চণ্ডীদাসের মৃত্যু যে কীর্ণাহারে হয়েছিল, এই কিংবদন্তীও বহুলপ্রচলিত। দুশো বছরের পুরোনো এই পুঁথিতেও সেই কথাই পাওয়া গেল। উপরন্তু এতে এই মহামূল্যবান সংবাদ পাওয়া গেল যে, যে চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর পূজা করতেন ও কীর্ণাহারে পরলোকগমন করেছিলেন, তিনি "কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস"।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপরে উদ্ধৃত অংশটি লক্ষ্য করেছিলেন (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৬১, পৃঃ ৩৩৮ দ্রঃ)। তিনি কিন্তু মনে করেছিলেন,

এতে যে চণ্ডীদাসের কথা বলা হয়েছে, তিনি চৈতন্যপূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি যে অংশটিতে স্পষ্টভাবে "কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস" এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এতে বলা হয়েছে দ্বিজ চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর পুজা করতেন। বড়ু চণ্ডীদাসের উপাস্যা ছিলেন বাশলী। বাশলী আর বিশালাক্ষী এক নয় (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৩, পৃঃ ৭৭৭-৭৮ দ্রষ্টব্য)। বড় চণ্ডীদাস যে বাঁকুড়ার অধিবাসী ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই অনেক যুক্তিপ্রমাণ দেখিয়েছি। অতএব নান্নুরে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন,তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের বড়ু চণ্ডীদাস নন, চৈতন্য-পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা দ্বিজ চণ্ডীদাস। এই সত্য স্বীকার করে নিলেও নান্নুরের গৌরব কিছুমাত্র কমবে না।

এই দ্বিজ চণ্ডীদাস নিঃসন্দেহে চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি। কারণ ইনি রাধাকৃষ্ণলীলার বেনামীতে চৈতন্যলীলাই বর্ণনা করেছেন। এঁর "পদগুলি যিনিই পড়িয়াছেন তিনিই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সেখানে রাধাকৃষ্ণলীলা সেই 'রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ' মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরই লীলায় অনুপ্রাণিত।" ভাগবতপুরাণে রাধার নাম নেই ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও পদাবলীতে রাধার প্রেমময়ী মূর্তি পাই, কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধা যেরকম ভাববিগ্রহ হয়ে উঠেছেন, তেমনটি এর আগে আমরা পাইনি। চৈতন্যলীলার প্রভাবই এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়। কিন্তু অনেকে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, এই কবি যদি চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়ে থাকেন ও চৈতন্যদেবকে আদর্শ করেই রাধার আলেখ্য এঁকে থাকেন, তাহলে এঁর লেখা চৈতন্যবন্দনার পদ একটিও পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এ প্রশ্ন একটু জটিলই ছিল, কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন কয়েকবছর আগে বাংলা গভর্ণমেন্ট সংগ্রহের এক পুঁথিতে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত একটি চৈতন্যবন্দনার পদ আবিষ্কার করায় (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ২০২ দ্রঃ)এই সমস্যার সমাধান হয়েছে। আমরা পদটির শেষাংশ উদ্ধৃত করছি,

> "জন্মিলেন আপনি হরি শ্রীচৈতন্য নাম ধরি সঙ্গে লইয়া পারিষদগণ।
> পরম দুর্লভ ভাবে এই মন্ত্র সভে পাবে কহ দেখি কিসেরি কারণ॥
> কৈলে পূর্ণ অবতার বীজ সিদ্ধ নহে কার এই হেতু নাম মন্ত্র সার।
> আর না করিব ভেদ ভক্তগণে অবিচ্ছেদ কলি যুগে নামের প্রচার॥
> আসিবেন আপনি নাথ············নাম প্রেম করিতে স্থাপনে।
> কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস সে চরণে মোর আশ সর্ব্ব ছাড়ি পশিল চরণে॥"

দ্বিজ চণ্ডীদাসের চৈতন্যপরবর্তিত্ব সম্বন্ধে এখন আর সন্দেহের কোন কারণ নেই।

এখন, ঠিক কোন্ সময়ে এই দ্বিজ চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।

'গীতচন্দ্রোদয়', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম বা মাঝামাঝি সময়ের পদসঙ্কলনগ্রন্থে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ আছে। অতএব তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে বর্তমান ছিলেন নিশ্চয়ই। কত আগে, সে সম্বন্ধে একটি বিষয় থেকে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

এটি সব সঙ্কলনগ্রন্থে দু'চারটি এমন পদ পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা এবং বাশলীর উল্লেখ বা বন্দনা দুইই আছে। কিন্তু বাশলীর উপাসক ছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস—দ্বিজ চণ্ডীদাস নন। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, হয় এই সমস্ত পদে মূলে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা ছিল, বদ্‌লে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' করা হয়েছে; নয় তো এগুলি জাল পদ, সঙ্কলনকারীরা দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানতেন না বলে এগুলি সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে যেটিই সত্য হোক্ না কেন, দ্বিজ চণ্ডীদাসের জীবৎকালের পরে বহুকাল অতিবাহিত না হলে এরকম হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই সমস্ত কারণে দ্বিজ চণ্ডীদাস এই সমস্ত সঙ্কলনগ্রন্থের সময়ের অন্ততঃ ১০০ বছর আগে বর্তমান ছিলেন মনে হয়। অতএব তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক।

দীন চণ্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার অধিকারী। বাংলা সাহিত্যের সভার দুই সিংহাসন এঁদের জন্যে নির্দিষ্ট। কিন্তু এঁরা ছাড়াও চণ্ডীদাস নামধারী আরও কয়েকজন বাঙালী কবি ছিলেন, যাঁরা খুব উঁচুদরের প্রতিভার অধিকারী না হয়েও অনেক পদ রচনা করেছিলেন এবং এঁদের রচনা কালক্রমে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে চণ্ডীদাস-সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন দীন চণ্ডীদাস। এখন এঁরই কথা বলব।

বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই সকলে এই দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের আভাস পান। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে নীলরতন মুখোপাধ্যায় একটি পুঁথি

পেয়েছিলেন। এই পুঁথিতে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত ৭১টি রাসলীলার পদ ছিল। পদগুলিতে চৈতন্যপরবর্তী যুগের ভাষা ও ভাব সুস্পষ্ট। তারপর ১৩২১ বঙ্গাব্দে ব্যোমকেশ মুস্তফী বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সংগৃহীত একখানি পুঁথিতে কৃষ্ণের জন্মলীলা সম্বন্ধে ৬২টি সম্পূর্ণ এবং একটি খণ্ডিত পদ পেয়ে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ২১শ ভাগে প্রকাশ করেন। এগুলিতেও চৈতন্যপরবর্তী যুগের ছাপ পুরো মাত্রায় বর্তমান। জন্মলীলা ও রাসলীলার পদগুলি দেখে সকলেই অনুমান করলেন যে এগুলি মূলে একটি বৃহৎ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আখ্যানকাব্যের অন্তর্গত ছিল। এই আখ্যানকাব্যটিও কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কৃত হল। ৺মণীন্দ্রমোহন বসু এর দুখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং তার সঙ্গে চণ্ডীদাসের কতকগুলি বিখ্যাত পদ যোগ করে 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' নামে দু' খণ্ডে প্রকাশ করেন।

এই আখ্যানকাব্যটির বিচার করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে সুবললীলা প্রভৃতি বহু অপৌরাণিক ও আধুনিক লীলা বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'আশক' প্রভৃতি আরবী-ফারসী শব্দ ও পর্তুগীজ Valisha থেকে জাত 'বেশালি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর লেখক অধিকাংশ জায়গাতেই শুধু 'চণ্ডীদাস' নামে ভণিতা দিয়েছেন। তারপরেই সবচেয়ে বেশীবার 'দীন চণ্ডীদাস' এবং 'দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস' ভণিতা পাওয়া যায়। দু এক জায়গায় ইনি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস নামেও ভণিতা দিয়েছেন। এই কাব্যে কোন জায়গায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা বা বাশলীর উল্লেখ নেই। সুতরাং এই কাব্যের কবি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনরচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস থেকে স্বতন্ত্র লোক, সে সম্বন্ধে কারও কোন সন্দেহ ছিল না।

এরপর বর্ধমান জেলার বনপাশ অঞ্চল থেকে এই চণ্ডীদাসের লেখা উপরোক্ত আখ্যানকাব্যের একটি ভাল পুঁথি পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তারিতভাবে এই পুঁথিটি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই পুঁথিটির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এই কবির চৈতন্যপরবর্তিত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে যায়। হরেকৃষ্ণবাবু দেখিয়েছেন (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯, পৃঃ ৫৮১ দ্রঃ) যে, এই পুঁথিতে রূপ গোস্বামীর 'দানকেলীকৌমুদী'র নাম আছে,

> "বড়াই রসের তরু দোঁহে বসাইয়া।
> দান কেলি কুমুদিনী কহিয়াছে ইহা॥"

'দানকেলিকৌমুদী'র রচনাকাল ১৪৭১ শক (গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে)

বা ১৫৪৯-৫০ খৃঃ। এছাড়া পূর্বোক্ত কাব্যে 'গালিচা দুলিচা' শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতেও কবির অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।

এই আখ্যানকাব্যের রচয়িতা চণ্ডীদাসকে যে সকলে 'দীন চণ্ডীদাস' নামে চিহ্নিত করেন, তার কারণ, এঁর কাব্যে শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতার পরে 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতাই সবচেয়ে বেশীবার পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই যে চৈতন্যপরবর্তী যুগের প্রভাব আছে এবং এদের মধ্যে বহু পদে যে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা আছে, তা এক শ্রেণীর গবেষক বহু আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত দ্বিজ চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। দীন চণ্ডীদাসের চৈতন্যপরবর্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ থাকায় এবং তাঁর কাব্যের অল্প কয়েক জায়গায় 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা থাকায় পূর্বোক্ত সমালোচকদের মধ্যে কয়েকজন মনে করেন, দীন চণ্ডীদাসই এই শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের অসন্দিগ্ধ রচনার মধ্যে যে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই কারণে ৺সতীশচন্দ্র রায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরা দীন চণ্ডীদাসের পক্ষে প্রসিদ্ধ পদগুলি রচনা করা সম্ভব নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দীন চণ্ডীদাসের কাব্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেন যে, দীন চণ্ডীদাস তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, "তাঁহার দুর্বলতার বীজ ঠিক কবিত্বশক্তির দৈন্য অপেক্ষা পরিকল্পনার অনুপযোগিতার মধ্যেই নিহিত আছে।...আমার মনে হয় যে দীন চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি ক্রমিক উৎকর্ষের ফলে এমন এক পরিণতিতে পৌছিয়াছিল, যাহাতে তাঁহার পক্ষে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলীর রচয়িতা হওয়া অসম্ভব নহে।" ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বনপাশের পুঁথি থেকে দীন চণ্ডীদাসের কয়েকটি "কবিত্ব-গুণসম্পন্ন" পদের উদাহরণ দিয়েছেন এবং পুঁথিতে এরকম অন্ততঃ ৪০।৫০টি পদ আছে বলে জানিয়েছেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ১২৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত পদ উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলির সঙ্গেও চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত শ্রেষ্ঠ পদগুলির একটা বিরাট পার্থক্য অনুভব করা যায়। একজন সাধারণ কবি হাত মকৃশ করতে করতে কবিত্বের যে স্তরে পৌছোতে পারেন, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত পদগুলিতে তাই দেখা যায়।

কিন্তু চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলি যে জন্মগত প্রতিভার অধিকারী কোন মহাকবির সৃষ্টি, তা এগুলি পড়লেই বোঝা যায়। রচনারীতির উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রশ্ন বাদ দিলেও নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি থেকে বলা যায় যে, দীন চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা নন,

(১) সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেসব পদসঙ্কলন গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে 'চণ্ডীদাসে'র বহু পদ থাকলেও একটি পদেও 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতা মেলে না।

(২) দীন চণ্ডীদাসের আখ্যানকাব্যের এবং পদ সমষ্টির বহু পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পদগুলির একটিও এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

(৩) প্রসিদ্ধ পদগুলির মধ্যে শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতার পরেই 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা সবচেয়ে বেশীবার পাওয়া যায়। এক পদকল্পতরুতেই ২০টি পদে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, প্রসিদ্ধ পদগুলির রচয়িতার বিশিষ্ট নাম ছিল 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'। বিশ্বভারতীর ৩৬৮ নং পুঁথি থেকে যে অংশ আগে উদ্ধৃত করেছি, তাতেও স্পষ্টভাবে 'কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসে'র নাম করা হয়েছে, এর থেকে বোঝা যায় 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আলোচ্য চণ্ডীদাসের বিশিষ্ট নাম যে 'দীন চণ্ডীদাস' ছিল, তা এই নামের ভণিতার সংখ্যাধিক্য থেকে বোঝা যায়। ইনি কচিৎ 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা দিয়েছেন বটে, কিন্তু 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতার তুলনায় তা সংখ্যায় অতি অল্প। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে পুঁথির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে ৮৮ বার দীন চণ্ডীদাস ভণিতা এবং মাত্র ৭ বার 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতায় উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ পদ শতাধিক পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কারণে দীন চণ্ডীদাসের উপর প্রসিদ্ধ পদগুলির রচনাকর্তৃত্ব অর্পণ করা যায় না। এগুলি যে দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে আর একজন কবির লেখা, তা আবার নতুন করে বলার দরকার নেই। প্রাচীন পদসঙ্কলয়িতারা দীন চণ্ডীদাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন এবং আধুনিক সমালোচকেরা তাঁর কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে নিতান্ত বিরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেবল 'চণ্ডীদাস' নামের জোরেই দীন চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্থান লাভ করে বসে আছেন।

এঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা হদিস্ পাওয়া শক্ত নয়।

নরোত্তম আচার্যের শাখা গণনায় নরোত্তম-শিষ্য এক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়,

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতায় নরোত্তম বন্দনার একটি পদও পেয়েছেন। নরোত্তম আচার্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁর শাখা-গণনায় উল্লিখিত চণ্ডীদাস যদি কবি দীন চণ্ডীদাসের সঙ্গে অভিন্ন হন এবং 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত নরোত্তম-বন্দনার পদটি যদি অকৃত্রিম হয়, তাহলে এই কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন বলতে হবে।

সহজিয়া চণ্ডীদাস বা তরুণীরমণ চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস ভণিতায় অনেক সহজিয়া পদ পাওয়া যায়। সহজিয়ারা তাঁদের পাঁচজন গুরু কল্পনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে চণ্ডীদাস অন্যতম। এই পাঁচজন গুরুর প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে তাঁরা সহজ সাধনের এক একটি গল্প তৈরী করেছেন। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলি তাঁর বেনামীতে বিভিন্ন সহজিয়া কবির রচনা বলে মনে হয়। এই পদগুলিতে অনেক জায়গায় 'শ্রীরূপকৃপা'র উল্লেখ আছে, সুতরাং এগুলি চৈতন্যপরবর্তী যুগের রচনা। পদগুলির ভাষা ও ভাবও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত বহু সহজিয়া পদই অন্য কবির ভণিতাতেও পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কারণে, চণ্ডীদাস নামে কোন সহজিয়া কবি সত্যিই বর্তমান ছিলেন কিনা, তা বলা কঠিন। তবে থাকা যে অসম্ভব নয়, তা নীচের আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে।

৺ মণীন্দ্রমোহন বসু 'রত্নসার' নামে একটি সহজিয়া গ্রন্থের এক পুঁথিতে এই উক্তিটি পেয়েছিলেন,

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরণি রমণ।
গীত-ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন ॥

এই উক্তিটির পরেই একটি গান তুলে দেওয়া হয়েছে, যার আরম্ভ

পিরীতি বলিয়া তিনটি আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।

এবং ভণিতা,

তরণি রমণ করে নিবেদন
মরিলে না যায় ছাড়া॥

এই পদটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে চণ্ডীদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যায়। আরও একটা পদ "তিনটি আখরে না জানি কি আছে"—কোন কোন পুঁথিতে তরুণীরমণের বা তরণীরমণের ভণিতায় এবং কোন কোন পুঁথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

রত্নসার থেকে উদ্ধৃত উক্তি যদি আক্ষরিকভাবে সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে তরুণীরমণ চণ্ডীদাস নামে আর একজন চণ্ডীদাস ছিলেন। উপরোক্ত বিষয়গুলি মিলিয়ে দেখলে এই তরুণীরমণ চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্ভাব্য বলে মনে হয়। তরুণীরমণের লেখা বহু সহজিয়া পদ পাওয়া গিয়েছে এবং এক তরুণীরমণের লেখা 'সহজ উপাসনা তত্ত্ব' নামে একটি ছোট বই পাওয়া গিয়েছে। বইটিতে রামী রজকিনীকে নিয়ে চণ্ডীদাসের সহজ সাধন করার প্রচলিত কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। যিনি চণ্ডীদাসের "জীবনী" লিখেছিলেন, তাঁর পক্ষে চণ্ডীদাস উপাধি লাভ অসম্ভব নাও হতে পারে। চণ্ডীদাসের যেসব সহজিয়া পদ কোন পুঁথিতে অন্য কবির নামে পাওয়া যায় না, তার কতকগুলি এই তরুণীরমণ চণ্ডীদাসের লেখা বলেও কল্পনা করা যেতে পারে।

তরুণীরমণের সময় নির্ধারণ করা বিশেষ শক্ত নয়। 'পদকল্পতরু'তে তরুণী-রমণের একটি পদ সঙ্কলিত হয়েছে, সুতরাং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পূর্ববর্তী। 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' নামে একটি সহজিয়া গ্রন্থে তরণী-রমণের ৪৫টি পদ পাওয়া যায়। এর লেখক মুকুন্দদাস গোস্বামী নিজেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বললেও এই পরিচয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সহজিয়ারা কৃষ্ণদাস কবিরাজের দোহাই দিয়ে নিজেদের লেখা প্রায়ই চালান, এখানে তেমনি হয়তো তাঁর শিষ্যের দোহাই দেওয়া হয়েছে। তরুণীরমণের 'সহজ উপাসনাতত্ত্বে'র ভাষা আধুনিক, আরম্ভের অংশটি তো বিশুদ্ধ গদ্য—"শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস নব রসিক ভক্ত মহাশয় আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নকুল ঠাকুর মহাশয়কে শিক্ষা দিলেন।" অবশ্য এই উক্তি পরবর্তী সংযোজনা হতে

পারে। যাহোক্ সমস্ত বিষয় মিলিয়ে দেখলে তরুণীরমণ চণ্ডীদাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন বলে মনে হয়।

'কলঙ্কভঞ্জন'রচয়িতা চণ্ডীদাস

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 'চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন পালার একটি পুঁথি পেয়েছিলেন। এই পুঁথির অনুলিপি ১৩৪০ সালের সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোন অখ্যাত কবির রচনা বলে মনে হয়, কারণ ঐ অঞ্চলেই এই পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তার বাইরে কোন জায়গায় এই পালার কোন প্রচার ছিল বলে মনে হয় না। এই পুঁথির লিপিকাল ১১৮২ মঘী সন বা ১৮২০ খৃষ্টাব্দ। পালাটির ভাব ও ভাষা বিচার করলে রচনাকালও এই সময়ের বেশী আগে বলে মনে হয় না। 'চণ্ডীদাস' ভণিতা মাত্র দু' জায়গায় পাওয়া যায়। ভণিতা দুটি উদ্ধৃত করছি,

(১) শ্রীদামের কথা শুনি সুখী হইল চক্রপাণি।
চণ্ডীদাসে বোলে সার কৃষ্ণগতি সভাকার॥

(২) যশোদাএ দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে।
রাধাকৃষ্ণ পানে চাহি চণ্ডীদাসে বোলে॥

মোটের উপর, এই কবির পক্ষে বড়ু বা দ্বিজ তো দূরের কথা, দীন বা তরুণীরমণ চণ্ডীদাসের সঙ্গেও অভিন্ন হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়না। কারণ ঐসব কবির দেশ পশ্চিমবঙ্গে এই কাব্য অজ্ঞাত। অতএব ইনি আরেক জন এবং সম্ভবতঃ আধুনিকতম চণ্ডীদাস। এঁর লেখার মধ্যে কবিত্ব বিশেষ কিছু নেই বললেও চলে।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অন্য কবির পদ

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত যে সমস্ত পদ অন্য কবির ভণিতাতেও পাওয়া যায়, নীচে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হল। এইসব পদ ঐ সমস্ত কবিদেরই লেখা বলে আমরা মনে করি। কারণ সর্বযুগে ক্ষুদ্রতর কবিদের রচনা মহাকবিদের নামে চলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর বিপরীত দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যায় না। তাছাড়া নীচের তালিকায় প্রদত্ত বেশীর ভাগ পদই প্রাচীন পুঁথিতে বা নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থে অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া যায়, চণ্ডীদাসের

ভণিতায় পাওয়া যায় না। কোন কোন পদ অন্য কবিদের বইএ তাঁদের নিজেদের ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে। যেমন 'ঘরের বাহির দণ্ডে শতবার' পদটি নটবরদাসের পদসঙ্কলনগ্রন্থ 'রসকলিকা'য় তাঁর ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে। 'থির বিজুরী বরণ গোরী' গোপালদাসের 'রসকল্পবল্লী'তে এবং 'ভাল হইলা আরে বঁধু' ও 'চিকুর স্ফুরিছে বসন খসিছে' পদ দুটি গোপালদাসের পুত্র পীতাম্বর-দাসের 'রসমঞ্জরী'তে গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে।

পদের প্রথম ছত্র	কার নামে পাওয়া যাচ্ছে
একলি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী	জ্ঞানদাস
কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে	যদুনন্দন
কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন	জ্ঞানদাস
কাহারে কহিব মনের কথা	জ্ঞানদাস ও রামচন্দ্র
কিনা হৈল সখী মোর কানুর পিরীতি	নরহরি
ঘরের বাহির দণ্ডে শতবার	নটবরদাস
চিকুর স্ফুরিছে বসন খসিছে	গোপালদাস
ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক	নরহরি
তিনটি আখরে না জানি কি আছে	তরুণীরমণ
থির বিজুরী বরণ গোরী	গোপালদাস
না বল না বল সখি	জ্ঞানদাস
পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু	যদুনাথ
পিরীতি বলিয়া একটি কমল	নরহরি
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর	তরুণীরমণ (অবশ্য পাঠ-ভেদ আছে)
বঁধু কি আর বলিব তোরে	দীনবন্ধু দাস
ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে	গোপালদাস
রাই আজু কেন হেন দেখি	কৃষ্ণকিশোর
সই কত না রাখিব হিয়া	জ্ঞানদাস ও নরহরি
সজনি ও ধনি কে কহ বটে	লোচনদাস ও জগন্নাথ
সহজ সহজ সহজ কহয়ে	কৃষ্ণদাস
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু	জ্ঞানদাস
হেদে হে বঁধু লাজ নাহি বাস	নরোত্তম দাস

পদের প্রথম ছত্র	কার নাম পাওয়া যাচ্ছে
ঘনশ্যাম শরীর কলা রস ধীর	প্রেমানন্দ ও গোপালদাস
যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া	জ্ঞানদাস
ওঝা বেঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভুতা	বংশীবদন
আজু কেনে ধনি এমন দেখি	জ্ঞানদাস
শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে	জ্ঞানদাস ও কবিশেখর
আজুক শয়নে ননদিনী সনে	জ্ঞানদাস
ননদী গো, কি আর বলিব তোরে	জ্ঞানদাস
পিরীতি পিয়াসে জাগি ঘুমাওলু	জ্ঞানদাস
প্রভাত হৈল পিয়া না আইলা ভবনে	গোপালদাস
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু	জ্ঞানদাস
বঁধু কহ না রসের কথা শুনি	নরহরিদাস
পিরীতি নগরে বসতি করিব	যশোদানন্দন
মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে	শিবরাম
আমার মনের কথা শুন লো সজনী	জ্ঞানদাস
কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণ খানি	দ্বিজ শ্যামদাস
কিনা জ্বালা হৈল মোরে কানুর পিরীতি	যদুনাথদাস
নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিনী	যদুনাথদাস
সই কাহারে করিব রোষ	প্রেমদাস
শ্যামের পিরীতি বিরতি হইলে	অনন্তদাস
বঁধু এবে সে গেল হে জানা	ধনঞ্জয়
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া	ধনঞ্জয়
আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে বৈস	শ্যামদাস ও বংশীবদন

এই সমস্ত পদ ছাড়া চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত কতকগুলি পদের অংশবিশেষ অন্য প্রাচীন কবির রচনার মধ্যে পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিখ্যাত "কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান" পদটির

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥

এই দুটি পয়ার সামান্য পরিবর্তিত আকারে ভবানন্দের হরিবংশে, "রায় রাঘবেন্দ্র" ভণিতাযুক্ত একটি পদে এবং "সৈয়দমর্ত্তুজা" ভণিতাযুক্ত একটি পদে পাওয়া গেছে।

এই সব পদের রচনাকার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে পাঠকেরা ডঃ সুকুমার সেন রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ও বিচিত্র সাহিত্য প্রথম খণ্ড এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাস-পদাবলী প্রথম খণ্ড দেখতে পারেন।

॥ ছয় ॥

কৃত্তিবাস

যেসব কবিদের নিয়ে আমরা সারা ভারতের কাছে গর্ব করতে পারি, তাঁদের মধ্যে একজন কৃত্তিবাস ওঝা। সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ লোকদের জন্যে তিনি বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাঁর রামায়ণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সর্বশ্রেণীর বাঙালীকে মুগ্ধ করে এসেছে।

শুধু বাংলা ভাষায় নয়, অন্য প্রাদেশিক ভাষায় লেখা রামায়ণের মধ্যেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রাচীনতম। কিন্তু এইটিই কৃত্তিবাসী রামায়ণের একমাত্র গৌরব নয়। সাধারণতঃ আমাদের সাহিত্যের কোন ধারার প্রাচীনতম কবিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে জনপ্রিয় কবির মর্যাদা অর্জন করতে পারেন না। কিন্তু কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়েছে। তিনি শুধু সময়ের দিক দিয়েই সকলের অগ্রগণ্য নন, রচনার উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়েও তাঁর স্থান সকলের পুরোভাগে।

কৃত্তিবাস শুধু বাংলা রামায়ণের নন, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যেরও আদি কবি। অবশ্য এই 'অনুবাদ সাহিত্য'কে কেউ কেউ অনুবাদ-সাহিত্য বলে স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে এগুলি প্রাচীন ঐতিহ্য অবলম্বনে রচিত নতুন সাহিত্য। কিন্তু এই সাহিত্যের স্রষ্টাদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নরকম ছিল। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে আছে,

সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও অনুরূপ উক্তি আছে। তিনি বহু জায়গায় ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। প্রাচীনতর মহাভারতগুলিতে বহু জায়গায় ব্যাস-ভারত ও জৈমিনি-ভারতের আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যায়। আসল কথা, বাংলা রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতে পরবর্তী কালে

যতটা মূলের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, প্রাচীনকালে ততটা যায় না। সুতরাং এই সাহিত্যকে 'অনুবাদ সাহিত্য' নাম দেওয়া ও কৃত্তিবাসকে তার আদি রচয়িতা বলা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে আজ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, আর কোন কবির ক্ষেত্রে তেমন হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমি নিজেও একবার এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম (রাজা গণেশের আমল, পৃঃ ৮৮-১৩৪ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তখন কতকগুলি মূল্যবান তথ্য আমার হস্তগত হয়নি। বর্তমান আলোচনায় সেই তথ্যগুলি ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়ায় আলোচনাটি আরও পূর্ণাঙ্গ ও সিদ্ধান্ত আরও নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান আলোচনায় আমরা কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীকে বিশেষভাবে ব্যবহার করব। কিন্তু তার আগে, আত্মকাহিনীটি যে অকৃত্রিম, তাই প্রমাণ করে নিতে হবে, কারণ এসম্বন্ধে অনেকের মনে সংশয় আছে।

আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহের প্রধান কারণ ছিল তার পুঁথির অদর্শন। বদনগঞ্জের হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির সংগ্রহের একখানা পুঁথিতে এই আত্মকাহিনী সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং ভক্তিনিধি মহোদয়ের কাছ থেকে এই আত্মকাহিনীর নকল পেয়ে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ খৃঃ) অবিকলভাবে প্রকাশ করেন। সেই থেকে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর সঙ্গে সর্বসাধারণে পরিচিত হন, কিন্তু যে পুঁথিতে আত্মকাহিনীটি পাওয়া গিয়েছিল, তা কেউ দেখতে পাননি। এই কারণে অনেকে আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতায় বিশ্বাস করতে চাননি। কিন্তু বহু পরে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী আর একটি পুঁথিতে এই আত্মকাহিনীটি পান। নলিনীবাবু অবশ্য পুঁথিটির আত্মকাহিনী-সংবলিত তিনটি পাতা মাত্র পেয়েছিলেন, পুঁথিটির বাকী অংশ যে সাহিত্যপরিষদে আছে, তাও তিনি দেখিয়েছিলেন। এই পুঁথির আত্মকাহিনী অংশটি নলিনীবাবু ফটোসমেত ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে প্রকাশ করেন। এই পুঁথি আবিষ্কারের ফলে আত্মকাহিনী সম্বন্ধে সংশয়ের প্রধান কারণ দূর হয়েছে। ডঃ ভট্টশালী আবিষ্কৃত পুঁথিটির পুষ্পিকা থেকে জানা যায়, এই পুঁথিটিও বদনগঞ্জে ছিল। এই কারণে ডঃ ভট্টশালী মনে করেছিলেন, বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের নিরুদ্দিষ্ট পুঁথিটিরই এক অংশ সাহিত্য-পরিষদে এবং আর

এক অংশ তাঁর হাতে এসে পড়েছে। কিন্তু এই দুই পুঁথি যে সম্পূর্ণ আলাদা, তার তিনটি অকাট্য প্রমাণ আছে। সেগুলি এই :—

(১) দুটি পুঁথির পাঠের চরণসংখ্যা এক নয়, হারাধন দত্তের পুঁথির পাঠে ১৫২ টি এবং ডাঃ ভট্টশালী-আবিষ্কৃত পুঁথির পাঠে ১৮২টি চরণ আছে। এর মধ্যে মাত্র ৫০টি চরণে হুবহু মিল আছে, বাকী অংশগুলিতে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে এবং কতকগুলি পার্থক্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

(২) হারাধন দত্তের পুঁথি থেকে গৃহীত আত্মকাহিনীর একটি চরণ হচ্ছে—"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস"। এখানে 'পূর্ণ'শব্দের প্রয়োগের কোন সঙ্গত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, বাংলা পুঁথিতে লিপিকররা প্রায়ই অহেতুক যে 'রেফ্' এর মত টান দিয়ে দিত, সেইরকম একটি টানই পুঁথিতে ছিল এবং মূল পাঠ ছিল 'পুণ্য'। কিন্তু ডঃ ভট্টশালীর পুঁথিতে 'পুণ্য' শব্দটি স্পষ্টভাবেই লেখা আছে, তা পুথির ফটো দেখলেই বোঝা যাবে। তাতে 'ণ্য' এর মাথায় 'রেফ্' জাতীয় টানের চিহ্নমাত্র নেই।

(৩) হারাধন দত্তের পুঁথির পাঠের দুটি ছত্র এই:—

(ক) পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।

(খ) প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।

কিন্তু ডঃ ভট্টশালীর পুঁথিতে ঐ দুটি ছত্রের রূপ যথাক্রমে এই :—

(ক) পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।

(খ) প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম রাজার দুয়ার ।

হারাধন দত্তের পুঁথি যদি ডাঃ ভট্টশালীর পুঁথির সঙ্গে অভিন্ন হত, তাহলে হারাধন দত্ত সেই পুঁথি থেকে নকল করবার সময় 'পোহাইতে' ও 'বাহির'কে পরিবর্তিত করে 'পুহাইতে' ও 'বারি' লিখতেন না। কারণ তিনি উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন এবং তাঁর দেওয়া বিবরণীর অন্য সমস্ত শব্দের শুদ্ধ এবং সর্বজনগ্রাহ্য রূপই পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর পুঁথিতে 'পুহাইতে' ও 'বারি'ই লেখা ছিল, তা নিঃসংশয়ে বোঝা যায়। দুটি পুঁথির পার্থক্যের এইটিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এছাড়া ৺দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন যে, তিনি ও ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সাহিত্য-পরিষদের আর একটি পুঁথিতে আত্মকাহিনীটি দেখেছিলেন (গোবিন্দদাসের

কড়চা, ২য় সং, ভূমিকা, পৃঃ ৵০ দ্রঃ)। সুতরাং অন্ততঃ তিনখানি পুঁথিতে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি। তাই নীচে এসম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ দিচ্ছি।

(১) কয়েকটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি হচ্ছে (ক) বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ১২ নং পুঁথি, (খ) সাহিত্যপরিষদের ১২৪ নং পুঁথি, (গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১ নং পুঁথি এবং (ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের K 488 নং পুঁথি। আত্মকাহিনীর সঙ্গে এই পুঁথিগুলির কোন কোন অংশের ভাষার দিক দিয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। নীচে এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(আ. কা.) মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী॥

(ঘ পুঁথি) মাও মালিকা যার বাপ বনমালী।
সহোদর ছয়জন সর্ব্বগুণে জানি॥

(আ. কা.) বারান্তর উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গা পার॥
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার।

(গ পুঁথি) ছোটর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
যথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার॥

(খ পুঁথি) ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
যথা তথা কর্‌যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার॥

(আ. কা.) বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিনী হইল সতাই উদর॥

(ক পুঁথি) বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর॥

(আ. কা.) চতুর্দ্দিক্‌ভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্যা বহে গঙ্গা সুরেশ্বরী॥

(ঘ পুঁথি) চতুর্দ্দিগভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
উত্তর দক্ষিণ চাপি বহে সুরেশ্বরী॥

(আ. কা.) মুখটি বংশ ওঝা বংশ সংসার বিদিত।
তথি উপজিল এই কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

(ঘ পুঁথি) মুকুটী বংশে জন্ম সংসারে বিদিত।
তথাএ উপজিল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

(খ পুঁথি) মুখুটি বংশে জন্ম ওঝার জগত বিদিত।
ফুলিয়া সমাজে কৃত্তিবাস যে পণ্ডিত॥

(আ. কা.) বাপ বনমালী ওঝা মানিকী উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে॥

(ক পুঁথি) পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে।
জর্ম্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে॥

(খ পুঁথি) পিতা বনমালী মাতা মানকির উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে॥

(গ পুঁথি) বাপ বনমালি মা মাণিকা উদরে।
ছয় ভুজা (ওঝা?) জন্মিলেন ছয় সহোদরে॥

(ঘ পুঁথি) বাপ বনমালি মাও মালীকা উদরে।
জন্ম লভিল পণ্ডিত ছয় সহোদরে॥

(আ. কা.) সরস সুন্দর হইল বাণীবিলাস।
ফুলিয়া সমাজে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

(ঘ পুঁথি) সরস কবিতা বাক্য লোকেত প্রকাশ।
ফুলিঞা নগরে বাস হেন কৃত্তিবাস॥

(ক পুঁথি) শুনিতে অমৃতধার লোকেত প্রকাশ।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

(আ. কা.) আদিকাণ্ড গাইলেন শ্রীরাম চরিত।
লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

(খ পুঁথি) বাল্মীকি হইতে হৈল রামায়ণ প্রকাশ।
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

(২) আত্মকাহিনীতে বলা হয়েছে কৃত্তিবাস সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েছিলেন.

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
নানা শাস্ত্র নানা ভাষ বিস্তার প্রসর॥

এরই প্রতিধ্বনি পাচ্ছি বিশ্বভারতীর একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে,

সভার ভিতর ওঝা সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
পাঁচালি রচিয়া থুইল পুস্তক প্রমাণে॥
এতেক শাস্ত্র আর কোন পণ্ডিত না দেখে।
সরস্বতীর বরে পণ্ডিত রচিলেন সুখে॥

(৮০২ নং পুঁথি, ৩৮৩ নং পত্র)

(৩) আত্মকাহিনীতে লেখা আছে কৃত্তিবাস 'বড় গঙ্গা পার'এ পড়তে গিয়েছিলেন। এই কথা পূর্বোক্ত সাহিত্য পরিষদের ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ছাড়া বিশ্বভারতীর একটি পুঁথিতেও পাওয়া গেছে।

(৪) আত্মকাহিনীতে বলা হয়েছে কৃত্তিবাসেরা ছয় ভাই ছিলেন—"ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী"। একথার সমর্থন পূর্বোল্লিখিত পুঁথিগুলি ছাড়াও আরও বহু পুঁথি থেকে পাচ্ছি।

প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলে রাখি। অনেকে মনে করেন কৃত্তিবাসের একটিমাত্র বোন ছিল। এ ধারণা ভুল। আত্মকাহিনীতে আছে কৃত্তিবাসের দুই বোন ছিল। একজন সহোদরা (মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি। ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী ॥), আর একজন বৈমাত্রেয়া (আর এক বহিনী হইল সতাই উদর ॥)।

(৫) এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ একটু অদ্ভুতভাবে পাওয়া গিয়েছে। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যার ৫-৬ পৃষ্ঠায় 'সীতার দশ মাস' নামে একটি ছোট কবিতার বিবরণ দেওয়া আছে। তার ভণিতা এই,

দশ মাসের দশ ঘোষা লওরে গনিয়া।
এই গীত জোড়াইয়াছে শ্রীধর বানিয়া ॥
শ্রীধর বানিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি।
রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি ॥

এই ভণিতায় কবিতাটির লেখক শ্রীধর বানিয়াকে 'মুরারি ওঝার নাতি' বলা হয়েছে। কিন্তু ওঝা তো ব্রাহ্মণদের উপাধি, তাহলে বানিয়া (বেনে) জাতীয় শ্রীধর মুরারি ওঝার নাতি হন কেমন করে? শ্রীধর বানিয়ার আরও তিনটি কবিতার বিবরণ ঐ 'পুঁথির বিবরণে'র ৪৬, ৪৯ ও ৮২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কিন্তু শ্রীধর বানিয়াকে 'মুরারি' ওঝার নাতি' বলা হয়নি। অতএব গায়েন বা লিপিকরদের মধ্যেই কেউ 'সীতার দশমাসে'র ভণিতার শেষ দুটি ছত্র জুড়ে কবিকে 'মুরারি ওঝার নাতি' বানিয়েছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। কিন্তু এরকম করার কারণ কি? এর উত্তর পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে, তাতে আছে,

"শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥" (হারাধন দত্তের পুঁথির পাঠ)

কৃত্তিবাস যে "মুরারি ওঝার নাতি", সেকথা কেবল আত্মকাহিনী কেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমস্ত পুঁথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃত্তিবাসের

ভাই শ্রীধরের নাম আত্মকাহিনী ছাড়া আর কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে 'সীতার দশমাসে'র গায়েন বা লিপিকর কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী পড়েছিলেন, তারই ফলে তিনি শ্রীধর বানিয়াকেই কৃত্তিবাসের ভাই-মনে করে "শ্রীধর বাণিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি" লিখেছেন। 'সীতার দশমাসে'র পুঁথি চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। সুতরাং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী যে অকৃত্রিম এবং সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে তার প্রচার ছিল, তা প্রমাণিত হচ্ছে।

(৬) আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসের বিস্তৃত বংশপরিচয় পাওয়া যায়। এটিও এর প্রাচীনতার একটি লক্ষণ। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দুটি আত্মকাহিনী পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রথমটিতে মুকুন্দরাম এইরকম বিস্তৃত বংশপরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী কবিদের আত্মকাহিনীতে বংশপরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসের বংশের যে সমস্ত লোকের নাম পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকটিই অন্য সূত্র দ্বারা সমর্থিত। কৃত্তিবাসের পিতামহের মুরারি নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রায় সমস্ত পুঁথিতেই পাওয়া যায়। পিতা বনমালীর নামও বহু পুঁথিতে পাই। তাঁর জননীর নামও অনেক পুঁথিতে পাই, তবে তার মধ্যে মালিনী, মানিনী, মালিকা, মানিকা, মেনকা এবং মানকি এইজাতীয় বহু পাঠভেদ দেখা যায়। কৃত্তিবাসের ভাইদের মধ্যে বলভদ্র ও চতুর্ভুজ-ভাস্করের নাম পূর্বোল্লিখিত আদিকাণ্ডের পুঁথিটিতে পাওয়া যায়। যে চারখানি পুঁথিতে আত্মকাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বিবরণ পাওয়া যায়, প্রত্যেকটিতেই পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসেরা ছিলেন ছ' ভাই। আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসও এই কথাই বলেছেন। কবির বাড়ী ছিল ফুলিয়ায় এবং তিনি মুখটিবংশে জন্মেছিলেন, একথাও বহু পুঁথিতে পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসের বংশ ও পরিবারের অন্যান্য যে সমস্ত লোকের নাম আত্মকাহিনীতে পাই, তার যাথার্থ্য সমর্থিত হচ্ছে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের প্রাচীন কুলগ্রন্থ ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী থেকে। আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস বলেছেন তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম নারসিংহ ওঝা। মহাবংশাবলীতে এই নামটি নরসিংহ বা নৃসিংহ রূপে পাই। কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ গর্ভেশ্বর, তাঁর ছেলে মুরারি, সূর্য ও গোবিন্দ, কৃত্তিবাসের পিতৃব্য ভৈরব, মদন, মার্কণ্ড ও ব্যাস, তাঁর সহোদর মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, বলভদ্র, চতুর্ভুজ এবং ভৈরবের ছেলে গজপতির নাম আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে, এই নামগুলি মহাবংশ-

বলীতেও পাওয়া যায়। অন্ত দু একটি নাম ঈষৎ রূপান্তরিত আকারে মেলে। সূর্যের পুত্র নিশাপতি এবং গোবিন্দের পুত্র আদিত্য, বিত্থাপতি ও রুদ্রের নামও আত্মকাহিনীতে আছে, এই নামগুলি মহাবংশাবলীতে না পাওয়া গেলেও অন্ত কুলগ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে (সা. প. প, ১৩৪৮, পৃঃ ১১৫ দ্রষ্টব্য)।

(৭) আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাস একজন গৌড়েশ্বরের সভায় সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। এই কথার সমর্থন আমরা ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ উত্তরকাণ্ডের দুটি ভণিতায় পেয়েছি; সে দুটি ভণিতা নীচে উদ্ধৃত করলাম,

(১) কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজ পূজিত।
সর্ব্বপাপ হরে শুনিলে রামের চরিত॥ (পৃঃ ১২)

(২) গৌড়ে পূজিত কৃত্তিবাস পণ্ডিত।
মরুত রাজার যজ্ঞ সাঙ্গ সংসারে বিদিত॥ (পৃঃ ৪১)

একথা মনে রাখা দরকার, এই সংস্করণের অন্যতম অবলম্বন ছিল ১৫০২ শকাব্দের একখানি পুঁথি।

(৮) তাছাড়া, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের যে কজন সভাসদের নাম রয়েছে তাঁদের মধ্যে কেদার রায়, নারায়ণ ও জগদানন্দ রায়ের নাম অন্য প্রামাণ্য সূত্রেও পাওয়া গিয়েছে। এঁদের মধ্যে কেদার রায় ও নারায়ণের নাম কোথায় পাওয়া গিয়েছে, সে কথা পরে বলছি। জগদানন্দ রায় নামক একজন কবির একটি পদ রূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত করেছেন। ইনিই সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস কর্তৃক উল্লিখিত গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র জগদানন্দ রায়। এরকম মনে করার কারণ, রূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে গৌড়রাজসভার সঙ্গে যুক্ত আরও অনেকের পদ সঙ্কলন করেছেন।

(৯) আর একটি প্রমাণ দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে বলা হয়েছে যে গৌড়েশ্বরের প্রাসাদে নটি মহল ছিল,

"নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার॥"

'বৃহন্দ' শব্দের অর্থ মহল (নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ আদিকাণ্ড, পৃঃ ১৫১, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধান' এবং হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ' দ্রষ্টব্য)। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণে ও পুঁথিতে বহুবার 'বৃহন্দ' বা 'বিহন্দ' শব্দ পাওয়া যায় এই শব্দসাদৃশ্য থেকেও আত্মকাহিনীটি কৃত্তিবাসের নিজের রচনা বলে প্রতীত হয়।

যাহোক্, উদ্ধৃত ছত্রের মধ্যে 'নয় বৃহন্দ'র উল্লেখ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আমাদের দেশে সাতমহলা প্রাসাদই চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু আত্মকাহিনীর অনুরূপ উক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীর আর একটি সূত্রেও পাচ্ছি। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে চীন থেকে একদল রাজপ্রতিনিধি বাংলার রাজসভায় এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন 'সিং-চা-শেং-লান' নামে একটি চীনা বইএ লিখেছিলেন, বাংলার রাজার প্রাসাদে নটি মহল (chiu chien) আছে (রাজা গণেশের আমল, পৃঃ ১৩০)। এই সমর্থনের ফলে আত্মকাহিনীর প্রামাণিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অবশ্য এখানে একটা কথা বলা দরকার। চীনা রাজপ্রতিনিধি ও কৃত্তিবাসের উক্তির ঐক্য থেকে মাত্র এইটুকু বোঝা যায় যে ঐ সময় গৌড়েশ্বরদের মধ্যে ন' মহলা রাজপ্রাসাদ নির্মাণের রীতি ছিল। কিন্তু চীনা প্রতিনিধি যে প্রাসাদে গিয়েছিলেন, কৃত্তিবাস যে সেই প্রাসাদেই গিয়েছিলেন, তা এর থেকে প্রমাণ হয় না।

যা হোক্, আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ দিলাম, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আত্মকাহিনীটী কৃত্তিবাসের নিজের রচনা।

এইখানে অনালোচিতপুর্ব একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আত্মকাহিনীটি কৃত্তিবাসের নিজের লেখা ঠিক্. কিন্তু যে আকারে তাকে আমরা পাচ্ছি তা সম্পূর্ণ নয়। মুল আত্মকাহিনীতে আরও কিছু অংশ ছিল, যা গায়েনদের বা লিপিকরদের অসাবধানতায় বাদ পড়ে গেছে। এর কিছু প্রমাণ দিই। আত্মকাহিনীর বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে আছে,

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
বারান্তর উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গা পার॥

'বড় গঙ্গা' মানে পদ্মা। সুতরাং উদ্ধৃত অংশ থেকে ধারণা জন্মায়, কৃত্তিবাস এগার বছর পার হয়ে বার বছরে পা দিয়ে পদ্মাপারের উত্তরদেশ অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমিতে পড়তে গেলেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১ নং পুঁথিতে আছে,

রাড়া মধ্যে (মধ্যে) বন্দিনু আচার্য্য চূড়ামণি।
যার ঠাই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি॥

এবং সাহিত্য পরিষদের ১২৪ নং পুঁথিতে আছে,

ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বলিন্দা পার।
যথা তথা কর্য্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার॥

এই দুই পুঁথির সাক্ষ্য মিলিয়ে জানা যায়, কৃত্তিবাস যেমন 'বড় গঙ্গা পারে'র দেশে পড়তে গিয়েছিলেন, তেমনি 'ছোট গঙ্গা' বা ভাগীরথী পার হয়ে 'রাঢ়া' অর্থাৎ রাঢ়ে গিয়ে সেখানকার এক আচার্যচূড়ামণির কাছেও পড়েছিলেন। আত্মকাহিনীর বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু মূল আত্মকাহিনীতে যে ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে বড় গঙ্গা পার হয়ে উত্তর দেশে যাওয়ার কথা বলবার সময় কৃত্তিবাস বলেছেন "বারান্তর উত্তরে গেলাম।" এর অব্যবহিত পূর্বে তাঁর প্রথমবার উত্তরে গমনের কথা আছে 'হেন বেলা পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ' এই চরণে। এই উত্তরদেশ নিশ্চয়ই উত্তর রাঢ়। কবি এইখানেই ছোট গঙ্গা পার হয়ে গিয়েছিলেন এবং এখানকার একজন আচার্যচূড়ামণির কাছে পড়েছিলেন। সেখানকার পড়া শেষ করে ঘরে ফিরে আসেন এবং তারপর কোন এক শুক্রবার উষায় 'বারান্তর উত্তরে' যান।

তারপর, কবি তাঁর আত্মকাহিনীতে যে কথা সবচেয়ে বিশেষভাবে বলেন, তা হচ্ছে তাঁর কাব্যরচনার কাহিনী। কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিরই কোন উল্লেখ নেই। কবি পরপর তাঁর পূর্বপুরুষদের কাহিনী, নিজের জন্ম, জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের কথা, অধ্যয়ন, গুরুর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ, গৌড়েশ্বরের সভায় গমন এবং তাঁর কাছে সংবর্ধনালাভ বর্ণনা করেছেন। সংবর্ধনার পরে রাজপ্রসাদ থেকে বেরিয়ে আসবার পরেই জনতা তাঁকে ঘিরে ধরে অভিনন্দন জানায়। জনতার অভিনন্দনবাণীর মধ্যেই আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার কথা প্রথম শুনতে পেলাম,

> "চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
> লোক বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
> মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
> পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী।
> বাপমায়ের আশীর্ব্বাদ গুরুর কল্যাণ।
> বাল্মীকি-প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥"

উদ্ধৃত অংশে 'রচে রামায়ণ গান' উক্তি থেকে বোঝা যায়, কৃত্তিবাস তখনই রামায়ণরচনারত। সুতরাং গৌড়েশ্বরদর্শনের আগেই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা সুরু করেছিলেন। তাহলে কখন এবং কার নির্দেশে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা সুরু করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরের আভাস পাওয়া যায়

উদ্ধৃত অংশের পঞ্চম ছত্রের 'গুরুর কল্যাণ' কথাটি থেকে। কৃত্তিবাসের কাব্যরচনাপ্রসঙ্গে তাঁর গুরুর উল্লেখ থেকে ধারণা হয় গুরুই তাঁকে রামায়ণ রচনার আদেশ দিয়েছিলেন। এই ধারণা দৃঢ় হয় হারাধন দত্ত প্রদত্ত বিবরণে উদ্ধৃত অংশের শেষ দুটি ছত্রের পাঠভেদ দেখে,

বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু-আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥

এখানে গুরুর আজ্ঞার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

আত্মকাহিনীর বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বরদর্শন বর্ণনার ঠিক আগেই আছে,

বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম কৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার প্রসন ॥
ব্রহ্মার সাদৃশ গুরু মহা উর্দ্ধাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥'

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এর ঠিক পরেই গুরু কর্তৃক কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ দান এবং ঘরে ফিরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনা স্বরু করার কথা ছিল। এইসব কথা বর্ণনা করে তারপর কৃত্তিবাস "সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর" বলে রাজদর্শনপ্রসঙ্গের বর্ণনা স্বরু করেছিলেন। এ না হলে রাজসংবর্ধনার শেষে লোকের মুখে "বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান" উক্তির কোন সার্থকতা থাকেনা।

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীকে অবলম্বন করে তাঁর কাল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন। কিন্তু তাঁদের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে দুটি কথা বলবার আছে। আত্মকাহিনীর হারাধন দত্ত প্রদত্ত অনুলিপির প্রথমেই আছে,

'পূর্ব্বেতে আছিলা বেদানুজ মহারাজা।
তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥"

'বেদানুজ মহারাজা'র বদলে সকলেই 'যে দানুজ (দনুজ) মহারাজা' পাঠ ধরেছেন এবং তার থেকে নারসিংহ তথা কৃত্তিবাসের সময় নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। আমিও আগে তাই করেছিলাম। কিন্তু এখন

আর এরকম করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না। কারণ দুটি পুঁথিতেই রাজার 'বেদানুজ' নাম পাওয়া যায়। 'বেদানুজ' শব্দ আজকের দিনে আমাদের কাছে অর্থহীন হলেও এ নাম যে কারও ছিল না বা থাকতে পারে না, সেকথা ভাবা ভুল। ঠিক এই নামের অন্য দৃষ্টান্ত না পেলেও এই জাতীয় অর্থহীন নামের দৃষ্টান্ত প্রাচীন যুগের অনেক লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়—যেমন, গুহমহি, পিচ্চকুণ্ড, রীয়োক, ভোগট, রহস্কর, লডহ-চন্দ্র, ধাড়িচন্দ্র প্রভৃতি। এইজন্যে মনে হয়, বেদানুজ নামে সত্যিই একজন রাজা ছিলেন, যাঁর পরিচয় এবং সময় সম্বন্ধে কিছু আমরা জানতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ 'বেদানুজ মহারাজা'-কে যদি 'দনুজ মহারাজা'ই ধরি, তাহলে প্রশ্ন উঠবে কোন্ দনুজ মহারাজা? ১২৮০ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে দনুজমাধব বা রায় দনুজ নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন, আবার তার বহু পরে ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দনদেব সারা বাংলার অধীশ্বর হয়েছিলেন। আবার, বাকৃলা চন্দ্রদ্বীপেও এক রাজা দনুজমর্দন ছিলেন বলে প্রাচীন কিংবদন্তী আছে। খেয়ালবশে এঁদের মধ্যে যে কোন একজনকে নারসিংহের সমসাময়িক ধরে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করলে তা গবেষণার পর্যায়ে পড়বে না। তৃতীয়তঃ আজ পর্যন্ত বিশেষ কেউই একটি বিষয় লক্ষ্য করেননি। ডঃ ভট্টশালী যে পুঁথির বিবরণ ও ফটো প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রথমে আছে

> পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
> তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥

এইসব গোলমেলে ব্যাপারের জন্যে 'বেদানুজ মহারাজা'-কে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অন্য প্রমাণের সাহায্যে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত।

আরও একটি ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আত্মকাহিনীর বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে কৃত্তিবাসের পাঠসমাপন ও গুরুগৃহত্যাগের বর্ণনার পরেই রাজ-দর্শনের বর্ণনা আছে বলে প্রায় সকলে মনে করেন যে কৃত্তিবাস ছাত্রজীবন সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে মূল আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসের গুরুগৃহত্যাগ ও রাজদর্শন বর্ণনার মাঝখানে তাঁর রামায়ণরচনার প্রসঙ্গ ছিল। রাজসংবর্ধনার শেষে জনতার উক্তি থেকে বোঝা যায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণরচনার খবর ইতিমধ্যে দেশমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ব্যাপার ঘটতে সময় লাগে। সুতরাং ছাত্রজীবন অবসানের অনেক পরে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের

সভায় গিয়েছিলেন বলতে হয়। আর আত্মকাহিনীর বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের সাক্ষ্য অনুসারেও বলা চলেনা যে কৃত্তিবাস পাঠসমাপনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজদর্শনে গিয়েছিলেন। কারণ গুরুগৃহত্যাগ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস বলেছেন,

বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥

এর মধ্যে রাজদর্শনের পরিকল্পনার আভাসমাত্রও নেই। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় গুরুগৃহ ত্যাগ করে কৃত্তিবাস ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। কত পরে তার উল্লেখ নেই বলেই গুরুগৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাজদর্শনে গিয়েছিলেন বলা ন্যায়সঙ্গত হবে না।

(কৃত্তিবাস ঠিক কোন্ সময়ে রাজার সভায় গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেও আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। তিনি লিখেছেন, মাঘ মাসের কোন্ এক দিন "সপ্ত ঘটি বেলা যখন দেওয়ানে পড়ে কাটি" তখন তিনি রাজসভায় প্রবেশের আহ্বান পেয়েছিলেন। সপ্তঘটি বেলাতে আগে রাজাদের সভা ভঙ্গ হত। কৃত্তিবাসের উক্তি থেকে বোঝা যায়, সভা যখন ভাঙবার জোগাড়, তখন তিনি রাজার আহ্বান পেয়েছিলেন। মাঘ মাসের সপ্ত ঘটি বেলা মানে সকাল সাড়ে নয়টার মত সময়। কৃত্তিবাস রাজার মুল সভা ভঙ্গের পর প্রমোদসভায় গিয়েছিলেন বলে আগে যে সিদ্ধান্ত করেছিলাম, তা ঠিক নয়।

এ সমস্ত কথা এত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম, তার কারণ কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অমূল্য দলিল। তার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না হলে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

এখন কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করা যাক্। আত্মকাহিনীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করার আগে এসম্বন্ধে অন্যান্য সূত্র থেকে কি জানা যায়. তা দেখি।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থ থেকে কৃত্তিবাসের কাল নির্ধারণের দু একটি সূত্র পাওয়া যায়। যেমন এর থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের পার্ষদ স্বরূপ দামোদরের উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ গোবিন্দ এবং কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি একই সমীকরণে সম্মানিত হয়েছিলেন। (প্রবাসী, ১৩৫৬, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯ দ্রঃ) এই থেকে কৃত্তিবাস ও স্বরূপ দামোদরের মধ্যে চার পুরুষের ব্যবধান ধরে

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় করেছিলাম। কিন্তু গোবিন্দ ও মুরারি যে একই বয়সী ছিলেন, তার যেমন কোন প্রমাণ নেই, তেম্‌নি স্বরূপ দামোদরের জন্ম যে ঠিক্ কোন্ সময়ে হয়েছিল, তাও জানা যায় না। কাজেই এর থেকে কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা যাবে না। কেবল মাত্র এইটুকু ধরা যেতে পারে যে, কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। তবে এই সমস্ত সূত্রগুলি কেবলমাত্র কুলগ্রন্থেই পাওয়া যায় বলে অনেকে হয়তো এগুলিকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবেন।

কৃত্তিবাসের সময় নির্ধারণের সব চেয়ে ভালো ও জোরালো সূত্র পাওয়া যায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (রচনাকাল আনুমানিক ১৫৫৫ খৃঃ)। জয়ানন্দ কৃত্তিবাস ও তাঁর রামায়ণের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, চৈতন্যদেবের সংসার ত্যাগের পাঁচ ছয় বছর পরে যখন ফুলিয়ানিবাসী হরিদাস তাঁর আহ্বানে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময়কার বর্ণনা জয়ানন্দ এইভাবে দিয়েছেন,

"সুনিঞা শ্রীহরিদাস চলিলা উৎকল।
ফুল্যার স্ত্রীপুরুষ কান্দে হয়্যা চঞ্চল ॥
হরিদাসপ্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।
মুরারি রিদয়ানন্দ সংসারে বিদিত ॥
দুর্গাবর মনোহর মহা কুলীন।
তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ ॥
ফুল্যার দেবতা শ্রীহরিদাস ঠাকুর।
তান ব্রজিতে সভে চলিলা কথোদুর ॥"

(এশিয়াটিক সোসাইটির G-5398-6-C.4নং পুঁথি, ১৩৫খ পৃষ্ঠা; সা. প. প. ১৩০৪, পৃঃ ১৫৭ও দ্রষ্টব্য।) উদ্ধৃত অংশের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ চরণের অর্থ আমাদের বিবেচনায় এই—যে বংশে সংসারবিখ্যাত মুরারি ও হৃদয়ানন্দ এবং মহাকুলীন দুর্গাবর ও মনোহর জন্মেছিলেন, সেই বংশেরই নন্দন প্রবীণ সুষেণ পণ্ডিত।

আনুমানিক ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে হরিদাস ফুলিয়া ছেড়ে নবদ্বীপে যান। এই সময়ে সুষেণ পণ্ডিত জীবিত ছিলেন ও ফুলিয়ায় বাস করতেন। এই ফুলিয়া কৃত্তিবাসেরও নিবাসভূমি। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে কৃত্তিবাসের যে

বংশলতিকা পাওয়া যায়, তাতে এক সুষেণ পণ্ডিতের নাম দেখা যায়। বংশলতিকাটি নীচে উদ্ধৃত হল,
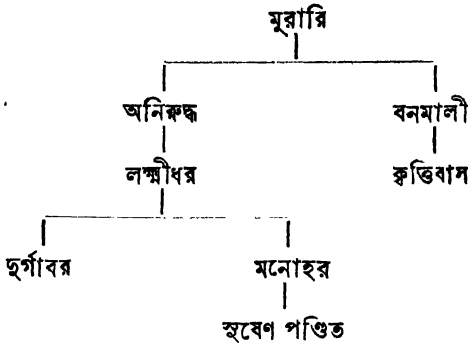
এই বংশলতিকার সুষেণ পণ্ডিত এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত সুষেণ পণ্ডিত যে অভিন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ দুজনেরই বাড়ী ফুলিয়ায়, দুজনেই কুলীন ব্রাহ্মণ এবং দুজনেরই মুরারি, দুর্গাবর ও মনোহর নামে পূর্বপুরুষ ছিলেন। বংশলতিকাটির পিছনে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের মত প্রাচীন ও প্রামাণিক সূত্রের সমর্থন থাকায় এর অকৃত্রিমতা সংশয়ের অতীত। তাহলে এই দুই সূত্রের সাক্ষ্য মিলিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র সুষেণ পণ্ডিত ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে জীবিত ছিলেন। পিতামহ ও পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবধান ৫০ বছর ধরা যায়। অবশ্য সুষেণ পণ্ডিতের প্রপিতামহ অনিরুদ্ধ কৃত্তিবাসের পিতা বনমালীর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন; সুতরাং এই ব্যবধান ৫০ বছরের কমও হতে পারে। মোটামুটিভাবে কৃত্তিবাস ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় জীবিত ছিলেন সন্দেহ নেই।

কুলগ্রন্থের আর একটি সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায়। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কতকগুলি কুলগ্রন্থের পুঁথি থেকে আবিষ্কার করেছেন যে কৃত্তিবাস তিন বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর এক শ্বশুরের নাম ছিল শঙ্কর (ভারতবর্ষ, ১৩৫৩, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭ দ্রঃ)। এই শঙ্করের ভাই উৎসাহের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বিখ্যাত নৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশ। বংশলতা,

উৎসাহ——শ্রীরঙ্গ——সুরেশ্বর——কুমুদানন্দ——কণাদ তর্কবাগীশ।

তাহলে কণাদ কৃত্তিবাসের প্রপৌত্রস্থানীয়। কতকটা স্থূলভাবে বিচার করে

এবং কতকটা প্রচলিত মতের বশবর্তী হয়ে ইতিপূর্বে আমি কণাদ তর্কবাগীশ ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এখন সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখছি কণাদ আর একটু পরে বর্তমান ছিলেন। কারণ কণাদ জানকীনাথ তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন এবং জানকীনাথের 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর' উক্তি নিজের 'ভাষারত্ন' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। জানকীনাথের 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী'তে আবার রঘুনাথ শিরোমণির 'পদার্থখণ্ডনে'র মত উদ্ধৃত হয়েছে। রঘুনাথ শিরোমণি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং ১৫২৫ থেকে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি' রচনা করেছিলেন (বর্তমান গ্রন্থে 'বাসুদেব সার্বভৌম' শীর্ষক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং কণাদ তর্কবাগীশের জীবৎকালের ঊর্ধ্বতম সীমা ১৫৫০খৃঃ। কণাদের লেখা 'তত্ত্বচিন্তামণিটীকা'র অনুমানখণ্ডের প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১৫০৪ শকাব্দ বা ১৫৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং কণাদ ১৫৫০ ও ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন। সুতরাং কণাদের প্রপিতামহস্থানীয় কৃত্তিবাস তার ৮০।৯০ বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর সপ্তম, অষ্টম বা নবম দশকে বর্তমান ছিলেন বলতে হয়।

কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তাঁর পরিচয় বা সময় নির্ধারণ করতে পারলে কৃত্তিবাসের কালনিরূপণ-সমস্যা আর থাকেনা। সুতরাং এখন সেই চেষ্টাই করা যাক্।

অনেকেই মনে করেন (আমিও আগে করেছিলাম) যে এই গৌড়েশ্বর হিন্দু রাজা গণেশ। এ-রকম ধারণার প্রধান কারণ দুটি :—

(১) কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত সভাসদের নাম করেছেন, তাঁরা সকলেই হিন্দু। এর থেকে মনে হয় রাজা নিজেও হিন্দু। গণেশ ছাড়া আর কোন হিন্দু বাংলার সিংহাসনে বসেননি।

(২) ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে যে চীনা রাজপ্রতিনিধিদল বাংলার রাজসভায় এসেছিলেন, তাঁদের একজন সদস্য লিখেছেন যে বাংলার রাজপ্রাসাদে নটি মহল ছিল (রাজা গণেশের আমল, পৃঃ ৬৭,১৩০)। ঠিক ঐ সময়েই গণেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং তার দু একবছর বাদেই তিনি 'দনুজমর্দনদেব' নামে মুদ্রা প্রকাশ করেন। সুতরাং চীনা প্রতিনিধি বর্ণিত প্রাসাদেই বোধহয় তিনি বাস করতেন। কৃত্তিবাস আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের ন-মহলা প্রাসাদের কথাই লিখেছেন।

প্রথম যুক্তিটি সম্বন্ধে বলা যায়, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর যে কোন গৌড়েশ্বরের সভায় হিন্দু সভাসদদের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলাউদ্দীন হুসেনশাহের (১৪৯৩-১৫১৯খৃঃ) কথা ধরা যায়। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সূত্র থেকে তাঁর এতগুলি হিন্দু সভাসদের নাম জানা গেছে——'সাকর মল্লিক' সনাতন, 'দবির খাস' রূপ, 'অধিপাত্র' চিরঞ্জীব সেন (গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা), কেশব ছত্রী, 'অন্তরঙ্গ' মুকুন্দ, রায় গংগ্রয় (কুতুবনের মৃগাবতীতে এই নামটি এইভাবে পাওয়া যায়), যশোরাজ খান প্রভৃতি। কোন কবি যদি হুসেন শাহের সভা বর্ণনা করতেন, তাহলে বোধহয় তাতে কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরের সভার চেয়েও বেশী হিন্দু সভাসদের নাম পাওয়া যেত। হুসেনশাহ হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলে এত হিন্দু সভাসদ নিয়োগ করেছিলেন মনে করার কোন হেতু নেই। কারণ তাঁর হিন্দুবিদ্বেষী কার্যকলাপের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় (যেমন উড়িষ্যার মন্দির ভাঙা) আর হুসেন শাহের পূর্ববর্তী সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের-ও (১৪৫৯-১৪৭৬খৃঃ) অনেক হিন্দু সভাসদ ছিলেন বলে জানা যায়। সুতরাং কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর যে মুসলমান হতে পারেন না, তা বলা যায় না। এখানে আরও একটা কথা ভাববার আছে। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের মাত্র আট নয় জন সভাসদের নাম করেছেন,

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বস্যা আছেন ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রেমিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসি আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভাপুজিত তিহোঁ গৌরব আপার ॥
তিন পাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে ॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥

কিন্তু "পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।" সুতরাং তাঁর সভায় মাত্র আট নয়জন সভাসদ থাকতে পারেন না। আরও সভাসদ যে ছিলেন, তাও উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। সুতরাং সহজেই উপলব্ধি করা যায়

যে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের বহু সভাসদের মধ্যে বাছা বাছা মাত্র আট নয় জনের নাম করেছেন। তিনি যাঁদের নাম করেননি, তাঁদের মধ্যে হয়তো মুসলমানও অনেকে ছিলেন। কৃত্তিবাস হয়তো "যবন"দের নাম লেখা পছন্দ করেন নি। আর তিনি যাঁদের নাম করেছেন, তাঁরা সকলেই যে হিন্দু, তা কে বলতে পারে? কেদার খাঁ = Qadar Khan হতে বাধা কি?

দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা যায়, গণেশের সময়ে বাংলার রাজপ্রাসাদ নয়-মহলা ছিল বলে আর কোন গৌড়েশ্বরের সময় তা থাকবে না, এ-রকম ভাবা কোনমতেই চলে না। সব যুগেই রাজাদের প্রাসাদ নির্মাণে একটি বিশেষ রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে, সুতরাং গণেশের প্রাসাদ যদি নয়-মহলা হয়, তাহলে ঐ যুগের অন্যান্য গৌড়েশ্বরদের প্রাসাদও তাই হওয়া স্বাভাবিক।

সুতরাং গণেশই যে কৃত্তিবাস-উল্লিখিত গৌড়েশ্বর, একথা বলবার অনুকূলে যুক্তি বিশেষ জোরালো নয়। বরং এর বিরুদ্ধে যুক্তি আছে। ডঃ সুকুমার সেন এই দুটি বিষয়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,

(ক) কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী পড়লে মনে হয়, গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কৃত্তিবাসের কোন রকম বাক্যবিনিময় হয়নি। কৃত্তিবাস লিখেছেন,

নিকট যাইতে রাজা মোরে দিলা হাথসান॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বর।

রাজা কৃত্তিবাসকে ডাকলেন, পাত্রমিত্রেরা উচ্চস্বরে বলল, রাজা ডাকছেন। এইরকম যখন "রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান", তখন পাত্রমিত্রেরাই রাজা এবং কৃত্তিবাস দুজনের সঙ্গে কথা বলল। পাত্রমিত্রেরা যেন রাজা এবং কৃত্তিবাসের মধ্যে দোভাষীর কাজ করেছে। এর থেকে মনে হয়, রাজা বাংলা ভাষা ভাল জানতেন না।

(খ) কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে অর্থ নিতে অস্বীকার করলেন কেন? সম্ভবতঃ রাজা বিধর্মী বলেই কৃত্তিবাস তাঁর কাছে অর্থগ্রহণ করেননি।

আগেই দেখিয়েছি, কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র সুষেণ পণ্ডিত এবং প্রপৌত্র স্থানীয় কণাদ তর্কবাগীশের সময় থেকে হিসাব করে কৃত্তিবাসকে ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস যে এই সময়ে বর্তমান ছিলেন, এবং এই সময়ের এক গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত সভাসদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেদার রায় ও নারায়ণের নাম পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এই দুই নামের দুজন গৌড়রাজসভাসংশ্লিষ্ট লোক বর্তমান ছিলেন, তা আমরা অন্য প্রামাণিক সূত্র থেকে জানতে পেরেছি।

বিখ্যাত মৈথিল স্মার্ত গ্রন্থকার বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁর 'দণ্ডবিবেক' গ্রন্থের উপক্রমে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা ভৈরবসিংহ সম্বন্ধে বলেছেন,

"যঃ শ্রীকুসেনমপনীতসমস্তসেন-
মাত্মীয়সৈনিকমিবাত্মমতে নিযুংক্তে।
গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ
কেদাররায়মবগচ্ছতি দারতুল্যম্॥

(যিনি শ্রীকুসেনকে অপনীত করে তাঁর সমস্ত সেনা নিজের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করেছেন এবং গৌড়েশ্বরের প্রতিশরীর কেদার রায়কে যিনি স্ত্রী-লোকের মত দেখেন।)

এখন 'দণ্ডবিবেক' কোন্ সময়ে লেখা হয়েছিল দেখা যাক্। ৺মনোমোহন চক্রবর্তী লিখেছেন, "The Danda-viveka and the Smrti-tattvāmrta are productions of a somewhat mature age." এবং "In the final colophon of the Danda-viveka he is called Dharmmādhikaranika or judge and of the Smrti-tattvāmrta he is called Maha-dharmmādhikāri or chief judge." সুতরাং যে সময়ে বর্ধমান ধর্মাধিকরণিকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়েই দণ্ডবিবেক রচিত হয়েছিল। ঠিক এই সময়ে বর্ধমানের আজ্ঞায় লেখানো একটি যজুর্বেদটীকার পুঁথি পাওয়া গেছে। পুঁথিটির পুষ্পিকা অবিকল উদ্ধৃত করছি,

"লসং ৩৭২ আষাঢ় বদি দ্বাদশী চন্দ্রে রত্নপুরনগরে ধর্ম্মাধিকরণিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীবর্ধমানমহাশয়ানামাজ্ঞয়ালিখিতমিদং সত্বরপাণিনাশ্রীগোণ্ডি-শর্ম্মনেতি" (J. B. O. R. S., 1928. P. 311)।

লসং ৩৭২, ১৪৫২ থেকে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পড়বে, কারণ লসং-এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দের ব্যবধান ১০৮০ বছর থেকে সুরু করে ১১২৯ বছর পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং দণ্ডবিবেক যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভৈরবসিংহের রাজত্বকাল থেকেও দণ্ডবিবেকের রচনাকাল নির্ধারণ করা যায়। ভৈরবসিংহের পিতা নরসিংহের একটি শিলালিপির তারিখ "শরাশ্বমদনঃ" (১৩৭৫) শকাব্দ বা ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ। ভৈরবসিংহের ছেলে রামভদ্রসিংহ সম্ভবতঃ ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করতেন, কারণ রামভদ্রের রাজত্বকালে গদাধর 'তন্ত্রপ্রদীপ' লিখেছিলেন এবং এই গদাধরের আজ্ঞায় ১৪২৬ চল্‌তি শকাব্দ বা ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে কৃত্যকল্পতরুর দানকাণ্ডের একটি পুঁথি নকল করানো হয়েছিল। সুতরাং ভৈরবসিংহ পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষাংশ ও চতুর্থ পাদের প্রথমাংশে রাজত্ব করেছিলেন বলা যায়। সুতরাং 'দণ্ডবিবেক'-ও ঐ সময়েরই রচনা।

'দণ্ডবিবেকে'র পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটির প্রথম ছত্রে জনৈক 'শ্রীকুসেন'-এর নাম আছে; বলা বাহুল্য এখানে লিপিকরপ্রমাদ আছে। প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ 'শ্রীহুসেন'। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আমায় বলেছিলেন একটি পুঁথিতে 'শ্রীহুসেন' পাঠই পাওয়া গেছে। এই 'শ্রীহুসেন' সম্ভবতঃ জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শার্কী, যিনি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে বাহলল লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে রাজ্য হারান এবং ১৫০০ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুলতানের আশ্রয়ে পরলোকগমন করেন। দণ্ডবিবেকে 'শ্রীহুসেন' লেখা থাকাতে বোঝা যায় যে হুসেন ঐ সময় জীবিত ছিলেন এবং 'যঃ শ্রীহুসেনমপনীত' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ত্রিহুতের উপর হুসেন শার্কীর আধিপত্যের অবসান বোঝাচ্ছে বলে মনে হয়। অতএব বইটি ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে লেখা বলে বোধ হয়।

যাইহোক্, দণ্ডবিবেক যে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষে বা চতুর্থ পাদে রচিত হয়েছিল, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। ঐ সময়ের গৌড়েশ্বরের কেদার রায় নামে একজন officer ছিলেন, যাঁর উপাধি ছিল 'প্রতিশরীর'। ৺মনোমোহন চক্রবর্তী 'প্রতিশরীর'-এর অর্থ করেছিলেন 'প্রতিনিধি'।

ঠিক একই সময়ে গৌড়রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক 'নারায়ণ' এরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সেন আমল থেকে সুরু করে হোসেন শাহী আমল পর্যন্ত গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক 'অন্তরঙ্গ' উপাধিতে পরিচিত হতেন। মুসলমান আমলের কয়েকজন 'অন্তরঙ্গে'র নাম আমরা জানি। শিবদাস সেনের পিতা অনন্ত সেন বারবক শাহের অন্তরঙ্গ ছিলেন। চৈতন্যদেবের পরিকর শ্রীখণ্ডের

মুকুন্দ ছিলেন হুসেন শাহের 'অন্তরঙ্গ'। মুকুন্দের পিতার নাম নারায়ণদাস, সংক্ষেপে নারায়ণ। এই নারায়ণও গৌড়েশ্বরের "অন্তরঙ্গ" ছিলেন। ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা'তে নারায়ণদাস সম্বন্ধে লেখা আছে,

নারায়ণো যোঽভূৎ সোঽন্তরঙ্গ কবীশ্বরঃ॥ (পৃঃ ৩৪৫) এবং

অথাস্য নারায়ণদাসকস্য
খানান্তরঙ্গস্য সুতাস্ত্রয়োঽম্বমী।
মুকুন্দদাসঃ সুকৃতৈবাসঃ
স রাজবৈদ্যঃ সুজনাভিলাষঃ॥ (পৃঃ ৩৫০)

চূড়ামণিদাসের লেখা চৈতন্যচরিতগ্রন্থ 'গৌরাঙ্গবিজয়ে' (রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দী) এই উক্তির সমর্থন পাচ্ছি। 'গৌরাঙ্গবিজয়ে' এক জায়গায় নারায়ণ-দাসের পুত্র মুকুন্দকে দিয়ে বলানো হয়েছে, "রাজবৈদ্য নারায়ণদাস মোর বাপ"। এই নারায়ণদাসই 'রাজবল্লভ দ্রব্যগুণ' নামে বিখ্যাত আয়ুর্বেদগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থের 'রাজবল্লভ' নাম থেকেও বোঝা যায় যে গ্রন্থকারের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ছিল। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আমায় বলেছিলেন যে 'রাজবল্লভে'র একটী পুঁথিতে তিনি নারায়ণ দাসের 'অন্তরঙ্গ' উপাধি দেখেছিলেন।

কোন্ সময়ে নারায়ণদাস গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক ছিলেন, তা এবার ঠিক করতে হবে। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখতে পাই, গৌড়ীয় ভক্তেরা যেবার প্রথম নীলাচলে রথযাত্রার সময় চৈতন্যদেবকে দেখতে যান (আনুমানিক ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ), সেই সময় শ্রীচৈতন্য মুকুন্দের সঙ্গে তাঁর পুত্র রঘুনন্দনের সম্বন্ধে আলাপ করছেন (মধ্যলীলা, ১৫শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই আলাপ থেকে বোঝা যায় রঘুনন্দনের বয়স ঐ সময় ২০।২২ বছরের কম হতে পারে না। অতএব মুকুন্দ তখন প্রৌঢ়বয়স্ক। সুতরাং তাঁর পিতা নারায়ণদাসের কর্মজীবন স্বাভাবিকভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষাংশে ও চতুর্থ পাদে পড়বে। নারায়ণদাসের পৌত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখরের একটি পদে নারায়ণদাসের কনিষ্ঠ পুত্র নরহরি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।

(গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৪৫৬)

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। ঐ সময়ের আগেই যদি নারায়ণদাসের কনিষ্ঠ পুত্র 'ব্রজরস' গান করে থাকেন তাহলে নারায়ণদাসের বয়স ঐ সময়ে ৫০ বছরের কম হয় না। অতএব নারায়ণদাস যে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষ দিকে ও চতুর্থ পাদে গৌড়েশ্বরের "অন্তরঙ্গ" বা রাজবৈদ্য ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব তিনি 'দণ্ডবিবেকে' উল্লিখিত কেদার রায়ের সমসাময়িক।৮

আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস রাজসভাসদ গন্ধর্ব রায়েরও নাম করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গৌড়রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ নামের একজন লোকের সন্ধানও পাওয়া গেছে। কায়স্থদের কুলপঞ্জীতে গোপীনাথ বসু নামে একজন কায়স্থ সমাজপতির নাম পাওয়া যায়। "গোপীনাথ বসু সুলতানগণের প্রিয়কার্যসাধন করিয়া রাজস্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তিনি পুরন্দর খাঁ উপাধি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ বসু ধনাধ্যক্ষ হইয়া গন্ধর্ব্ব খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন"। এই কুলপঞ্জীগুলি থেকে জানা যায়, পুরন্দর খাঁ ও গন্ধর্ব খাঁ শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর বসুর জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। মালাধর বসু ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা সুরু করেন এবং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ করেন। সুতরাং এঁরা দুজনেও ঐ সময় বর্তমান ছিলেন বলে মনে করা যায়। ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর উক্তি থেকেও এই মত সমর্থিত হয়। তিনি লিখেছেন, "পুরন্দর খাঁর অভ্যুদয় সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস যে সুলতান হোসেন শাহের সময় তিনি গৌড়েশ্বরের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায়, সুলতান হোসেন শাহের পূর্ব্বে তিনি কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন এবং গৌড়ের দরবারে লেখাপড়ার কর্ত্তা বা সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।" পুরন্দর খাঁ ও গন্ধর্ব খাঁর সময়, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিতর্কের বিষয়, কারণ কুলজীগ্রন্থগুলিকে নাতিপ্রামাণিক বলেই গণ্য করা হয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, কুলজীগ্রন্থগুলির উক্তি অনুসারে যে সময়ে "গৌড়েশ্বরের ধনাধ্যক্ষ গন্ধর্ব খাঁ"-কে পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই প্রামাণ্য সূত্র থেকে কেদার রায় ও নারায়ণ নামে গৌড়েশ্বরের আর দুজন officer এর নাম পাওয়া যাচ্ছে এবং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতেও রাজার সভাসদদের তালিকায় 'গন্ধর্ব রায়'এর নাম পাওয়া যাচ্ছে। অতএব এক্ষেত্রে কুলজীগ্রন্থগুলির কথা সত্য বলেই বিশ্বাস হয়। কৃত্তিবাস যাঁকে 'গন্ধর্ব রায়' বলেছেন, কুলজীকাররা তাঁকেই 'গন্ধর্ব খান' বলেছেন,

এরকম অনুমান অযৌক্তিক হয় না। ৺বসন্তরঞ্জন রায় সম্ভবতঃ কোন কুলজীগ্রন্থে 'গন্ধর্ব রায়' নামই দেখেছিলেন, কারণ তিনি "গোপীনাথ বসুর ভ্রাতা গন্ধর্ব রায়" লিখেছিলেন (সা. প. প., ১৩৪০, পৃঃ ১১১)। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর গন্ধর্ব রায়ের সঙ্গে এই গন্ধর্ব খান বা গন্ধর্ব রায় যদি অভিন্ন হন, তাহলে কৃত্তিবাসের জীবৎকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই হয়।

সুতরাং আমরা এখন কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি। তিনি যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তাঁর নাম জানবার বর্তমানে কোন উপায় নেই। তবে তিনি যে ঠিক কোন্ সময়ে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তা মোটামুটিভাবে স্থির করা যায়। কেদার রায়, নারায়ণ ও গন্ধর্ব রায় এই তিনজন ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় একই সঙ্গে গৌড়রাজসভার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করছি যে কৃত্তিবাস ঐ সময়েই গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের (Later Illyas Shahi Dynasty) সুলতানেরা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেই বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এদিক দিয়েও, কৃত্তিবাসের রাজদর্শনের ও রাজসংবর্ধনালাভের যে সময় আমরা নির্ধারণ করলাম, তা সমর্থিত হয়। রাজদর্শনের আগেই কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ রচনা সুরু করেছিলেন এবং এর কিছু পরে তাঁর রামায়ণ সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং রাজদর্শনের সময় থেকে কৃত্তিবাসের রামায়ণরচনাকালও মোটামুটিভাবে স্থির করা যায়।

॥ সাত ॥

মালাধর বসু

বাংলার চৈতন্য-পূর্ববর্তী সাহিত্যের মধ্যে 'গুণরাজ খান' উপাধিধারী মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অন্য রচনাগুলির মত এর রচনাকাল বিতর্কের বিষয় নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' থেকে জানা যায়, মহাপ্রভু স্বয়ং নীলাচলে মালাধর বসুর পুত্রের কাছে এই কাব্য ও তার রচয়িতার প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করে এর এক ছত্র আবৃত্তি করেছিলেন,

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর ॥

সুতরাং মহাপ্রভুর নীলাচলে বাসের আগে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেছিলেন সন্দেহ নেই। ৺রাধিকা নাথ দত্ত ৪০১ চৈতন্যাব্দে বা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন, তার শেষে এমন কতকগুলি শ্লোক পাওয়া যায়, যা অন্য পুঁথিতে মেলে না। এর মধ্যে একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল দেওয়া আছে; এর থেকে জানা যায় ১৩৯৫ শক বা ১৪৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা সুরু হয় এবং ১৪০২ শকাব্দ বা ১৪৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়।

তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥

রাধিকানাথ দত্ত ১৪০৫ শকাব্দ বা ১৪৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে লেখা একটি "মণ্ডের তুলট ছাঁচের কাগজে লিখিত, অত্যন্ত জীর্ণ" পুঁথি ব্যবহার করেছিলেন বলে জানিয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের ভাষা ঠিক ১৪৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দের মত নয় বলে ডঃ সুকুমার সেন এই পুঁথির তারিখে সংশয় প্রকাশ করেছেন (বা. সা. ই.

১।২, পৃঃ ১০৭)। কিন্তু তিনি অন্যত্র বলেছেন যে এই ভাষাতে "ইহার মূলাংশ অনেক পরিমাণ অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে" (বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩)। আসলে, রাধিকানাথ ১৪০৫ শকাব্দের পুঁথিটিকে হুবহু নকল করে যে ছাপান নি, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন। পুঁথিটির পাঠ তাঁর ভাষায় "স্থানে স্থানে উদ্ধার করা হইয়াছে।" রাধিকানাথ এই পুরোনো পুঁথিটির খুব অল্প অংশেরই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিলেন, যেখানে পেরেছিলেন, সেখানে তাই গ্রহণ করেছিলেন, অন্যত্র তিনি বটতলার সংস্করণের পাঠই বজায় রেখেছিলেন। তাই তাঁর সংস্করণের কোথাও কোথাও মূল ভাষা এবং কোথাও কোথাও অর্বাচীন ভাষা পাওয়া যায়।

যা হোক্, এখানে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকালই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। রাধিকানাথ দাসের ব্যবহৃত পুঁথি যদি সত্যিই চৈতন্য-পূর্ববর্তী সময়ের হয়, তাহলে তাতে উল্লিখিত রচনাকালের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। কিন্তু এই পুঁথিটি এখন আর পাওয়া যায় না। অন্য পুঁথিতে রচনাকালসূচক পয়ারটি নেই। এই জন্যে কেউ কেউ পয়ারটির অকৃত্রিমতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সংশয়নিরসনের জন্যে এখানে আর একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করছি। রাধিকানাথ-প্রকাশিত সংস্করণে রচনাকাল-বাচক শ্লোক সমেত যে অতিরিক্ত শ্লোকগুলি পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে এই শ্লোকটিও আছে,

সত্যরাজ খান হয় হৃদয় নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন॥

সুতরাং এই শ্লোকসমষ্টির সাক্ষ্য অনুসারে ১৪০২ শকাব্দেই মালাধর বসুর পুত্র 'সত্যরাজ খান' নামে পরিচিত হয়েছিলেন (বলা বাহুল্য 'সত্যরাজ খান' নাম নয়, উপাধি)। এই সাক্ষ্যের সমর্থনে একটি পাথুরে প্রমাণ আছে। কুলীনগ্রামে "গোপালের অনতিদূরে একটি শিবের মন্দির। সেই মন্দিরে একটি বৃষ আছে, তাহার গলদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে,

শাকে বিশতি বেদে খে মর্নো হি শিবসন্নিধৌ।
খানশ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোঽয়ং ময়া বৃষঃ॥
(নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', ভূমিকা, পৃঃ ৶০)

শ্লোকটি থেকে জানা যায়, ১৪০২ শকাব্দের মাত্র দু'বছর পরে, ১৪০৪ শকাব্দে সত্যরাজ খান এই বৃষমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং এই শ্লোকসমষ্টি তথা রচনাকালবাচক শ্লোকটিকে অকৃত্রিম বলেই স্বীকার করা উচিত।

এই শ্লোকসমষ্টিরই মধ্যে আছে,

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥

এই গৌড়েশ্বর কে? কেউ বলেন ইনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্, কেউ বলেন শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ্, কেউ বলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকালসূচক শ্লোকটিকে অকৃত্রিম বলে মেনে নিলে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নাম এই প্রসঙ্গে উঠতে পারে না, কারণ তিনি ১৪০২ শকাব্দের ১৩ বছর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বা শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহই কবিকে এই উপাধি দিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রথমেই কবি 'গুণরাজ খান' নামে ভণিতা দিয়েছেন। সুতরাং ১৪৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের আগেই তিনি এই উপাধি পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত History of Bengal, Vol. II (p. 135) থেকে দেখছি, রুকনুদ্দীন বারবক শাহের ৮৭৯ হিজিরা বা ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দের পর্যন্ত শিলালিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর ছেলে শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, তার তারিখ পড়া হয়েছে ৮৭৮ হিজিরা বা ১৪৭৩-৭৪ খৃঃ। য়ুসুফ শাহ যুবরাজ অবস্থাতেই রাজকীয় মর্যাদা লাভ করেছিলেন বলে এই বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। য়ুসুফ শাহের ৮৮০ হিজিরা বা ১৪৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে বলে ঐ বছর থেকেই তাঁর রাজত্বের আরম্ভ হয়েছিল ধরা হয়েছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তেরও কিছু সংশোধন দরকার। বারবক শাহ যে অন্ততঃ ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। হরিদাসরচিত শ্রাদ্ধবিবেকে উদ্ধৃত বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা বিশারদের একটি বচনে আছে, "তথা গৌড়প্রৌঢ়পরিবৃঢ়ে বারবকে রাজ্যং শাসতি সপ্তনবত্যধিকত্রয়োদশশতীমিতশকাব্দে চান্দ্রাশ্বিন-সংক্রান্তিং কৃত্বা প্রতিপত্ত্যৈব সংচর্য্য রবেরমাবস্যায়াং কুম্ভসংক্রমে প্রতিপদি মীনসংক্রান্তাবেকস্মিন্নব্দে দ্বয়োঃ সংক্রান্তিশূন্যত্বং দৃষ্টমিতি বিশারদেনোক্তং" (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা, পৃঃ ৪৯)। অতএব বারবক শাহ অন্ততঃ ১৩৯৭ শকাব্দের মীনসংক্রান্তি বা ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ অবধি নিশ্চয়ই রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় অবধি য়ুসুফ শাহের যে সমস্ত শিলালিপি ও মুদ্রা পাওয়া যায়, সমস্তই যুবরাজ

অবস্থার বলে মনে হয়। অতএব যতদূর মনে হয় রুকনুদ্দীন বারবক শাহই মালাধর বসু কথিত গৌড়েশ্বর।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে মালাধর বসুকে 'গুণরাজ ছত্রী' বলা হয়েছে; সন্ন্যাসগ্রহণ করে উৎকলে যাবার পথে মহাপ্রভু কুলীনগ্রামে গেলে "গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয় নানা মহোৎসব করি" (এশিয়াটিক সোসাইটির G-5398 নং পুঁথির পাঠ; ছাপা বইতে আছে 'গুণরাজ ছীত্র') তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। 'ছত্রী' সম্ভবতঃ মালাধর বসুর রাজপদের নাম। তুলনীয়, কেশব ছত্রী। অবশ্য ছত্রী<ক্ষত্রিয় ও ধরা হয়। কিন্তু ৺রাধিকানাথ দত্তের সংস্করণে দেখি মালাধর বসু বলছেন "কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস"। তবে কি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতেও কায়স্থদের ক্ষত্রিয় বলে গণ্য করা হত? এখানে উল্লেখযোগ্য, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও কুলজীগ্রন্থে লেখা আছে কেশব ছত্রীর আসল নাম ছিল কেশব বসু। প্রায় একই সময়ের দুই 'বসু' পদবীধারী লোক 'ছত্রী' বিশেষণে উল্লিখিত হলেন কেন, এ বিষয়টা ভাববার মত। আমরা কেবল এসম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হলাম।

॥ আট ॥

বিজয়গুপ্ত

বান, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাপ, বাঘ, রাজরোষ প্রভৃতির অত্যাচারে মধ্যযুগের বাঙালী যতই জর্জরিত হয়েছে, ততই নানা লৌকিক দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়ে অব্যাহতির প্রার্থনা জানিয়েছে। এই লৌকিক দেবদেবীর মহিমা কীর্তন উপলক্ষ করেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা—মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই সবচেয়ে প্রাচীন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাইএর মনসামঙ্গল পাওয়া গিয়েছে। অন্য কোন মঙ্গলকাব্যের এত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

এদের মধ্যে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল বাংলার জনপ্রিয় কাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববঙ্গে এই কাব্যের জনপ্রিয়তা এত বেশী হয়েছিল যে গায়েনদের হাতে পড়ে মূল রচনা একান্ত বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং তার সঙ্গে অন্য কবিদের রচনা এসে মিশেছে। এদিক দিয়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে এই বইএর তুলনা চলে।

কিন্তু এই বইএর রচনাকাল সম্বন্ধে গবেষকদের মধ্যে এখনও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার কারণ এর পুঁথি খুবই দুর্লভ এবং বিভিন্ন ছাপা বইতে বিভিন্ন রচনাকালসূচক শ্লোক পাওয়া যায়। তাই অনেকে এইসব শ্লোকের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেননি।

এসম্বন্ধে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে আমরা বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের সবচেয়ে পুরোনো মুদ্রিত সংস্করণটির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করব। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বরিশাল থেকে রামচরণ শিরোরত্ন এই সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে তিনখানি পুঁথি ব্যবহৃত হয়েছিল। একখানি ১১৮১ সন বা ১৭৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দের, দ্বিতীয়টি ১৭২০ শক বা ১৭৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের এবং তৃতীয়টি ১৭৯৪ শক বা ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের। তখনও বিজয়গুপ্তের সময় নিয়ে কোন বিরোধ বা বিতর্ক দেখা দেয়নি বলে এই বিষয়ে এই সংস্করণের সাক্ষ্য মূল্যবান।

এই সংস্করণে এই রচনাকালনির্দেশক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক॥

বিজয়গুপ্তের নিজের গ্রামের পুঁথিতেও শ্লোকটির এই পাঠই পাওয়া গেছে। এর থেকে জানা যায়, ১৪০৬ শকে (=১৪৮৪-৮৫ খৃঃ) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ে কোন সুলতান হোসেন সাহাকে পাওয়া গেল না। হোসেন সাহা বলতে সকলে আলাউদ্দীন হোসেন শাহকেই জানতেন। তিনি ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর জন্যে অনেকে রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকটির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

তখন কোন কোন গবেষক জানালেন একখানি পুঁথিতে 'ঋতু শূন্য বেদ শশী'র জায়গায় 'ঋতু শশী বেদ শশী' পাঠ পাওয়া গিয়েছে। ১৪১৬ শক (=১৪৯৪-৯৫ খৃঃ) আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালের মধ্যে পড়ে বলে অনেকে এই পাঠ গ্রহণ করলেন। কিন্তু অনেকেরই সন্দেহ ঘুচল না। কারণ, যে পুঁথিতে এই পাঠ পাওয়া গিয়েছিল, তার কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি।

আমাদের মনে হয়, 'ঋতু শশী বেদ শশী' পাঠ আসলে কোন পুঁথিতে আদৌ ছিল না। ১৪০৬ শকে হোসেন শাহকে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি কৃত্রিম প্রমাণিত হলে বিজয়গুপ্তের প্রাচীনত্বের দাবী কমে যায়। এইসব কারণেই 'ঋতু শশী বেদ শশী' এই কাল্পনিক পাঠের উদ্ভাবন করা হয়েছিল। আসলে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম মুদ্রিত সংস্করণ এবং তাঁর নিজের গ্রামের পুঁথির সাক্ষ্যই ঠিক্। 'ঋতু শূন্য বেদ শশী' পাঠই শুদ্ধ। ১৪৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ছিলেন না বটে, কিন্তু আর এক হোসেন শাহ ছিলেন। তাঁর রাজকীয় নাম জালালুদ্দীন ফতে শাহ হলেও সাধারণের কাছে তিনি হোসেন শাহ নামেই পরিচিত ছিলেন। ইনি 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশে'র লোক। এঁর রাজত্বকাল ১৪৮১-১৪৮৭ খৃঃ। এঁর সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal (Vol. II)তে লেখা আছে, "named Husain, who on his accession assumed the title of Jalaludin Fath" এবং "Most of his coins bear, after the regnal titles, the words 'Husain Shāhi', which, like the 'Badr Shāhi'…of the Husaini dynasty, must refer to his popular name."(p.136)। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে, ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দ বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের প্রকৃত রচনাকাল এবং হোসেন সাহার উল্লেখের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই।

উপসংহারে আর একটি কথা বলবার আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যত হোসেন সাহার উল্লেখ পাওয়া যায়, সমস্তই আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেযুগে আর একজন স্থলতান হোসেন শাহ ছিলেন। ইনি দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের লোক, যে বংশ সাহিত্য ও বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে বিখ্যাত। স্থতরাং 'হোসেন শাহা' সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ এই 'হোসেন শাহা'র প্রতি প্রযুক্ত ধরলে অন্যায় হবে না।

॥ নয় ॥

বিপ্রদাস পিপিলাই

বিপ্রদাস পিপিলাইএর মনসামঙ্গল (বা মনসাবিজয়) বাংলার সর্বপ্রাচীন মনসামঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এই কাব্যে কবি এইভাবে কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন,

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের প্রধান ॥

সুতরাং ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দই বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যের রচনাকাল।

কিন্তু এই তারিখে অনেক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সন্দেহের প্রধান কারণ, চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় কয়েকটি স্থানের উল্লেখ। এক জায়গায় রয়েছে,

খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দণ্ডবত।
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত ॥

আর এক জায়গায় আছে,

পূর্ব কূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা ॥

এঁরা বলেন ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের পরে নিত্যানন্দ খড়দহে বসতি স্থাপন করলে খড়দহ ভক্তদের কাছে শ্রীপাট নামে পরিচিত হয়। আর 'কলিকাতা' জব চার্ণকের আগমনের (১৬৯৪ খৃঃ) আগে অত্যন্ত তুচ্ছ একটি গ্রাম ছিল। এই দুই স্থানের উল্লেখ যে কাব্যে আছে, তা পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা হতে পারে না। যাঁরা এই কাব্যকে পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলেই বিবেচনা করেন, তাঁরাও এই দুই উল্লেখকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

আমাদের কিন্তু মনে হয়, এই দুই উল্লেখ প্রক্ষিপ্তও নয়, কাব্যটির প্রাচীনত্বের বিরোধীও নয়। কারণ, ১৪৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে যে কবি কাব্য রচনা করেছিলেন, নিত্যানন্দের খড়দহে বসতি স্থাপনের সময় অবধি তাঁর জীবিত

থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। কবি একবার কাব্য লেখবার পরেও বারবার তার সংস্কার করতে পারেন। সুতরাং খড়দহ 'শ্রীপাট' আখ্যায় পরিচিত হবার পর তিনি নিজেই তার নাম কাব্যে জুড়ে দিয়েছেন, এমনও হতে পরে।

'শ্রীপাট খড়দহ'র সমস্যা এইভাবে সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু 'কলিকাত্তা'-সমস্যা সমাধানের জন্যে আরও বিস্তৃত আলোচনার দরকার।

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করবার আগে যে কলকাতার কোন অস্তিত্ব ছিল না, বা থাকলেও তা একান্ত তুচ্ছ একটি গ্রাম ছিল, এ ধারণা একান্তই ভুল। বহুদিন আগে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় একটি প্রবন্ধ লিখে এই ভুল ভাঙবার প্রয়াস পান, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। আচার্য সুনীতিকুমারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে এসম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং পুরোনো ও নতুন তথ্য মিলিয়ে আমরা আবার এই বিষয়টির আলোচনা করছি।

জব চার্ণকের কলকাতায় আসার তিন বছর আগে লেখা কৃষ্ণদাসের নারদপুরাণ নামে একটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬১৮-১৯) থেকে এর বিবরণ উদ্ধৃত করছি।

"হ. লি. (হস্তলিপি) ১১০৮ সাল। গ্রন্থশেষে কবির পরিচয় এইরূপ, 'অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার। সুবর্ণবণিককুলে উৎপত্তি আমার॥ পৈত্রিক বসতি পূর্ব্বে অম্বিকানগর। হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর॥ পিতামোহ নাম ছিল মদনমোহন। পিতা তারাচাঁদ নাম ধর্ম্মপরায়ণ॥ এ সকল পুণ্যবান্ আছে পূর্ব্বকীর্ত্তি। এ অধমের সংসারে অপকীর্ত্তি॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল রামনারায়ণ। ভেক আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ॥ রঘুনাথ মধ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান। স্বর্গবাসে গেলা তিঁই চাপিয়া বিমান॥ আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম। সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম দশ দশ শত নিরেনব্বুই সালে। মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে॥

১০৯৯ সাল (বঙ্গাব্দ) = ১৬৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দ। অতএব জব চার্ণক কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করবার আগেও যে এখানে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক বাস করতেন এবং এখানে বহুবাজার নামে পাড়া ছিল, এইসব তথ্য উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ নামে জনৈক বাঙালী কবি 'ভাষাভাগরত' নাম দিয়ে ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের বাংলা অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এর দ্বিতীয় স্কন্ধের রচনাসমাপ্তিকাল ১৬১৬ শকের তৈষ (পৌষ) মাস অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, কবির ভাষায়,

যোলশ যোড়শ শাকে তৈষ শেষ হৈতে।

জব চার্ণক ঠিক্ ঐ বছরেই কলকাতার পত্তন করেন। 'ভাষা ভাগবতে'র নবম স্কন্ধে কবি নিজের এই বংশপরিচয় দিয়েছেন,

কলিকতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ।
তাঁর পুত্র ভুবন বিদিত রামচন্দ্র॥
তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা॥
ভাষাভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা॥

সনাতন ঘোষাল যখন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভাগবতের অনুবাদ করেছেন, তখন তাঁর পিতামহ কৃষ্ণানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পরবর্তী হবেন না। কৃষ্ণানন্দ 'কলিকতা ঘোষাল বংশে' জন্মেছিলেন বলা হয়েছে। 'কলিকাতা'র নাম যুক্ত করে একটি বংশের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, এর থেকে প্রমাণ হয় 'কলিকাতা' ইংরেজদের আসবার আগেও বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং এই বিশিষ্টতা ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের আগেই সে লাভ করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আরও দুটি সূত্রের সাক্ষ্যও এই বিশিষ্টতার প্রমাণ দিচ্ছে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ফান্ ডেন্ ব্রোক্ নামে একজন পর্তুগীজ বণিক একখানি মানচিত্র এঁকেছিলেন। তাতে ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে Calcutta বন্দরের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। (বাংলার নদনদী, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ১৫, পৃঃ ২৪-২৫ দ্রষ্টব্য)।

১৬৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম দাস কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তার সূচনাতেই তিনি বলেছেন,

অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তায়।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যায়॥

আর এক জায়গায় কৃষ্ণরাম লিখেছেন,

ভাগীরথীর পূর্বতীর অপুরুব নাম
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান॥

নিমৃতা গ্রামের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও যখন কৃষ্ণরাম 'কলিকাতা'র কথাই বিশেষ করে বলেছেন, তখন কল্‌কাতা যে ঐ সময় বাংলার এক প্রধান স্থান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কলকাতায় বিদেশী বণিকেরা বাস করতেন, তার "পাথুরে প্রমাণ" আছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "বহুকাল হইল, কলিকাতার অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী শ্রীযুক্ত Mesrov J. Seth মেস্‌রোভ সেথ্‌ মহাশয় কলিকাতার আরমানী গির্জার সংযুক্ত গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধিফলকগুলির মধ্যে একখানিতে নিম্নপ্রমাণে লিপি পাঠ করেন—'এই সমাধিফলক হইতেছে, দানশীল বণিক Sukias সুকিয়াস্‌ এর পত্নী Rezabeebeh রেজা-বীবার।' ইহাতে আরমানী সন তারিখ দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়া খ্রীষ্টান বা ইংরেজী শকের ১৬৩২ অব্দ হয়।" (সা. প. প., ১৩৪৫, পৃঃ ১৩)

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কলকাতা গুরুত্বহীন জায়গা ছিল না, তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল। এবার ষোড়শ শতাব্দীর খোঁজ নেওয়া যাক্‌। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনেকগুলি পুঁথিতে ও ছাপা সংস্করণে পাচ্ছি,

> "খালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান দুইকূলে বসাইয়া বাট।
> পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥"

তারও আগে রচিত আইন-ই-আকবরীর সাক্ষ্য এসম্বন্ধে সংশয় দূর করবে। আইন-ই-আকবরী ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। তার মধ্যে আবুল ফজল সাতগাঁও সরকারের মধ্যে কলকাতা পরগণার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতার প্রাধান্য ছিল দেখা যাচ্ছে।

এর চাইতেও পুরোনো সূত্র আমরা পেয়েছি। ১৯৫৬ সালের ১৬ই এপ্রিলের হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত এই খবরটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি।

"A nine-storeyed Sikh Gurdwara, the biggest in India, is to be built in Calcutta. It will replace the present 400-year old Bara Sikh Sangat Gurdwara in Harrison Road, the oldest in Bengal, which Guru Nanak, the founder of Sikhism, visited in 1503 and where Guru Tegh Bahadur, ninth Guru of the Sikhs preached in 1666."

এই খবরটি দেখে আমি কলকাতায় গিয়ে বড়া শিখ সঙ্গতের সেক্রেটারী সর্দার নারায়ণ সিং পঞ্চের সঙ্গে দেখা করি এবং এই শিখ গুরুদ্বারের উপরে উদ্ধৃত ইতিহাসের প্রমাণপত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে জানান যে পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা গুরু নানকের জীবনীর মধ্যে ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর কলকাতায় আগমনের কথা লেখা আছে। নানক সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে করতে এইখানে এসেছিলেন। যে জায়গায় বসে তিনি বিশ্রাম ও ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সেই জায়গাটি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে গুরু তেগ্ বাহাদুর স্থানীয় এক জমিদারের কাছে কিনে নেন এবং সেখানে গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫০৩ খৃষ্টাব্দে নানক যে জায়গায় এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সেযুগে যে তার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। জায়গাটি হ্যারিসন রোড্ (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) এবং চীৎপুর রোডের মোড়ের কাছেই। প্রাচীন যুগে এই জায়গার নাম 'কলিকাতা'ই ছিল। সুনীতিবাবুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে এখনকার বীডন স্ট্রীট থেকে সুরু করে ধর্মতলা স্ট্রীট পর্যন্ত 'কলিকাতা' গ্রাম ছিল।

১৫০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে সুরু করে জব চার্ণকের আগমনের আগে পর্যন্ত যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে 'কলিকাতা'র অস্তিত্ব ও গুরুত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তখন ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে লেখা বইতে 'কলিকাতা'র উল্লেখকে প্রক্ষিপ্ত মনে করার কোন কারণ নেই। এই উল্লেখের জন্যে যাঁরা বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলকে আধুনিক মনে করেন, তাঁরা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। বিপ্রদাসের উল্লেখ থেকে প্রমাণ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই কলিকাতা বা কলকাতা একটি বিশিষ্ট জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। দেবীভাগবত থেকে জানা যায় যে, আগেকার দিনে বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত অঞ্চল কালীক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল এবং তা কাশীর মত পুণ্যতীর্থ বলে গণ্য হত। এই কালীক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থান হিসেবেই সম্ভবতঃ তখন কলকাতার এত প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্য ছিল। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে এখনকার কলকাতার উপকণ্ঠস্থিত বরাহনগর ও পাইকপাড়া যে ঐ সময়ে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তার প্রমাণ প্রাচীন চৈতন্যচরিতগ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।

'কলিকাতা' ছাড়া আরও কয়েকটি জায়গার উল্লেখ নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত জায়গার নাম যে আধুনিক, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ

তাঁরা দেখাতে পারেননি। সুতরাং এসম্বন্ধে এখানে কোনরকম আলোচনা করব না।

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের রচনাকালসূচক শ্লোকটি যে অকৃত্রিম, হোসেন শাহের উল্লেখই তার প্রমাণ। পরবর্তীকালের কোনও লোকের পক্ষে এই শ্লোকটি লেখার সাধ্য ছিল না, কারণ ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে যে হোসেন শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন, এ খবর রাখা পরবর্তীকালের লোকের পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল। সুতরাং প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে ১৪৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দেই বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করলাম।

॥ দশ ॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

বাংলা ভাষায় লেখা মহাভারতের মধ্যে পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খানী মহাভারতই প্রাচীনতম। পরাগলী মহাভারত রচিত হয় আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের আজ্ঞায়। এই মহাভারতে লেখকের ভণিতা পাওয়া যায় 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস', 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' বা শুধু 'কবীন্দ্র'। এতে মহাভারতের আঠারোটি পর্বই পাওয়া যায়। রচনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত। লেখক ব্যাস-ভারত ও জৈমিনি-ভারত উভয়কেই অনুসরণ করেছেন। ছুটি খানী মহাভারত রচিত হয়েছিল পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের আজ্ঞায়। এতে জৈমিনি-ভারত অবলম্বনে কেবলমাত্র অশ্বমেধপর্বটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে 'শ্রীকর নন্দী'র ভণিতা পাওয়া যায়।

সকলেরই ধারণা কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী পৃথক লোক। কিন্তু শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বহুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ ও ২০২৫ নং পুঁথির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন (সা. পা. প., ১৩৩৪, পৃঃ ১৬১-২১২ দ্রঃ) যে এঁরা অভিন্ন ব্যক্তি। বসন্তবাবুর প্রবন্ধ থেকে তিনটি ভণিতা উদ্ধৃত করছি।

(১) লস্কর ছুটিখান কর্ন্নসম যার দান মেদিনি মহিমা সমসর।
তাহান আদেস মাথে যুধিষ্ঠীর নরনাথে কবিন্দ্রে জে রচিল পয়ার॥

(২) একলক্ষ নব তিন শ্লোক হইল সার। কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার॥

পুস্তক কারণে নাম হৈল ধরাতল। লস্কর পরাগল গুণের সাগর॥
তাহান আদেসমাল্য মাথে আরোপীয়া। শ্রীকরনন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া॥

(৩) লস্কর জে পরাগল প্রণমিল বহুতর নাম কির্ত্তি বাঢ়ে দিনে দিনে॥
শ্রীকর যে নন্দি কবি তাহার বচন ধরি রচিলেক পাঞ্চালি প্রকার।
কুরু পাণ্ডু সংগ্রাম যুদ্ধ ছিল অনুপাম দ্রোন হইল জম অবতার॥

আমরা সকলেই জানি পরাগল খানের আজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং ছুটি খানের আজ্ঞায় শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেছিলেন। কিন্তু উদ্ধৃত

ভণিতাগুলি থেকে পাওয়া যাচ্ছে পরাগলের আজ্ঞায় শ্রীকর নন্দী এবং ছুটি খানের আজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভণিতা-টিতে একই জায়গায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে নিশ্চয়ই দুই কবির অভিন্নতা প্রমাণিত হয়। বসন্তবাবু এই জাতীয় ভণিতা আরও উদ্ধৃত করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে প্রায় সমস্ত পর্বেই 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' ও 'শ্রীকর নন্দী' ভণিতা যুগপৎ পাওয়া যায়।

এখন এই দুই মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করি। পরাগলী মহাভারতের উপক্রম থেকে জানা যায় যে, সুলতান হুসেন শাহ তাঁর সেনাপতি বা লস্কর পরাগল খানকে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। পরাগল সেখানে অনেকদিন বাস করার পরে 'কবীন্দ্র'কে মহাভারত রচনা করতে অনুরোধ জানান। তারও কিছুদিন বাদে পরাগলী মহাভারত সম্পূর্ণ হয়। সমস্ত মিলে ৭।৮ বছরের কম সময় লাগতে পারে না। হুসেন শাহ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ১৫০০ খৃষ্টাব্দের আগে পরাগলী মহাভারত রচিত হয়নি। এই মহাভারত শেষ হওয়ার সময়ও হুসেন শাহই সুলতান ছিলেন, কারণ এতে লেখা আছে,

> ভূপতি হোসেন শাহ হএ মহামতি।
> পঞ্চম গৌড়েত যার পরম যে খ্যাতি॥

অতএব ১৫০০ ও ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরাগলী মহাভারত রচিত হয়।

ছুটি খানী মহাভারতের রচনাকাল নিয়ে কিছু গোলযোগ আছে। কারণ এর মুদ্রিত সংস্করণে এই উক্তি পাওয়া যায়,

> নসরৎ সাহ তাত অতি মহারাজা। রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
> নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি। সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

এর থেকে মনে হয় এই মহাভারত রচিত হবার সময়েও হুসেন শাহই বাংলার সুলতান ছিলেন। কিন্তু উদ্ধৃত পাঠ অশুদ্ধ বলে মনে হয়। কারণ কবি হুসেন সাহকে 'নসরৎ সাহ তাত' বলে পরিচিত করতে যাবেন কেন? এর চেয়ে বসন্তবাবু কর্তৃক উদ্ধৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ নং পুঁথির পাঠ অনেক সঙ্গত,

> নসরৎ সাহ নাম অতি মহারাজা। পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা॥
> নৃপতি হুসন সাহাতনয় সুমতী। সামদান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥

এই পাঠই শুদ্ধ বলে আমাদের মনে হয়। সুতরাং ছুটি খানী মহাভারত হুসেন

শাহের পুত্র নসরৎ সাহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৫১৯-১৫৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে আমরা মনে করতে পারি।

পরাগলী মহাভারতের চেয়ে পুরোনো কোন বাংলা মহাভারতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৺দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেছিলেন এরও আগে হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ সাহের আদেশে একজন অজ্ঞাতনামা কবি একটি বাংলা মহাভারত লিখেছিলেন। কারণ তিনি কবীন্দ্রের মহাভারতের একটি পুঁথিতে এই উক্তি পেয়েছিলেন,

শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥

কিন্তু যতদূর মনে হয়, উদ্ধৃত উক্তি শ্রীকর নন্দীর মহাভারত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। শ্রীকর নন্দীর পৃষ্ঠপোষক ছুটি খানের প্রকৃত নাম ছিল নসরৎ খান (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ২২৭ দ্রঃ)। সুতরাং উদ্ধৃত উক্তি থেকে কবীন্দ্রের পূর্ববর্তী মহাভারত-রচয়িতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

পূর্ববঙ্গে 'সঞ্জয়'-ভণিতাযুক্ত একটি বাংলা মহাভারত পাওয়া যায়। ৺দীনেশচন্দ্র সেন এই 'সঞ্জয়'কে কবীন্দ্রেরও পূর্ববর্তী কবি এবং বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা মনে করেছিলেন। তাঁর একমাত্র যুক্তি এই, "যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন, একথা লিখিত হইয়াছে !......'অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর। পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জ্বল॥' প্রভৃতি কথা' পাঠ করিলে মনে হয় মহাভারতরূপ মহাভাণ্ডার বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট অনধিগম্য ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃঃ ১৪২)।

এই যুক্তির ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ 'লোক বুঝাইতে' অনুবাদ করার দোহাই বহু অর্বাচীন কবিও দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সনাতন ঘোষাল তাঁর 'ভাষা ভাগবতে' লিখেছেন,

ব্যাসের বচনে বোধ নহে সভাকারে।
এ হেতু করিতে চাই ভাষা অনুসারে॥

সুতরাং দীনেশবাবুর যুক্তি থেকে সঞ্জয়ের প্রাচীনতা প্রমাণ হয় না। দীনেশবাবু সঞ্জয়কে কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরও আগে স্থাপন করেছেন। কিন্তু কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর আগে

কোন বাংলা মহাভারত লেখা হয়নি। পরাগল খান সংস্কৃত মহাভারত শুনে পরিপূর্ণ রস উপলব্ধি করতে না পেরে কবীন্দ্রকে বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করতে অনুরোধ করেন (বা. সা. ই., ১।২, পৃঃ ২২৬ দ্রঃ)। ঐ সময়ে যদি সঞ্জয়ের মহাভারত প্রচলিত থাকত, তাহলে পরাগল এই অভাব বোধ করতেন না। সঞ্জয়ের কাব্য পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই সুপ্রচারিত দেখা যায়, সুতরাং পরাগল খানের আগেই তা রচিত হয়ে থাকলে সেই সময়ে তা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত না হবার কোন কারণ দেখা যায় না।

সঞ্জয়ের মহাভারত আসলে কবীন্দ্রের মহাভারতেরই সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ পরিবর্তিত সংস্করণ। 'সঞ্জয়' কোন কবির নামও নয়। হরিনারায়ণদেব নামে জনৈক ভরদ্বাজবংশীয় ব্রাহ্মণ 'সঞ্জয়' নামের আড়ালে নিজেকে গোপন করে এই পাঁচালী গান করতেন। একথা জানা যায় বিভিন্ন পুঁথির নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি থেকে,

হরিনারায়ণ দেব দিনহিন মতি। সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব্ব ভারতী॥
(বঙ্গীয় প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭২)

রচনা বিসেসত নানা রসমএ। হরিনারায়ণ দেব বাখানে সঞ্জএ॥ (ঐ)

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। সঞ্জএ ভারতকথা কথিলেক মর্ম্ম॥
(সা. প. প., ১৩৩৫, পৃঃ ১৪১)

ভরদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে। সঞ্জএ ভারতকথা কহে কুতুহলে॥
(ঐ, পৃঃ ১৪২)

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার। সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঁচালি প্রচার॥
(ঐ, পৃঃ ১৪২)

"সঞ্জয়" বা হরিনারায়ণদেবকে সপ্তদশ শতাব্দীর আগেকার লোক ভাবার কোন কারণ নেই। "সঞ্জয়ের মহাভারতে"র ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের আগেকার কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।

॥ এগার ॥

শ্রীচৈতন্যদেব

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের স্থান অনন্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বঙ্গ-সংস্কৃতির অন্ধকার প্রাঙ্গণ দিবালোকে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নয়। সারা ভারতেই ঐ সময় ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এক নতুন জাগরণের পর্ব এসেছিল। উত্তর ভারতের বল্লভাচার্য ও কবীর, রাজপুতানার মীরাবাই, পাঞ্জাবের নানক এবং আসামের শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সঙ্গে এক সময়েই আবির্ভূত হন। বাংলাদেশেও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ সময় বিরাট বিরাট প্রতিভার অভ্যুদয় হয়েছিল। ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনীষী রঘুনাথ শিরোমণি, স্মৃতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনীষী রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুতরাং বাংলায় ও সর্বভারতে ঐ সময় এক বিরাট জাগৃতি বা রেনেশাঁসের যুগ এসেছিল; চৈতন্যদেব সেই যুগেরই অন্যতম দান।

ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ দান বলে গণ্য করা হয়, সেগুলির ভিত্তি আগে থেকেই স্থাপিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। চৈতন্যদেবের ধর্মসম্প্রদায় মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যে কীর্তনকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত করে তিনি বাঙালীর ধর্মরাজ্যে ও ভাবরাজ্যে বিপ্লব আনেন, তাও তাঁর আগে থাকতেই ছিল; চৈতন্যভাগবতে লেখা আছে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে নবদ্বীপে দোললীলা উপলক্ষে হরিসঙ্কীর্তন হচ্ছিল। যে শ্রীরাধার মহিমাকে তিনি উচ্চে তুলে ধরেন তাঁর প্রাধান্যও জয়দেবের সময় থেকেই বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল যে বৈষ্ণব পদাবলী, তারও ভাব ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পূর্বযুগের প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুর বেশ মিল আছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন, তার ইন্ধন আগে থাকতেই সঞ্চিত হয়েছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব না এলে তা প্রচণ্ড শিখায় জ্বলত না।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেব যে আশ্চর্য যুগান্তর এনেছেন, তা বর্ণনা করা যায় না। তাঁর আগে রচিত বাংলা সাহিত্যের কটি নিদর্শনেরই বা সন্ধান মেলে! তারও মধ্যে আবার কয়েকটির মূল রূপ পাওয়া যায় না এবং বাকীগুলি খুব উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি নয়। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তীকালে শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য নয়, অন্যান্য সাহিত্যও কি বৈচিত্র্য, কি প্রাচুর্য, কি বৈশিষ্ট্য সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধির উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছেছিল। এর কারণ আমরা যা মনে করি, তা হচ্ছে এই। মুসলমানদের বাংলাদেশ জয় করার ফলে ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম সংস্কৃতির আঘাতে বাঙালীর সংস্কৃতি টলমল করছিল। প্রাচীন সংস্কৃতি তখন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে অথচ নবযুগের নতুন পরিবেশের উপযোগী সংস্কৃতি তখনও গড়ে ওঠেনি। তাই ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর হাত দিয়ে কোন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাঙালী-সংস্কৃতি যখন প্রথম আত্মস্থ হতে সুরু করল, তখন আমরা কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু প্রভৃতিকে পেলাম। কিন্তু চৈতন্যদেব ও স্মার্ত রঘুনন্দনের আবির্ভাবের ফলে হিন্দু-সংস্কৃতির স্বস্থ হওয়া সম্পূর্ণ হল। স্মার্ত রঘুনন্দন বিধিনিষেধের সুদৃঢ় দুর্গ রচনা করে এবং চৈতন্যদেব উদার জাতিভেদশূন্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে দুই দিক্ থেকে হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধ করলেন। তার ফলে বাঙালীর হাতে এর পর থেকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টিও সম্ভব হল। চৈতন্যদেব এদেশে যে দুর্বার ভাববন্যা বইয়ে দিলেন, তার প্রত্যক্ষ দান বৈষ্ণব পদাবলী।

একথা সত্য যে চৈতন্যদেবের প্রভাবে যেমন বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এসেছিল, তেমনি বল্লভাচার্য, কবীর, মীরাবাই, নানক ও শঙ্করদেব প্রভৃতি ধর্মাচার্যদের প্রভাব ঐ সময়ে তাঁদের ভাষার সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল। কিন্তু এঁরা নিজেরা সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, চৈতন্যদেব তা ছিলেন না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে চৈতন্যদেবের আশ্চর্য কৃতিত্ব আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আলো যেমন নিজে অদৃশ্য হয়েও জগতের সমস্ত পদার্থকে দৃশ্যমান করে তোলে, তেমনি চৈতন্যদেব নিজে সাহিত্য সৃষ্টি না করেও বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর নাম বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার কল্পনাই কেউ করতে পারেন না এই কারণে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম নির্ণয়প্রসঙ্গে আমরা চৈতন্যদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনারও কালক্রম নির্ণয় করার প্রয়োজন বোধ করছি। নীচে চৈতন্যদেবের

জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির যতদূর সম্ভব সঠিক সময় উল্লেখ করা হল প্রথমে ঘটনাসূচী ও পরে প্রমাণপঞ্জী দিলাম।

ঘটনাসূচী

(১) ১৪০৭ শকাব্দ, ২৩শে ফাল্গুন (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী), দোলপূর্ণিমা তিথি, শনিবার, সন্ধ্যা প্রায় ৬টার মত সময়—জন্ম।

(২) ১৪১৬ শকাব্দ, বৈশাখ, অক্ষয়তৃতীয়া তিথি (১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ, ৮ই এপ্রিল)—উপনয়ন।

(৩) (আঃ) ১৪১৯ শকাব্দ (১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ)—পিতৃবিয়োগ।

(৪) (আঃ) ১৪২৪ „ (১৫০২ „)—লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহ।

(৫) (আঃ) ১৪২৭ „ (১৫০৫ „)—অধ্যাপনা সুরু।

(৬) (আঃ) ১৪২৮ „ (১৫০৬ „)—পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ এবং লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু।

(৭) (আঃ) ১৪২৯ „ (১৫০৭ „)—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে বিবাহ।

(৮) ১৪৩০ শকাব্দ (১৫০৮ খৃষ্টাব্দ)—গয়া যাত্রা।

(৯) ১৪৩০ শকাব্দ, পৌষের শেষ (১৫০৮ খৃষ্টাব্দ, ডিসেম্বরের শেষ)—গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন।

(১০) ১৪৩০ শকাব্দ, মাঘ (১৫০৯ খৃষ্টাব্দ, জানুয়ারী)—সংকীর্তন ও ভাবপ্রকাশ আরম্ভ।

(১১) ১৪৩১ শকাব্দ, বৈশাখ (১৫০৯ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল)—অধ্যাপনা ত্যাগ।

(১২) ১৪৩১ শকাব্দ, পৌষের শেষ (১৫০৯ খৃষ্টাব্দ, ডিসেম্বরের শেষ)—সংকীর্তনাদির অবসান।

(১৩) ১৪৩১ শকাব্দ, ২৭শে মাঘ (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, ২৪শে জানুয়ারী)—গৃহত্যাগ।

(১৪) ১৪৩১ শকাব্দ, ২৯শে মাঘ (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, ২৬শে জানুয়ারী), শনিবার—সন্ন্যাসগ্রহণ।

(১৫) ১৪৩১ শকাব্দ, ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে জানুয়ারী)—নিত্যানন্দের সঙ্গে রাঢ়দেশে ভ্রমণ।

(১৬) ১৪৩১ শকাব্দ, ৪ঠা ফাল্গুন (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, ৩০শে জানুয়ারী)—শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে আগমন।

(১৭) ১৪৩১ শকাব্দ, ১০ই ফাল্গুন (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, ৫ই ফেব্রুয়ারী)—শান্তিপুরে শচীদেবীর সঙ্গে মিলন।

(১৮) ১৪৩১ শকাব্দ, ১৩ই ফাল্গুন (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, ৮ই ফেব্রুয়ারী)—শান্তিপুর ত্যাগ ও নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

(১৯) ১৪৩১ শকাব্দ, ২৮শে ফাল্গুন (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী)—নীলাচলে দোলযাত্রা দর্শন।

(২০) ১৪৩১ শকাব্দ, চৈত্র (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল)—বাসুদেব সার্ব-ভৌমের উদ্ধার।

(২১) ১৪৩২ শকাব্দ, বৈশাখ (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল)—নীলাচল থেকে দক্ষিণভারত অভিমুখে যাত্রা।

(২২) ১৪৩২ শকাব্দ, আষাঢ় (১৫১০ খৃষ্টাব্দ, জুন)—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীতি।

(২৩) ১৪৩২ শকাব্দ (১৫১০ খৃষ্টাব্দ), শরৎকাল—শ্রীরঙ্গক্ষেত্র থেকে সেতুবন্ধের দিকে যাত্রা।

(২৪) ১৪৩৩ শকাব্দ (১৫১১ খৃষ্টাব্দ), শরৎকাল—গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের গৃহে আগমন।

(২৫) ১৪৩৪ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ (১৫১২ খৃষ্টাব্দ, মে)—নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন ও আবার নীলাচল ত্যাগ করে আলালনাথ এবং সেখান থেকে গোদাবরীতীরের দিকে যাত্রা।

(২৬) ১৪৩৪ শকাব্দ (১৫১২ খৃষ্টাব্দ), হেমন্তকাল—রায় রামানন্দের সঙ্গে গোদাবরীতীর থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন।

(২৭) ১৪৩৬ শকাব্দ, আশ্বিন, বিজয়াদশমী তিথি (১৫১৪ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে সেপ্টেম্বর)—নীলাচল থেকে বাংলা অভিমুখে যাত্রা।

(২৮) ১৪৩৭ শকাব্দ, আষাঢ় (১৫১৫ খৃষ্টাব্দ, জুন)—বাংলা থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন।

(২৯) ১৪৩৭ শকাব্দ, (১৫১৫ খৃষ্টাব্দ), শরৎকাল—নীলাচল থেকে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা।

(৩০) ১৪৩৭ শকাব্দ, মাঘ মাসের প্রথম (১৫১৬ খৃষ্টাব্দ, জানুয়ারী মাসের প্রথম)—বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগে আগমন। প্রয়াগে দশদিন বাস।

(৩১) ১৪৩৭ শকাব্দ, মাঘমাসের মাঝামাঝি (১৫১৬ খৃষ্টাব্দ, জানুয়ারী)—প্রয়াগ থেকে কাশী আগমন।

(৩২) ১৪৩৭ শকাব্দ, ফাল্গুনের শেষ (১৫১৬ খৃষ্টাব্দ, মার্চ) কাশী থেকে বাংলার দিকে যাত্রা। নবদ্বীপে আগমন।

(৩৩) ১৪৩৭ শকাব্দ, চৈত্র শুক্লা দ্বাদশী তিথি—(১৫১৬ খৃষ্টাব্দ, ১৫ই মার্চ). শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে ভোজন।

(৩৪) ১৪৩৮ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ (১৫১৬ খৃষ্টাব্দ, মে)—নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ও জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন। অতঃপর আঠারো বছর নীলাচলে বাস।

(৩৫) (আঃ) ১৪৩৮ শকাব্দ (১৫১৬ খৃষ্টাব্দ)—উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎকার।

(৩৬) (আঃ) ১৪৫৩ শকাব্দ (১৫৩১ খৃষ্টাব্দ)—বিজয়নগর নিবাসী চেনাপ্পা নামক ভক্তের কাছে দুটি গ্রাম দান স্বরূপে গ্রহণ।

(৩৭) ১৪৫৫ শকাব্দ, ৩১শে আষাঢ় (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ, ২৯শে জুন)—তিরোধান।

প্রমাণপঞ্জী

(১) বিভিন্ন প্রাচীন ও প্রামাণ্য চরিতগ্রন্থগুলি চৈতন্যদেবের জন্মতিথি সম্বন্ধে একমত। তারই উপর নির্ভর করে জ্যোতিষগণনার সাহায্যে এই তারিখ স্থির করা হয়েছে। এসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। ব্রজমোহন দাসের 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপে' তারিখটি স্পষ্টভাবেই দেওয়া আছে। এসম্বন্ধে ৮ই মার্চ তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকুণ্ডলী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা আছে, নয় বছর বয়সে মহাপ্রভুর উপনয়ন হয়েছিল—"নবম বরিখ পুত্র যোগ্য সুসময়"। চূড়ামণিদাস বলেন উপনয়নের তিথি "অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শ্রীবৈশাখ মাস"। এই দুই উল্লেখের উপর নির্ভর করে এই তারিখ গণনা করা হয়েছে।

(৩)-(৭) প্রাচীন ও প্রামাণিক চরিতগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়, বাল্যবয়সে ও পঠদ্দশায় মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল, যৌবনের প্রারম্ভে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল, তারপর ক্রমান্বয়ে বাকী ঘটনাগুলি ঘটেছিল। এই সমস্ত বিবরণের উপর:নির্ভর করে এই আনুমানিক তারিখগুলি কল্পনা করা হয়েছে।

(৮)-(১৪) এই সব সময়নির্দেশ সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার লিখিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' (পৃঃ ২৩-২৭) দ্রষ্টব্য।

(১৫) সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরবর্তী রাত্রি কাটোয়ায় কাটিয়ে (চৈ. ভা., ৩।১।৩৭০) মহাপ্রভু কয়েকদিন ভাবাবেশে বিভোর হয়ে রাঢ়ে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের কাল বৃন্দাবনদাসের মতে "দিন তিন চারি" (৩।১।৩৭৫) মুরারি গুপ্ত (৩।৩।১৮), কবিকর্ণপুর (মহাকাব্য, ১১।৬১) ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের (২।৩।৩) মতে তিন দিন। অধিকাংশের মত তিন দিন, বৃন্দাবনদাসের উক্তিও তার বিরোধী নয়। সুতরাং ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন মহাপ্রভু রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। অতঃপর মহাপ্রভু গঙ্গাতীরের এক গ্রামে পৌঁছে নিত্যানন্দের সঙ্গে সে গ্রামে রাত্রিযাপন করেন। তারপর-দিন অর্থাৎ ৪ঠা ফাল্গুন সকালে তিনি শান্তিপুরে পৌঁছোন। কিন্তু নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেন। নিত্যানন্দ শচীমাতা ও ভক্তদের নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুরে নিয়ে আসেন। কয়েকদিন সকলের সঙ্গে একত্র বাস করার পরে মহাপ্রভু নীলাচলের দিকে রওনা হন।

(১৬)-(১৯) মহাপ্রভু কতদিন শান্তিপুরে ছলেন, সেসম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন দশ দিন (২।৩।১৩৩)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথাই যে বিশ্বাসযোগ্য, তা দেখাচ্ছি। নিত্যানন্দ শচীদেবীকে নিয়ে অদ্বৈতের গৃহে এলে মহাপ্রভু তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীলাচলে যান। মহাপ্রভু যদি অদ্বৈতের গৃহে এক বা তিন দিন থাকেন, তাহলে ঐটুকু সময়ের মধ্যে নিত্যানন্দের রাঢ় থেকে নবদ্বীপ যাওয়া, সেখানে বিশ্রাম করা, সেখান থেকে শচীদেবী ও সমস্ত ভক্তদের নিয়ে অদ্বৈতের গৃহে আসা এবং মার কাছ থেকে মহাপ্রভুর বিদায় নেওয়া—অতগুলি ঘটনা ঘটেছিল বলে কল্পনা করতে হয়। কিন্তু তা সম্ভব বলে মনে হয় না। অতএব মহাপ্রভু দশদিন শান্তিপুরে ছিলেন বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

কবিকর্ণপুর বলেন শচীদেবী শান্তিপুরে এসে পৌঁছোনোর পরে মহাপ্রভু তিন দিন শান্তিপুরে ছিলেন (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৬।৫)। কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির সামঞ্জস্য করতে হলে বলতে হয় শচীদেবীর আসার সাতদিন আগেই মহাপ্রভু শান্তিপুরে এসে পৌঁছেছিলেন। নিত্যানন্দ রাঢ় থেকে ফিরে নবদ্বীপে মাত্র একদিন থেকে পরদিন শচীদেবীকে নিয়ে শান্তিপুরে রওনা হন (মুরারি, ৩।৪।৭)। তাহলে কি রাঢ়দেশ থেকে নবদ্বীপে আসতে নিত্যানন্দের ছদিন লেগেছিল? আমার মনে হয় তা লাগা অসম্ভব নয়। নিত্যানন্দ হয়তো সরাসরি নবদ্বীপে আসেননি, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মহাপ্রভুর

ভক্তদের খবর দিয়ে তারপর এসেছেন। মহাপ্রভু বাংলাদেশ থেকে চলে যাচ্ছেন, তাঁর বিদায়ের সময় সমস্ত ভক্তকে একত্র সমবেত করার প্রচেষ্টাই নিত্যানন্দের পক্ষে স্বাভাবিক। এই হিসাবে নিত্যানন্দ ৪ঠা ফাল্গুন রাঢ়দেশ থেকে রওনা হয়ে ১০ই ফাল্গুন তারিখে নবদ্বীপে পৌছেছিলেন। বৃন্দাবনদাসের উক্তি থেকে এই সময়নির্ধারণের সমর্থন পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস। সে দিবস অবধি আইর উপবাস॥
দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোজন। চৈতন্য প্রভাবে সবে আছয়ে জীবন॥

তাহলে চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের দিন থেকে ঐ দিন দ্বাদশ দিবস। চৈতন্যদেব যে ২৭শে তারিখে গৃহত্যাগ করেন, সে কথা বৃন্দাবনদাসের উক্তি থেকেই পাওয়া যায়। ২৭শে মাঘ থেকে ১০ই ফাল্গুন দ্বাদশ দিবসই হয়। সুতরাং কৃষ্ণদাসের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হল। অতএব মহাপ্রভু ১৩ই ফাল্গুন অবধি শান্তিপুরে বাস করে ১৪ই ফাল্গুন তারিখে সকাল বেলায় নীলাচলে রওনা হয়েছিলেন। ফাল্গুনের শেষে নীলাচলে পৌছে তিনি দোলযাত্রা দেখেছিলেন বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন (২।৭।৩-৪)। ১৪৩১ শকের ৩১শে ফাল্গুন তারিখে দোলযাত্রা হয়েছিল। সে সময় সোজা পথে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে যেতে আট নয়দিনের বেশী লাগত বলে মনে হয় না। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায় যে রঘুনাথদাস বারো দিনে সপ্তগ্রাম থেকে নীলাচলে গিয়েছিলেন, তাও আবার ঘুর পথে এবং তার মধ্যে প্রথমদিন ধরা পড়ার ভয়ে অন্য দিকে চলে নষ্ট করেছিলেন। সুতরাং ১৪ই ফাল্গুন তারিখে শান্তিপুর থেকে রওনা হয়ে মহাপ্রভু ২২শে বা ২৩শে ফাল্গুন নাগাদ্ নীলাচলে পৌছেছিলেন এবং ২৯শে ফাল্গুন তারিখে দোলযাত্রা দর্শন করেছিলেন।

চৈতন্যদেব তাঁর জননীর অনুরোধে অন্য তীর্থস্থানে বাস না করে নীলাচলে বাস করেন বলে চরিতগ্রন্থগুলিতে উক্ত হয়েছে। আমাদের মনে হয়, তাছাড়া নীলাচল হিন্দু রাজার অধিকারভুক্ত ছিল বলে চৈতন্যদেব ধর্মচর্চার নিরাপদ স্থান হিসাবে নীলাচলকে পছন্দ করেছিলেন।

(২২)-(২৪) এই ঘটনাগুলির কালক্রম কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য অবলম্বনে প্রস্তুত করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে মহাপ্রভুর কতদিন লেগেছিল, সে সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, "দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল" (২।১৬।৮৩)। কবিকর্ণপুর লিখেছেন, নীলাচল থেকে যাত্রা করে প্রভু চাতুর্মাস্যের আগেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌছোন, সেখানে ত্রিমল্ল

ভট্টের গৃহে চাতুর্মাস্য যাপন করে শরৎকাল উপস্থিত হলে (১৩।৬) সেতুবন্ধের দিকে রওনা হন। তারপর আবার "জলদাগমান্তে", অর্থাৎ বর্ষার অবসানে (স্পষ্টতঃ এক বছর পরে) সেখান থেকে ফিরে গোদাবরীতীরে রামানন্দের আলয়ে এসে উপস্থিত হন। সেখানে রামানন্দের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করে অনেক দিন কাটিয়ে (১৩।৪৯) নীলাচলে যখন ফিরে আসেন, তখন জগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রার সময় অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস। এখানেও সবশুদ্ধ দু' বছরের হিসাব পাওয়া গেল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। এরপর কবিকর্ণপুর বলেছেন যে, দক্ষিণভারত থেকে নীলাচলে ফিরে শ্রীচৈতন্যদেব স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথ দর্শন করলেন, কিন্তু তারপর দিন তাঁর দেখা না পেয়ে দুঃখে 'কৃতবাষ্পমোক্ষ' হয়ে আলালনাথে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে তিনি গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের কাছে আবার গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রিয়কথায় চাতুর্মাস্য এবং আরও কয়েকমাস যাপন করলেন (নিনায় মাসাংশ্চতুরোঽপরাংশ্চ)। তারপর হেমন্তকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে একসঙ্গে তিনি নীলাচলে ফিরে এলেন (১৩।৬১)।

কবিকর্ণপুরের কথা মানলে বলতে হয়, মহাপ্রভু ১৪৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণভারত থেকে নীলাচলে ফিরে সেখানে মাত্র স্নানযাত্রার সময়টুকু থেকে আবার গোদাবরীতীরে ফিরে যান এবং ১৪৩৪ শকের কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু একথা কবিকর্ণপুর ভিন্ন অন্য কোন চরিতকার বলেননি, তাই এর সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার দরকার আছে। আসলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'তেই এর সমর্থন আছে। নীলাচলে যেবার প্রভু প্রথম রথযাত্রাদর্শন করলেন, সেবার গৌড় থেকে ভক্তেরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। কৃষ্ণদাস তার বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন,

> প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ। প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন॥
> রথযাত্রা দেখি তাহাঁ রহিলা চারিমাস। প্রভু-সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস॥
> বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সভারে। প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥
> প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥
> বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি। অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥

এর থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রথমবার রথযাত্রার সময় চৈতন্যদেবকে দেখার পরে ভক্তেরা বিশ বছর প্রভুকে দেখবার জন্যে নীলাচলে আসাযাওয়া করেছিলেন। অর্থাৎ রথের সময় ভক্তদের সঙ্গে প্রথমবার নীলাচলে মিলনের পর চৈতন্যদেব আরও বিশ বছর জীবিত ছিলেন।

এখন, ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকের রথযাত্রার সময় চৈতন্যদেব দক্ষিণভারতে ছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই। ১৪৩৪ শকেও তিনি রথযাত্রার সময় নীলাচলে ছিলেন না, একথা কবিকর্ণপূর বলেছেন। তা যদি হয়, তাহলে ১৪৩৫ শকে চৈতন্যদেব সর্বপ্রথম নীলাচলে রথযাত্রা দর্শন করেন এবং ভক্তেরাও সকালে তাঁকে দেখবার জন্যে ঐ বছরেই প্রথম আসেন। এর পরে চৈতন্যদেব ঠিক্ বিশ বছরই বেঁচে ছিলেন, কারণ ১৪৫৫ শকে রথযাত্রার কয়েকদিন পরে তাঁর তিরোধান হয়। কবিকর্ণপূরের কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে বলতে হবে ১৪৩৪ শকে চৈতন্যদেব প্রথম নীলাচলে রথযাত্রা দর্শন করেন, কিন্তু তাহলে কৃষ্ণদাসের "বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি" উক্তি মিথ্যা হয়ে যায়। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, দক্ষিণভারত থেকে নীলাচলে ফিরে কয়েকদিন বাদেই প্রভু আবার গোদাবরীতীরে রামানন্দের কাছে চলে যান এবং ৫।৬ মাস সেখানে থাকেন, কবিকর্ণপূরের এই কথা সত্যি এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করলেও তাঁর সময়নির্দেশ এই কথাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছে। কবিকর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যের অন্ততঃ তিন জায়গায় (২০।৪০, ১৮।৬১, ১৮।৬৩) বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব বিশ বছর ধরে নীলাচলের সমস্ত উৎসব দর্শন ও তাতে যোগদান করেছেন। এখানে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৪৩৪ শকের হেমন্তকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী বিশ বছরের কথাই তিনি বলেছেন। কারণ এই বিশ বছরের আগে মহাপ্রভু নীলাচলের মাত্র দুটি উৎসব—১৪৩১ শকের দোলযাত্রা ও ১৪৩৪ শকের স্নানযাত্রা দেখেছেন এবং এই বিশ বছরের মধ্যে মাত্র দু একটি উৎসবের সময় তিনি নীলাচলে থাকেননি।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। "চৈতন্যচরিতামৃতে'র "বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি" উক্তি থেকে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মনে করেছেন, ভক্তেরা বিশবার রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে বারের কোন কথা বলা হয়নি, বিশ বছর ধরে যে এই যাওয়া-আসা চলেছিল, সেই কথাই বলা হয়েছে। এই বিশ বছরের মধ্যে যে ভক্তেরা অন্ততঃ দুবার নীলাচলে যান নি, তা চরিতামৃতের মধ্য-লীলার ১৬শ অধ্যায়ের ২৪৫শ শ্লোক এবং অন্ত্যলীলার ২য় অধ্যায়ের ৩৬-৪৪শ শ্লোক থেকে জানা যায়।

(২৭) কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে দক্ষিণভারত থেকে ফেরার

পরে প্রভু বৃন্দাবন যেতে চাইলেন, কিন্তু ভক্তেরা নানা অছিলা করে তাঁকে দু' বছর আটকে রাখলেন। অবশেষে সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরের বিজয়াদশমীতে প্রভু গৌড় হয়ে বৃন্দাবনে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে নীলাচল থেকে রওনা হলেন (২।১৬।৯৩)। সেবারে অবশ্য প্রভু গৌড় পরিভ্রমণ করেই ফিরে আসতে বাধ্য হন।

কবিকর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যের উনবিংশ সর্গে এ সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু লিখেছেন,

> দক্ষিণাদাগতো যাবত্তাবত্তত্র মহাপ্রভুঃ
> মথুরায়াং চলত্যেব রামানন্দোঽত্র বাধতে॥
> চাতুর্মাস্যান্তরে নাথং কর্হিচিদ্গামনোত্থতং।
> উবাচ বহুদুঃখেন শ্রীরামানন্দরায়কং॥ (৩-৪ শ্লোক)

এর থেকে জানা যায়, দক্ষিণভারত থেকে ফেরার পরে কোন এক চাতুর্মাস্যের পরে মহাপ্রভু মথুরার দিকে যাত্রা করেছিলেন। অবশ্য সেবার গৌড় অবধি গিয়েই প্রভু ফিরে আসেন। দক্ষিণভারত থেকে ফেরার কত পরে এই যাত্রা, তা কবিকর্ণপূর বলেননি, কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর দুই ভ্রমণের বর্ণনার মাঝখানে ছটি সর্গ জুড়ে তাঁর পুরীতে বিভিন্ন উৎসব দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং দক্ষিণভারত থেকে প্রত্যাবর্তন ও গৌড় অভিমুখে যাত্রার মাঝখানে যে প্রভু দীর্ঘ একটা সময় পুরীর বিভিন্ন উৎসব দেখে কাটিয়েছেন, কবিকর্ণপূর পরোক্ষে তাই বলেছেন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। সুতরাং কৃষ্ণদাসের উক্তির সঙ্গে তাঁর উক্তির কোন বিরোধ হচ্ছে না। মহাপ্রভু বিজয়াদশমীর দিনে যাত্রা করেছিলেন, এই কথা কবিকর্ণপূরও বলেছেন। কৃষ্ণদাস স্বরূপ-দামোদরের কড়চা অবলম্বন করে মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্ত্যলীলা লিখেছেন; স্বরূপ দামোদর মধ্য ও অন্ত্যলীলার সময় প্রায় আগাগোড়া নীলাচলে ছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভুর জীবনের এই অধ্যায়ের কালক্রম সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের উক্তি নির্ভরযোগ্য। অতএব সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষের অর্থাৎ ১৪৩৬ শকের বিজয়াদশমীর দিনে প্রভু নীলাচল থেকে গৌড়ের দিকে যাত্রা করেছিলেন বলে স্থির করা যায়।

(২৮) নীলাচল থেকে প্রভু প্রথমে কুলিয়াগ্রামে আসেন, সেখানে কয়েকদিন থেকে প্রভু সেখান থেকে রামকেলিগ্রামে যান, কিন্তু তারপর আর তাঁর যাওয়া হয়নি। রামকেলিগ্রাম থেকে প্রভু শান্তিপুরে আসেন, সেখান থেকে কুমারহট্ট, পানিহাটি, বরাহনগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে

নীলাচলে ফিরে যান। ইতিমধ্যে আবার বর্ষা এসে গিয়েছিল। কারণ ভক্তেরা প্রভুকে বললেন.

এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারিমাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥

সুতরাং মহাপ্রভুর গৌড় পরিভ্রমণে ৮।৯ মাসের মত সময় লেগেছিল এবং ১৪৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে তিনি পুরীতে ফিরেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

(২৯)-(৩১) এই ঘটনাগুলির কালক্রম 'চৈতন্যচরিতামৃত' অবলম্বনে রচিত। এর থেকে জানা যায় যে বাংলা থেকে ফেরার অব্যবহিত পরবর্তী শরৎকালে প্রভু নীলাচল থেকে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হন। কিন্তু "লোকের সঙ্ঘট্ট নিমন্ত্রণের জঞ্জাল" এবং "নিরন্তর আবেশ" এর জন্যে প্রভু বেশীদিন বৃন্দাবনে থাকতে পারেননি। অল্প সময়ের মধ্যে সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে প্রভু মাঘ মাসের প্রথম দিকে প্রয়াগের দিকে যাত্রা করেন (২।১৮।১৩৫)। প্রয়াগে তিনি দশদিন ছিলেন এবং সেখানে মকরস্নান করেন। এই সময় তিনি শ্রীরূপকে শিক্ষা দেন। তারপর কাশীতে আসেন এবং সেখানে তিনি দুমাস ধরে সনাতনকে শিক্ষা দেন।

(৩২)-(৩৩) চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং লীলার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রম চতুর্দশ অধ্যায়ে লিখেছেন যে. কাশী থেকে মহাপ্রভু নীলাচলের দিকেই রওনা হন, কিন্তু সরাসরি নীলাচলে না গিয়ে দেশে এসে সকলের সঙ্গে দেখা করে যান। কাশী থেকে মহাপ্রভু কুলিয়ায় আসেন, সেখান থেকে নবদ্বীপে এসে মার চরণবন্দনা করেন এবং সমস্ত ভক্তের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর অদ্বৈতের বাড়ীতে যান। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে অদ্বৈত মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দকে ভোজন করান। মুরারি গুপ্তের এই কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই; এই অংশ প্রক্ষিপ্তও নয় কারণ লোচনদাস এই অংশের অনুবাদ করেছেন। সমসাময়িক পদকর্তা বাসু ঘোষ গৌরাঙ্গের নদীয়ায় আগমন নিয়ে একটি পদ লিখেছেন। চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীর আগেই মহাপ্রভু নবদ্বীপে এসেছিলেন। সুতরাং চৈত্র মাসের একেবারে প্রথমে তিনি কাশী থেকে রওনা হয়েছিলেন ধরা যেতে পারে। কৃষ্ণদাস মোটামুটি দুমাস ধরে সনাতনকে শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন, তা যে পুরো দুমাস হতে পারেনা, তা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

(৩৪) মুরারি গুপ্ত গৌড় থেকে মহাপ্রভুর নীলাচলে ফেরার কথা লেখবার (৪।১৫) পরেই গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে গমন (৪।১৭) ও মহাপ্রভুর স্নানযাত্রা দর্শনের বর্ণনা (৪।২০) দিয়েছেন। সুতরাং ১৪৩৮ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের আগেই মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরেছিলেন বলা যেতে পারে।

প্রভুর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর্ব যে ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল, সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥

তিনি যে ঠিক ছ' বছর ভ্রমণেরই হিসাব দিয়েছেন, তা উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অযথা মন্তব্য করেছেন, "কালের পরিমাপ-হিসাবে না ধরিয়া শক-হিসাবে ধরিলে কবিরাজ গোস্বামীর ছয় বৎসর গমনাগমন বলার একটা মানে বাহির করা যায়।" কিন্তু কৃষ্ণদাস ঠিকই হিসাব দিয়েছেন। ডঃ মজুমদার নিজেই হিসাবে ভুল করেছেন। তিনি এর ঠিক পরেই লিখেছেন "১৪৩৫ শকে সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে (চৈ. চ, ২।১৬।৮৫) বিজয়া দশমীর পর গৌড়ে যাত্রা (ঐ, ২।১৬।৯৩)।" মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের মাঘসংক্রান্তির দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষ ১৪৩৫ শকের মাঘসংক্রান্তি থেকে ১৪৩৬ শকের মাঘসংক্রান্তি। অতএব ঐ বর্ষের বিজয়াদশমী ১৪৩৬ শকে পড়বে, ১৪৩৫ শকে নয়।

কবিকর্ণপুর বিখেছেন,

চতুর্বিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ
প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত-নবদ্বীপ-তলতঃ॥
ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যন্নগময়-
তথা দৃষ্ট্বা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ॥

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব চতুর্বিংশ বৎসরে নিজের প্রেমপ্রকটন করে বিবশ হয়ে নবদ্বীপ থেকেই সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ক্ষেত্র থেকে ইতস্ততঃ গমনাগমনে তিন বছর যাপন করে সমস্ত যাত্রা (উৎসব) দর্শন করে অখিল বিংশতি বৎসর যাপন করেছিলেন।

ডঃ মজুমদার কবিকর্ণপূরের এই উক্তির সঙ্গে "কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির ঘোরতর বিরোধ" দেখেছেন এবং কষ্টকল্পনার মধ্য দিয়ে দুই উক্তির সামঞ্জস্য করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে, কবিকর্ণপুর ইতস্তত গমনাগমন বলতে দক্ষিণভারতের গমনাগমনের কথা বুঝিয়েছেন।

কবিকর্ণপূর নিজেই বলেছেন যে মহাপ্রভু দু' বছর ধরে দক্ষিণভারত ভ্রমণ করেন, তারপর অল্প সময়ের জন্য নীলাচলে ফিরে আসেন, তারপর আবার গোদাবরীতীরে রামানন্দের কাছে গিয়ে কয়েকমাস অতিবাহিত করেন। এই দু' বছর কয়েকমাস সময়কেই কবিকর্ণপূর তিন বছর ধরেছেন। তিনি এই ভ্রমণের বর্ণনা দেবার পরেই লিখেছেন,

ইত্থং শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিতবতি প্রত্যাসমাসীদ্ধ্বনিঃ
সর্ব্বাসাং বিদিশাং দিশাঞ্চ জনতাসোৎকণ্ঠমেবাগতা।

(এইরূপে তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিত হলে প্রতিদিকে ধ্বনি অর্থাৎ শব্দ হওয়ায় সমস্ত দিগ্বিদিকের লোক সকল অত্যুৎকণ্ঠায় সমাগত হল।)

এর পর মহাপ্রভু বিশ বছর ও কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। এই বিশ বছর সময়কেই কবিকর্ণপূর নীলাচলে অবস্থানকাল ধরে নিয়েছেন। মহাপ্রভুর গৌড় ও বৃন্দাবনে গমন যে এই বিশ বছরেরই অন্তর্গত, তা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন,

ইত্থং শ্রীপুরুষোত্তমে বিহরণং কৃত্বা শচীনন্দনো
হর্ষাদ্বিংশতিবৎসরেণ বিহিতক্রীড়ো বর্ভৌ নির্ভরং।
এতন্মধ্যমধিপ্রয়াণকুতুকাদাগত্য ভাগীরথী-
তীরে শ্রীমথুরামলঙ্কৃতিমতিং কর্ত্তুং স বিক্রীড়তি॥ (১৮।৬৩)

গৌড় ও মথুরা-বৃন্দাবন পরিভ্রমণে বেশী সময় লাগেনি বলেই কবিকর্ণপূর এই ভ্রমণকে নীলাচলে অবস্থানের পর্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দুই ভ্রমণের পরবর্তী অংশকেই প্রকৃত নীলাচলে অবস্থানপর্ব বলে ধরেছেন। সুতরাং কবিকর্ণপূরের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, হিসাবের পার্থক্য নয়।

(৩৫) চৈতন্যদেবের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের প্রথম মিলনের সময় নিয়ে চরিতকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। জয়ানন্দ ও উড়িয়া চরিতকার ঈশ্বরদাস বলেন, চৈতন্যদেব প্রথমবার নীলাচলে গিয়েই প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে দেখা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন মহাপ্রভু দক্ষিণভারত থেকে ফেরবার পরে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারি গুপ্ত তাঁর গ্রন্থের ৪র্থ প্রক্রম ১৬শ সর্গে লিখেছেন, প্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণ করে নীলাচলে ফিরলে প্রতাপরুদ্র প্রথম তাঁর দর্শন পান। সমসাময়িক চরিতকারের কথাই এক্ষেত্রে সত্য বলে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য।

(৩৬) এই তথ্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত একখানি তাম্রশাসন থেকে আবিষ্কার করেছেন। তাম্রশাসনটির যে ইংরেজী অনুবাদ তিনি দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করছি, "When the Mahamandalesvara Virapratapa Vira Achyuta Deva Maharaja was ruling the kingdom of the world, Chennapa, son of Rayapa Vodeyar, the Mahaprabhu of Sigalnadu granted to our holy guru, Chaitanyadeva, the two villages of the Annigehalli sthala as a guttiage." অচ্যুত দেব ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ১৫৩০ থেকে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই দান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "মহাপ্রভু লীলা-সম্বরণের তিন বৎসর পূর্ব্বে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।" একথা আদৌ যুক্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে না।

(৩৭) চৈতন্যদেবের মৃত্যুর তারিখটি কেবলমাত্র লোচন দাস ও জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। লোচনদাস লিখেছেন,

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে ॥

... ...

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥

জ্যোতিষগণনা করে দেখা গেছে, আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি রবিবারে পড়েছিল। জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে শুক্লা সপ্তমী তিথিই বলেছেন,

আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি। রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী ॥

জ্যোতিষগণনার ফলে দেখা গেছে ১৪৫৫ শকের শুক্লা আষাঢ় সপ্তমীর তারিখ ৩১শে আষাঢ়। ঐদিনের ইংরেজী তারিখ ২৯শে জুন. ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। লোচনদাস তিথির সঙ্গে বারের উল্লেখ করায় এই তারিখের অভ্রান্ততা প্রমাণ হচ্ছে।

॥ বার ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দ

রাজা সর্বেশ্বর হলেও অমাত্যদের সাহায্য ছাড়া রাজ্য শাসন করতে পারেন না। তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকররা না থাকলে বঙ্গ-সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হত না। তাঁদের সাধনা ও প্রচার চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মকে এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বাংলা সাহিত্যেও তার প্রভাব তাই সুদূরপ্রসারী হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে এই সমস্ত চৈতন্য-পরিকরদের মধ্যে কয়েকজনের জীবৎকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা তাই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অদ্বৈত

চৈতন্যদেবের প্রধান পরিকরদের মধ্যে গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ও রূপসনাতন প্রভৃতি প্রথমে ছিলেন গৃহী, পরে হলেন সন্ন্যাসী। নিত্যানন্দ প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে গৃহী হন। অদ্বৈত চিরদিনই গৃহী থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনদিন সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ না করেও অদ্বৈতই সবচেয়ে বেশীদিন ধরে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের শিখা জ্বালিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব যেমন বৈষ্ণব ধর্মের আকাশে সূর্য, অদ্বৈত তেমনি শুকতারা। চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থাকতেই অদ্বৈত বৈষ্ণব ধর্মের পতাকা উড়িয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের জন্মের আগেকার নবদ্বীপের বর্ণনা দেবার সময় লিখেছেন,

> অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য ॥
> এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়। ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥

অদ্বৈত শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। অদ্বৈতের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে প্রামাণিক চরিতগ্রন্থগুলি থেকে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল

প্রভৃতির মধ্যে যেসব কথা পাওয়া যায়, তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ বিশেষজ্ঞেরা এইসব বইকে জাল বলে প্রমাণ করেছেন।

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশের মতে অদ্বৈত চৈতন্যদেবের জন্মের ৫২ বছর আগে অর্থাৎ ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন এবং ১২৫ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বলা বাহুল্য এইসব কথার কোন মূল্য নেই। আমরা প্রামাণিক সূত্রের সাহায্যে নতুনভাবে অদ্বৈতের জীবৎকাল স্থির করার চেষ্টা করব।

সন্ন্যাসের অব্যবহিত আগে অর্থাৎ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে যখন চৈতন্যদেব নবদ্বীপে লীলা করছিলেন, তখন তিনি একদিন অদ্বৈতকে জ্ঞানবাদ প্রচারের জন্যে শাস্তি দিতে শান্তিপুরে আসেন। বৃন্দাবনদাসের মতে সেই সময় অদ্বৈতের পত্নী সীতা চৈতন্যদেবকে বলেছিলেন,

বুঢ়া বিপ্র বুঢ়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ। কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ॥

৫০ বছরের কম বয়সী লোককে লোকে 'বুঢ়া বিপ্র' বলে না। সুতরাং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতের বয়স ৫০ বছরের কম ছিল না।

কিন্তু ৫০ বছরের বেশীও ছিল না। কারণ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতের বয়স মাত্র পাঁচ বছর ছিল। ঐ বছরে চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বাংলায় এসে অদ্বৈতের বাড়ীতে যান। এই প্রসঙ্গের বর্ণনা দেবার সময় বৃন্দাবনদাস অচ্যুত সম্বন্ধে লিখেছেন,

পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর। খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥

এই উক্তির সঙ্গে অচ্যুত সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতের অন্যান্য অংশের উক্তির সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং ১৫১৪ — ৫ = ১৫০৯ খৃষ্টাব্দেই অচ্যুতের জন্ম হয়েছিল সন্দেহ নেই। অচ্যুত সম্ভবতঃ অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কারণ চৈতন্যচরিতামৃতে ও অন্যত্র অদ্বৈত-পুত্রদের নামের তালিকায় প্রথমেই অচ্যুতের নাম পাওয়া যায়। যাহোক্ জ্যেষ্ঠ পুত্র হোক্ বা না হোক্, অচ্যুতের জন্মের সময় অদ্বৈতের বয়স ৫০ এর বেশী হবার কথা নয়। সুতরাং অদ্বৈত ১৪৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। চৈতন্যদেবের জন্মের সময় অদ্বৈতের বয়স ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে ছিল বলে মনে হয়।

অদ্বৈত চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনার সময়ও অদ্বৈত জীবিত ছিলেন বলে মনে

হয়। অদ্বৈতের তিরোধানের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাচ্ছি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে। জয়ানন্দ লিখেছেন,

পৌষ মাসে শুক্লা একাদশী তিথি হৈলা। আচার্য্য গোসাঞি বৈকুণ্ঠে গমন করিলা॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় আমরা দেখাব যে, ঐ গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতম সীমা ১৫৬০ খৃঃ। সুতরাং অদ্বৈত ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দের আগেই দেহরক্ষা করেছিলেন বলে স্থির করা যায়।

হরিদাস

হরিদাস প্রথমে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে হরিভক্তির উদয় হওয়ায় তিনি চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ে যোগ দেন। কিন্তু তিনি মুসলমানের সন্তান কিনা, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। জয়ানন্দ লিখেছেন, তাঁর বাপ-মা হিন্দু ছিলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে মনোহর ও উজ্জ্বলা। অল্পবয়সে তাঁদের মৃত্যু ঘটলে হরিদাস মুসলমানের ঘরে লালিতপালিত হন।

চরিতামৃতে লেখা আছে, চৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছু আগে হরিদাসের তিরোভাব হয়। মৃত্যুকালে তিনি এত বৃদ্ধ হয়েছিলেন যে দৈনিক বহুবার হরিনাম করতে পারতেন না। সুতরাং আনুমানিক ১৪৫০-১৫৩০ খৃঃ হরিদাসের জীবৎকাল ধরতে পারি।

নিত্যানন্দ

চৈতন্য-সম্প্রদায়ে চৈতন্যদেবের পরেই নিত্যানন্দের স্থান। নিত্যানন্দের মহিমা ও প্রভাব অলোকসামান্য। কিন্তু নিত্যানন্দের জীবন সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্যই আমাদের অজানা। তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে তাঁর শিষ্য বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত হলেও সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু নিত্যানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট হয়নি। সেগুলি এই :—

(ক) শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে নিত্যানন্দ তাঁর সঙ্গে নীলাচলে যান। কিন্তু কয়েক বছর বাদেই আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন কেন? চরিত-গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে শ্রীচৈতন্যদেবই তাঁকে ধর্মপ্রচারের জন্যে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন এমন আকস্মিক যে আমাদের মন চরিতগ্রন্থগুলির কথায় সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করতে পারে না।

(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে প্রামাণিকভাবে জানা যায় যে, নিত্যানন্দ দুবার বিবাহ করেছিলেন,

সূর্য্যদাস নন্দিনী শ্রীবসু জাহ্নবী। পাণিগ্রহণ করিলেন স্বচ্ছন্দ কৌতুকী ॥

ভক্তিরত্নাকরেও এই কথা আছে। পরিণত বয়সে নিত্যানন্দের সন্ন্যাসধর্ম পরিত্যাগ ও কৌমার্যভঙ্গের কারণ কি? কারও কারও মতে শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞাতেই নিত্যানন্দ বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু এই কথার যাথার্থ্যেও আমাদের প্রবল সংশয় আছে।

(গ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত (অন্ত্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়) এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (সাহিত্যপরিষৎ সং, পৃঃ ১৪৪) থেকে জানা যায় যে নিত্যানন্দ নীলাচল থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের পরে সর্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নালঙ্কার পরতেন। বৈষ্ণবদের অনাড়ম্বর নিষ্কিঞ্চন জীবনযাত্রার সঙ্গে এ ব্যাপার একদম খাপ খায় না। নিত্যানন্দের এই রুচিপরিবর্তনের কারণ কি?

(ঘ) বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের স্ত্রী বসুধা ও জাহ্নবী, পুত্র বীরভদ্র ও রামভদ্র, কন্যা গঙ্গার কোন উল্লেখ করেননি কেন? তৎকালীন জনসাধারণ নিত্যানন্দের বিবাহ সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না বলেই কি? বৃন্দাবনদাসের অনুগামী লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজও নিত্যানন্দের বিবাহপ্রসঙ্গের কোন উল্লেখ করেননি।

(ঙ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনার সময় বাংলাদেশে নিত্যানন্দের প্রবল বিরোধী একদল লোক ছিল (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ১৮৯ দ্রষ্টব্য)। এঁদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা করতেন,

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়। নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পালায় ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাইও শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্তি করতেন, নিত্যানন্দকে করতেন না। নিত্যানন্দের এই প্রবল বিরোধীদল ছিল বলেই চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসকে বারবার নিত্যানন্দের মহিমাকীর্তন করতে হয়েছে। চৈতন্য-দেবের প্রিয়তম সহচর বলে পরিচিত নিত্যানন্দের এরকম বিরোধীদল সৃষ্ট হবার কারণ কি? নিত্যানন্দের নীলাচল থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন, অলঙ্কারধারণ, বিবাহ, পুত্রকন্যার জন্ম—প্রভৃতির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই ত? চরিতগ্রন্থ-গুলি থেকে এসম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি বিশিষ্ট চরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে অধিকাংশই নিত্যানন্দের দলের লোকের লেখা। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য, জয়ানন্দ নিত্যানন্দের পুত্র

বীরভদ্রের শিষ্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বপ্নে নিত্যানন্দের কৃপা পেয়েছিলেন; প্রেমবিলাস-রচয়িতার নামই নিত্যানন্দদাস, তাছাড়া তিনি নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। নিত্যানন্দের প্রতিকূলে যেতে পারে, এমন বিষয়গুলিকে এঁরা ইচ্ছা করেই তাঁদের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেননি বলে মনে করা যায়।

নিত্যানন্দের নাম ধাম ও বংশপরিচয় সম্বন্ধে যা জানতে পারা যায় তা এই। নিত্যানন্দের বাড়ী ছিল রাঢ়ের বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচাকা গ্রামে। এঁর পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা ও চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয় থেকে জানা যায়, হাড়াই পণ্ডিতের প্রকৃত নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। মুকুন্দ বা হাড়াই পণ্ডিতের নিত্যানন্দ ছাড়াও আরও ছেলে ছিল, কারণ বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, "সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়" (মধ্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়)। ভক্তিরত্নাকরের একাদশ তরঙ্গেও নিত্যানন্দের ছোট ভাইএর উল্লেখ আছে। লোচনদাস লিখেছেন, নিত্যানন্দের পূর্ব নাম 'কুবের'। এ কথা সত্য বলে মনে হয়। বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ নিত্যানন্দকে কয়েক জায়গায় 'অনন্ত' বলেছেন। সেখানে তাঁরা নিত্যানন্দকে 'অনন্ত' তত্ত্বরূপে উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়, নিত্যানন্দ বার বছর বয়সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন।—

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে। নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর। তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর॥

নিত্যানন্দ সম্বন্ধে তাঁর প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবন দাসের এই বিবৃতি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। এর থেকে জানা যাচ্ছে, ১২ বছর বয়সে নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করে তীর্থপর্যটনে বেরোন এবং তারও ২০ বছর বাদে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। তখন চৈতন্যদেব গয়া থেকে ফিরে নবদ্বীপে লীলা-কীর্তন সুরু করেছেন। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে নিত্যানন্দের বয়স ছিল ৩২ বছর। সুতরাং ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়।

নবদ্বীপ ছেড়ে মহাপ্রভু যখন নীলাচলে যান, তখন নিত্যানন্দ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তারপর মহাপ্রভু বাংলায় বৈষ্ণবধর্মপ্রচারে নেতৃত্ব করবার জন্য নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠিয়ে দেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণভারত থেকে ফিরে আসবার পরে রথযাত্রা উপলক্ষে যখন ভক্তেরা নীলাচলে আসেন, তখনই মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে

গৌড়ে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর কথা বিশ্বাস করা চলে না। কারণ দক্ষিণভারত থেকে ফেরার পরে মহাপ্রভু গৌড়ে যান। গৌড় থেকে নীলাচলে ফেরার পরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠান, একথা বৃন্দাবনদাস বলেছেন (২।১৫)। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য এবং নিত্যানন্দের কাছেই তথ্য সংগ্রহ করে 'চৈতন্যভাগবত' লিখেছেন। কাজেই তাঁর উক্তি কৃষ্ণদাসের চেয়ে প্রামাণিক। বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর বৃন্দাবনভ্রমণের বর্ণনা দেননি, কাজেই নিত্যানন্দের গৌড়ে প্রত্যাবর্তন মহাপ্রভুর বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফেরার পরে ঘটেছিল কিনা, তা বৃন্দাবনদাসের লেখা থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত লিখেছেন যে, বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফেরার পরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে ফেরৎ পাঠান (৪।২২)। সুতরাং ১৪৩৭ শক বা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের অল্প পরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অদ্বৈতের মত নিত্যানন্দের তিরোধানেরও সর্বপ্রথম উল্লেখ পাচ্ছি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে—

আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি ॥

নিত্যানন্দের তিরোধানের সংবাদ শুনে অদ্বৈত দুঃখিত হন এবং তার কিছুদিন পরে তিনিও পরলোকগমন করেন বলে জয়ানন্দ লিখেছেন। অদ্বৈতের তিরোধানের সময়ের নিম্নতম সীমা ১৫৫৮ খৃঃ। নিত্যানন্দের তিরোধানের অধস্তন সীমা ১৫৫৫ খৃঃ ধরতে পারি।

নরহরি সরকার

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য লোচনদাস ভিন্ন অন্য চরিতকাররা তাঁকে একরকম উপেক্ষা করেছেন। তার কারণ, তিনি অন্য সমস্ত ভক্তদের সাধনপ্রণালী গ্রহণ না করে গৌরনাগর বাদের প্রবর্তন করেন।

নরহরি একজন উচ্চশ্রেণীর পদকর্তাও ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর পদগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর নরহরি চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। ভক্তিরত্নাকরে স্বয়ং নরহরি চক্রবর্তী একটি পদ ("গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে") "শ্রীনরহরি সরকার ঠক্কুরস্য গীতমিদম্" বলে উদ্ধৃত করেছেন। সেটি এবং রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' ও দীনবন্ধু

দাসের 'সংকীর্তনামৃতে' উদ্ধৃত 'নরহরি' ভণিতার পদগুলি নরহরি সরকারের লেখা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কিংবদন্তী অনুসারে নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখরের নামাঙ্কিত একটি পদে পাওয়া যায়,

গৌরাঙ্গজন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরিসঙ্গ পাঞা পঁহু শ্রীগৌরাঙ্গ বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ॥

এই উক্তি ঠিক্ হলে বলতে হবে নরহরি ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বেশী পরে জন্মগ্রহণ করলে নরহরির পক্ষে চৈতন্যদেবের জন্মের আগেই 'ব্রজরস' গান করা সম্ভব হয় না।

প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলি। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে নরহরির নামটির পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই।" কিন্তু একথা ঠিক্ নয়। কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের ১৩শ সর্গের ১৪৮শ শ্লোকে নরহরির নাম আছে। শ্লোকটি আমরা উদ্ধৃত করছি,

ইত্থং শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিতবতি প্রত্যাসমাসীদ্ধনিঃ
সর্ব্বাসাং বিদিশাং দিশাঞ্চ জনতাসোৎকণ্ঠমেবাগতা।
যে চান্যে খলু সত্যরাজসুমতি স্তদ্ভ্রাতৃপুত্রাদয়ো।
যে চান্যে রঘুনন্দনো নরহরিঃ শ্রীমন্মুকুন্দাদিকঃ॥

রঘুনন্দন

নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনও শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা পেয়েছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে তিনিও একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। অল্প বয়সেই রঘুনন্দন অত্যন্ত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে রঘুনন্দন সম্বন্ধে মহাপ্রভু ও রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দের এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে,

মুকুন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন। তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥
কিবা রঘুনাথ পিতা তুমি তার তনয়। নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
মুকুন্দ কহে—রঘুনন্দন মোর পিতা হয়। আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমাসভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে। অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে। দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে॥

চরিতামৃতের মতে এই কথোপকথন মহাপ্রভুর দক্ষিণভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেই অর্থাৎ প্রায় ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ঘটেছিল। ঐ সময়ে যে রঘুনন্দন নরহরি ও মুকুন্দের সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তা কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যেও লেখা আছে (পূর্বোদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ঐ সময় রঘুনন্দনের বয়স মাত্র ১৮ বছর ছিল ধরলে তাঁর জন্ম হয় ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে।

কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসবে রঘুনন্দন উপস্থিত ছিলেন বলে 'ভক্তিরত্নাকরে' লেখা আছে। এখন এই দুই মহোৎসবের সময় নির্ধারণ করতে পারলে রঘুনন্দনের জীবৎকাল মোটামুটি ভাবে স্থির করা যাবে। বহু লেখক স্পষ্টাক্ষরে খেতরীর মহোৎসবের তারিখ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ লিখে আসছেন। এর মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র উপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০৫) এই রহস্যের সমাধান পেলাম। সেখানে জগদ্বন্ধু বাবু কোনরকম প্রমাণ না দেখিয়ে লিখেছেন, ১৫০৪ শকাব্দের অল্প পরে খেতরীর মহোৎসব হয়, ঠিক ১৫০৪ শক তিনিও লেখেন নি। পরবর্তী লেখকরা এটুকু সাবধানতাও বজায় না রেখে সোজাসুজি ১৫০৪ শক বা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দই খেতরীর মহোৎসবের সময় ধরে আসছেন। ইতিহাস সম্বন্ধে যে আমরা কত অসাবধান, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসবের আনুমানিক তারিখ নির্ধারণ করা খুব কঠিন নয়। শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বীর হাম্বীরকে দীক্ষাদান ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ বা তার পরবর্তী ঘটনা। কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসব তারও পরে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং রঘুনন্দন অন্ততঃ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। তার পরেও তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না। অতএব আনুমানিক ১৪৯৫-১৫৮০ খৃষ্টাব্দই তাঁর জীবৎকাল।

বাসুদেব সার্বভৌম

বাসুদেব সার্বভৌম শুধু চৈতন্যদেবের একজন বিশিষ্ট পরিকর নন, চৈতন্যদেবের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি লেখনীও চালনা করেছিলেন। জয়ানন্দ লিখেছেন যে বাসুদেব সার্বভৌম প্রথম 'চৈতন্য-চরিত্র' প্রচার করেন,

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার। চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে। সার্ব্বভৌম রচনা করিল প্রেমানন্দে॥

সমস্ত চরিতগ্রন্থে এঁকে "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্বভৌমের স্বরচিত 'অদ্বৈতমকরন্দটীকা' ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে জানা যায় তাঁর সম্পূর্ণ নাম বাসুদেব সার্বভৌম। 'অদ্বৈতমকরন্দটীকা'তে তাঁর পিতার নাম 'নরহরি বিশারদ' বলে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে' 'মহেশ্বর বিশারদ' নাম পাই।

সার্বভৌম কতদিন জীবিত ছিলেন, তা নিরূপনের এখন চেষ্টা করা যাক্। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচায লিখেছেন, "সার্ব্বভৌমের জন্মাব্দ হয় অনুমান ১৪৩০-৩৫ সন মধ্যে।" কিন্তু এই মত স্বীকার করা যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখি,

সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি ॥
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি। পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য করি মানি ॥

সার্বভৌমের পিতা বিশারদ চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহপাঠী ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ তাঁর "মান্য" ছিলেন। নীলাম্বর ও জগন্নাথ কারও জন্মাব্দই ১৪২৫ খৃঃর আগে নয় সুতরাং বিশারদের জন্মাব্দও তার পূর্ববর্তী নয়। অতএব বিশারদের পুত্র সার্বভৌম ১৪৫০ খৃঃর বেশী আগে জন্মগ্রহণ করেন নি। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে নীলাচলে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি প্রবীণ পণ্ডিত। সুতরাং তাঁর জন্মাব্দ ১৪৫০ খৃঃর বেশী পরবর্তীও নয়।

জয়ানন্দ লিখেছেন, চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত আগে মুসলমান গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করেন। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৪৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে সার্বভৌম নবদ্বীপ ছেড়ে নীলাচলে চলে যান। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জয়ানন্দের এই উক্তিকে ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়ানন্দের বর্ণনায় পরস্পরবিরোধী উক্তি থাকায় তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। জয়ানন্দ লিখেছেন,

বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য ॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্দ্ধর রাজা। রত্নসিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা ॥

অথচ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের জন্মের ১১ বছর পরে, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়ানন্দের বর্ণনার মধ্যে সম্ভবতঃ এইটুকু মাত্র সত্য যে সার্বভৌম প্রথমে নবদ্বীপে ছিলেন এবং পরে নীলাচলে যান। চরিতামৃতে বিশারদের সঙ্গে নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহাধ্যায়ন প্রসঙ্গ ও "নদীয়া-সম্বন্ধে"র

উল্লেখ থেকেও তা বোঝা যায়। চৈতন্যদেবের জন্মের সময় সার্বভৌমের বয়স ৩৫।৩৬ এর বেশী ছিল না। অথচ তিনি পণ্ডিত হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবার পরে নীলাচলে গিয়েছিলেন বলেই প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং সার্বভৌম ১৫০০ খৃঃর মত সময়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে নীলাচলে সার্বভৌমের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হয়। তিনি চৈতন্যদেবকে বেদান্তের মতে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের কাছে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করেন। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় সার্বভৌম চৈতন্যদেবের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হননি, চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েই তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন।

নীলাচলে অবস্থানের সময়েই সার্বভৌম 'অদ্বৈতমকরন্দটীকা' রচনা করেন। এই বই ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের পরে লেখা, কারণ এই বইতে সার্বভৌম গজপতি প্রতাপরুদ্রকে "কর্ণাটেশ্বরকৃষ্ণরায়নৃপতের্গর্ব্বাগ্নিনির্ব্বাপক" বলেছেন। কর্ণাট-রাজ কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তারপরে তাঁর সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ হয়।

কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলনের কয়েক বছর পরে সার্বভৌম কাশীতে গিয়েছিলেন। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রামানন্দ বন রচিত 'কাশীখণ্ডে'র টীকার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সার্বভৌম শেষ জীবনে কাশীতেই বাস করেছিলেন। সার্বভৌম ১০০ বছরের বেশী সময় জীবিত ছিলেন বলে দীনেশবাবু যে অনুমান করেছিলেন, তার মূলে যুক্তি পাচ্ছি না।

বাসুদেব সার্বভৌমকে মধ্যযুগের বাংলা সংস্কৃতির 'জংসন স্টেশন' বলা যেতে পারে। একদিকে তিনি যেমন চৈতন্যসম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপাত্র, অপরদিকে তিনি ন্যায় ও বেদান্তদর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। এছাড়া, বাংলায় ব্যাপক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে চৈতন্যদেব, নৈয়ায়িক রঘুনাথ. স্মার্ত রঘুনন্দন ও তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ একই সঙ্গে সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন। অবশ্য সময়ের বিচারে এই প্রবাদ অমূলক প্রতিপন্ন হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ১৬০০ খৃঃর মত সময়ে বর্তমান ছিলেন। কারণ তাঁর 'তন্ত্রসারে'র অধিকাংশ পুঁথিতে দেবনাথ তর্কপঞ্চাননের 'তন্ত্রকৌমুদী'র (রচনাকাল ১৫৬৪-৬৫ খৃঃ) উদ্ধৃতি আছে এবং গৌরীকান্তের 'সদযুক্তিমুক্তাবলী' গ্রন্থে (প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১৬৪২ খৃঃ) 'তন্ত্রসারে'র উদ্ধৃতি আছে ; আগমবাগীশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামতোষণ

১৮২০ খৃষ্টাব্দে 'প্রাণতোষণী' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন (এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৩, পৃঃ ১৪-১৬ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমের কাছে আগমবাগীশের পড়া তো দূরের কথা, সার্বভৌমের জীবৎকালে তাঁর জন্ম পর্যন্ত অসম্ভব বলে মনে হয়।

স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর 'জ্যোতিস্তত্ত্বে' ১৪৮৯ শকাব্দের (১৫৬৭-৬৮ খৃঃ) উল্লেখ করেছেন, সুতরাং ঐ গ্রন্থ তার পরে সম্পূর্ণ হয়। তাঁর 'মলমাসতত্ত্বে' 'জ্যোতিস্তত্ত্ব' সমেত ২৮টি 'তত্ত্বে'র উল্লেখ আছে, কিন্তু তীর্থযাত্রাতত্ত্ব, দ্বাদশ-যাত্রাতত্ত্ব, ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব, গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি, রাসযাত্রাপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ নেই। এর থেকে বোঝা যায়, জ্যোতিস্তত্ত্বের পরে মলমাসতত্ত্ব এবং তার পরে শেষোক্ত গ্রন্থগুলি রচিত হয়। অতএব রঘুনন্দন অন্ততঃ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। রঘুনন্দনের গুরু ছিলেন শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি। শ্রীনাথের আর এক শিষ্যের লেখা ১৪৩৪ শক বা ১৫১২-১৩ খৃষ্টাব্দের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের বেশী পরে জন্মগ্রহণ করলে শ্রীনাথের কাছে রঘুনন্দনের পড়া সম্ভব হয় না। অতএব রঘুনন্দনের আনুমানিক জীবৎ-কাল ১৫০০-১৫৮০ খৃঃ ধরতে পারি। বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে রঘুনন্দনের পড়া একেবারে অসম্ভব নয়, যদিও সেসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু চৈতন্য-দেবের সহপাঠী হওয়া রঘুনন্দনের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না।

চৈতন্যদেবও কোনদিন সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ এক জাল 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ভিন্ন কোন চরিতগ্রন্থে এ বিষয়ের ঘুণাক্ষ-রেও উল্লেখ নেই। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা থেকে মনে হয় নীলাচলে দেখা হবার আগে সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে আদৌ চিনতেন না। চরিতামৃতে দেখি চৈতন্যদেব বিনয় করে সার্বভৌমকে বলছেন,

আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥

সম্ভবতঃ এই উক্তির উপর নির্ভর করেই সার্বভৌম ও চৈতন্যের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের প্রবাদ গড়ে উঠেছে।

এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র রঘুনাথ শিরোমণিই সম্ভবতঃ সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার নামক জনৈক গ্রন্থকারের লেখা 'অনুমান-দীধিতিপ্রতিবিম্বে' সার্বভৌমকে রঘুনাথ শিরোমণির গুরু বলা হয়েছে। রঘুনাথ শিরোমণির সময় সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকেও এই

উক্তি সমর্থিত হয়। ১৫৭০ খৃঃর কাছাকাছি সময়ে রচিত রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্বে' রঘুনাথ শিরোমণির 'মলিম্লুচবিবেকে'র উদ্ধৃতি আছে। সুতরাং রঘুনাথ শিরোমণি তার আগেই বর্তমান ছিলেন। রঘুনাথের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি'র কয়েকটি টীকা ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই রচিত হয়েছিল। ঐ সময়ের মধ্যেই 'দীধিতি'র প্রাচীন পাঠ অনেকাংশে লুপ্ত হয়েছিল এবং বিভিন্ন পাঠান্তরের সৃষ্টি হয়েছিল বলে ঐ সমস্ত টীকা থেকে জানা যায় (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, পৃঃ ৯৮-৯৯)। সুতরাং 'অনুমানদীধিতি' ১৫৩০খৃঃ বা তার আগেই রচিত হয়েছিল। ১৫২৫ খৃঃর আগে নিশ্চয়ই রচিত হয় নি, কারণ 'দীধিতি'তে কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের একটি 'বিবক্ষা' উদ্ধৃত হয়েছে (ঐ, পৃঃ ১০১)। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ১৫৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে 'সচ্চরিতমীমাংসা' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের একটি নির্ণয়পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীধরের 'কৃত্যকল্পতরু'র পুঁথি নকল করিয়েছিলেন (ঐ, পৃঃ ৬৩-৭২)। সুতরাং তাঁর জন্মাব্দ ও গ্রন্থরচনাকাল যথাক্রমে ১৫০০ ও ১৫২০ খৃষ্টাব্দের আগে কোন মতেই হবে না।

অতএব রঘুনাথ শিরোমণি ১৪৭৫ খৃঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করে প্রায় ৫০ বছর বয়সে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অনুমানদীধিতি রচনা করেন বলে ধরতে পারি। আর একটি বিষয় থেকে এই সময়নির্ধারণ সমর্থিত হয়। 'রূপসনাতন' নামে জনৈক ঘটক-গ্রন্থকারের মতে স্মার্ত গ্রন্থকার 'সাহরী' বংশীয় শূলপাণি রঘুনাথের মাতামহ (বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা, পৃঃ ৮৯)। শূলপাণি মৈথিল গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্রের (জীবৎকাল আঃ ১৪২০-১৪৭৫ খৃঃ) সমসাময়িক, কারণ উভয়ে উভয়ের গ্রন্থে পরস্পরের মত উদ্ধৃত করেছেন (I. H. Q, 1941, P. 464)। অতএব রঘুনাথের জন্মাব্দ ১৪৭৫ খৃঃর কাছাকাছি সময়ে ধরাই যুক্তিযুক্ত হয়। সুতরাং সময়ের হিসাবেও তাঁর পক্ষে বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

স্বরূপ দামোদর

স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার প্রায় আগাগোড়াই তাঁর সঙ্গী ছিলেন। চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়, স্বরূপ দামোদরের পূর্বনাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য এবং তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির "প্রিয় সখা" ছিলেন। পুণ্ডরীক গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রগুরু এবং চৈতন্যদেব তাঁকে "বাপ" বলে সম্বোধন

করতেন। সুতরাং মহাপ্রভুর চেয়ে স্বরূপ বয়সে অনেক বড় ছিলেন সন্দেহ নেই। মহাপ্রভুর বিয়োগের পরে তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং মোটামুটিভাবে ১৪৬৫-১৫৪০ খৃঃ তাঁর জীবৎকাল ধরতে পারি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণনা করে একটি 'কড়চা' লিখেছিলেন এবং রঘুনাথদাস তার বৃত্তি লিখেছিলেন। কৃষ্ণদাস স্বরূপদামোদরের কড়চার কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। 'রায় রামানন্দ সংবাদ'টি তিনি এই কড়চা অবলম্বনেই বর্ণনা করেছেন। ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদার এই বিবৃতিকে সত্য বলে মানেননি। আমরা কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মিথ্যাবাদী বলতে পারিনা। কৃষ্ণদাস রঘুনাথ রচিত বৃত্তি থেকে কিছু উদ্ধৃত করেননি বলে তার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' বর্ণিত 'রায় রামানন্দ সংবাদে'র সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনার যে মিল দেখা যায়, তার কারণ কবিকর্ণপুরও স্বরূপদামোদরের কড়চা পড়েছিলেন ; তার প্রমাণ 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় তিনি স্বরূপ দামোদরের তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ "কবিকর্ণপুর সম্ভবতঃ স্বরূপ দামোদরের কড়চা দেখেন নাই" বলে যে অনুমান করেছেন, তা যে ঠিক নয়, তা বলাই বাহুল্য। যাহোক্ কবিকর্ণপুর 'রায়রামানন্দ সংবাদ' বর্ণনায় স্বরূপ দামোদরের বর্ণনার উপরেও কিছু যোগ করেছেন এবং কৃষ্ণদাস তার থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের কয়েকটি শ্লোকের উপরে 'তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামি কড়চায়াম্' লেখা আছে। কিন্তু পুঁথিতে তা না লেখা থাকায় কেউ কেউ শ্লোকগুলিকে স্বরূপ দামোদরের লেখা বলে স্বীকার করতে চান না। কোন কোন সংস্করণে আবার শ্লোকগুলির উপরে "তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াম" লেখা আছে। শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব স্বরূপ দামোদরেরই নির্ণীত বলে প্রমাণিত হয়েছে, সুতরাং সেগুলি স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকেই উদ্ধৃত বলে মনে হয়। ভক্তিরত্নাকরেও স্বরূপ দামোদরের কড়চার একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।

রূপ-সনাতন

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বলতে আমরা যাকে জানি, তার স্রষ্টা চৈতন্যদেব, কিন্তু রূপকার রূপ-সনাতন। চৈতন্যদেবের অন্য কোন কোন পরিকর স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছিলেন। নরহরি গৌরনাগরবাদ এবং কবিকর্ণপুর গৌরপারম্যবাদ

প্রচার করেছিলেন। জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যদেবকে দিয়ে যোগ উপদেশ করিয়েছেন। উড়িয়া ভক্তেরা অন্য প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু রূপ-সনাতনেরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে। তাঁদের ভাষ্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের মূল ভাষ্যের মর্যাদা পেয়েছে। এই ভাষ্যের মূলে চৈতন্যদেবের প্রভাব থাকলেও তা যে অনেকখানি রূপ-সনাতনেরই সৃষ্টি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জীব গোস্বামীর 'লঘু বৈষ্ণবতোষণী' থেকে জানা যায়, রূপ-সনাতনের পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল কর্ণাটকে। তাঁদের প্রপিতামহ পদ্মনাভ হিন্দু গৌড়েশ্বর দনুজমর্দন বা গণেশের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি নবহট্টকে বসতি স্থাপন করেন। রূপ-সনাতনের পিতা কুমারদেব পূর্ববঙ্গে চলে যান। (ভক্তিরত্নাকরের মতে পূর্ববঙ্গের বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে যান)। কুমারদেবের তিন ছেলেরই নাম আমরা জানি—রূপ, সনাতন ও বল্লভ বা অনুপম। আর এক ছেলের উল্লেখ চরিতামৃতে পাই। তাতে দেখি হোসেন শাহ সনাতনকে বলছেন

তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস॥

রূপ-সনাতনের জীবৎকাল সম্বন্ধে এবার আলোচনা করব। চৈতন্যদেব যে সময় নীলাচল থেকে বাংলায় আসেন, সেই সময় অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে সনাতন ছিলেন হোসেন শাহের সাকর মল্লিক বা প্রধান মন্ত্রী এবং রূপ ছিলেন দবির খাস বা একান্ত সচিব। ঐ সময় রূপের বয়স মাত্র ত্রিশ বছর ছিল এবং সনাতন তাঁর চেয়ে মাত্র দু বছরের বড় ছিলেন ধরলে তাঁর জন্মাব্দ হয় ১৪৮৪ খৃঃ এবং সনাতনের ১৪৮২ খৃঃ। এরপর তাঁদের জন্মাব্দ নামবেনা। এর বেশী আগেও যাবে না, কারণ তাঁরা দুজনেই ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও জীবিত ছিলেন। সনাতনের 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী' ১৪৭৬ শকাব্দ বা ১৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ভক্তিরত্নাকরের মতে রূপ সনাতনের পরে পরলোকগমন করেছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৃন্দাবনে যান। রূপ-সনাতন তার আগেই পরলোকগমন করেছিলেন (শ্রীনিবাস আচার্যের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত একটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা পাতড়া থেকে রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কিছু নতুন খবর পাওয়া যায়।

পাতড়াটির লিপিকাল ১৬২৯ শক ও ১০১৩ সন (মল্লাব্দ) অর্থাৎ ১৭০৭-০৮ খৃঃ। ডঃ সুকুমার সেন ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ তারিখে বর্ধমান সাহিত্য সভার অধিবেশনে এটির পরিচয় দেন। পাতড়াটিতে লেখা আছে, পদ্মনাভ কুমারহট্টে বসতি স্থাপন করেন। জীব গোস্বামীর উল্লিখিত 'নবহট্টক' যে আধুনিক ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটি, তা এর থেকে বোঝা যায়। পাতড়াটিতে আরও লেখা আছে যে রূপ-সনাতন-বল্লভের আরও দুজন বড় ভাই ছিলেন এবং তাঁরা পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। চরিতামৃতে হোসেন শাহের উক্তি এই উক্তির সমর্থক।

জীব গোস্বামী

জীব গোস্বামীর পিতা বল্লভ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন পেয়েছিলেন। তার অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং জীব ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'গোপালচম্পূ' সম্পূর্ণ করেন, অতএব অন্ততঃ ঐ বছর অবধি তিনি জীবিত ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন সূত্রের উক্তি বিশ্বাস করলে বলতে হয়, জীব অন্ততঃ ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরের' মতে চৈতন্যদেব যখন রামকেলিতে আসেন, তখন জীব তাঁর দর্শন পান—"শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।" এ ঘটনা ঘটে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় জীবের বয়স মাত্র ৪ বছর ছিল ধরলে তাঁর জন্মাব্দ হয় ১৫১০ খৃষ্টাব্দ। এদিকে বর্ধমান সাহিত্য-সভার যে পাতড়াটির আগে উল্লেখ করেছি, তাতে লেখা আছে জীব ১৫৩২ শকে অর্থাৎ ১৬১০-১১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ঐ পাতড়াটিতে আর একটি নতুন কথা লেখা আছে যে জীব বিবাহের রাত্রে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান।

গোপালভট্ট

গোপালভট্ট বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অন্যতম। অনেক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে প্রামাণিকভাবে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। 'অনুরাগবল্লী' ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে মহাপ্রভু যখন দক্ষিণভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেই সময় গোপাল ভট্টের পিতার গৃহে চাতুর্মাস্য যাপন করেন। গোপাল তখন বালক, তিনিও প্রভুর সেবা করেন। চৈতন্যলীলার

প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত লিখেছেন, দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভু ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চাতুর্মাস্য যাপন করেন এবং তাঁর বালক পুত্র গোপাল প্রভুর কৃপা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই গোপালই যে পরবর্তীকালে 'গোপালভট্ট' নামে পরিচিত হন, তা মুরারি গুপ্ত বলেননি। প্রকৃতপক্ষে 'গোপালভট্টে'র পিতার নাম কি, তা অনিশ্চিত (এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে ডঃ সুশীলকুমার দের লেখা 'নানা নিবন্ধ' বইএর 'গোপালভট্ট' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। যাহোক্, গোপাল ভট্টের বাল্যকালে মহাপ্রভু দক্ষিণভারতে গিয়েছিলেন, এই বিবরণ সঠিক হলে ১৫০০ থেকে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোপাল ভট্টের জন্ম ধরতে হবে, কারণ মহাপ্রভু ১৫১১-১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যান। গোপালভট্ট শ্রীনিবাস আচার্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি অন্ততঃ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন সন্দেহ নেই।

রঘুনাথ দাস

রঘুনাথ দাসের শেষ জীবনের সহচর কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে, রঘুনাথ দাস চৈতন্যদেবের নীলাচল থেকে গৌড়ে আগমনের সময় অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করেন, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে গৃহ ত্যাগ করে নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হন এবং ষোল বছর মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করেন—"ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।" মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের মৃত্যু ঘটলে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। গৃহত্যাগের আগে তাঁর বিবাহ ও পুত্রকন্যার জন্ম হয়েছিল। সুতরাং রঘুনাথের জন্ম ও মৃত্যুর সন যথাক্রমে ১৪৯৫ খৃঃ ও ১৫৮৫ খৃঃর পরবর্তী নয়।

রঘুনাথ ভট্ট

চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে, মহাপ্রভু যখন কাশীতে যান তখন অর্থাৎ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে তপন মিশ্রের বালক পুত্র রঘুনাথ প্রভুর সেবা করেন। এই রঘুনাথই রঘুনাথ ভট্ট। এঁর জন্ম ১৫০৫ খৃঃর কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল ধরতে পারি। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবন গমনের অর্থাৎ আনুমানিক ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের আগে পরলোক গমন করেন।

॥ তের ॥

মুরারি গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে তাঁর বিশিষ্টতম ভক্তদের একজন হয়েছিলেন। মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। বৃন্দাবনদাস স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন, যে সমস্ত চৈতন্য-ভক্ত চৈতন্যদেবের আগেই জন্মেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত অন্যতম। চৈতন্যদেব যখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে মুরারি, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি সহপাঠীকে "ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া" বিরক্ত করতেন, তখন "শিশুজ্ঞানে কেহো কিছু না বোলে হাসিয়া।" মুরারি মহাপ্রভুর চেয়ে ৬।৭ বছরের বড় ছিলেন এবং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে ধরতে পারি।

মুরারি গুপ্ত শুধু ভক্ত হিসেবে নন, কবি হিসেবেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি বাংলায় ও ব্রজবুলীতে কতকগুলি উচ্চাঙ্গের পদ রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে 'সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও' পদটি অত্যন্ত বিখ্যাত। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্তে'র চতুর্থ পর্বে (১৯৩৩) কমললতাকে দিয়ে পদটি গাইয়েছেন ও ব্যাখ্যা করিয়েছেন।

মুরারি গুপ্তের রচনাগুলির মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা চৈতন্য-জীবনী-কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' সবচেয়ে বিখ্যাত। এটিই প্রাচীনতম চৈতন্যচরিত-গ্রন্থ এবং প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা বলে প্রামাণিকতার দিক দিয়েও অদ্বিতীয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারি গুপ্তের গ্রন্থকে 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' বলেছেন। 'কড়চা' শব্দে সাময়িক লিপি জাতীয় রচনা বোঝায়। কিন্তু এই গ্রন্থ আমরা বর্তমানে যে আকারে পাচ্ছি, তা আলঙ্কারিক রীতিতে রচিত একটি মহাকাব্য। বইটি ৪টি প্রক্রমে বিভক্ত। প্রথম প্রক্রমে ১৬টি, দ্বিতীয় প্রক্রমে ১৮টি, তৃতীয় প্রক্রমে ১৮টি এবং চতুর্থ প্রক্রমে ২৬টি অধ্যায় আছে। প্রথম প্রক্রমের প্রথম অধ্যায়ে দেখি, চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত শ্রীবাসের অনুরোধে মুরারি চৈতন্যচরিত বর্ণনা করছেন। প্রথম প্রক্রমের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত চৈতন্যচরিতের বক্তা মুরারি এবং শ্রোতা দামোদর পণ্ডিত।

দামোদর চৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং মুরারি তার সবিস্তারে উত্তর দেন।

মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ ১৮৯৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এখন কিন্তু এর কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। তাহলেও এর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ থেকে প্রক্রম ও অধ্যায়ের উল্লেখ সমেত ১০টি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলি এই গ্রন্থে যথাযথ পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুর 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে' মুরারির কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন, মহাকাব্যের ১ম থেকে ১৬শ পর্যন্ত সর্গের সঙ্গে মুরারির নামে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রায় হুবহু মিল আছে। লোচনদাসও মুরারির ঋণ স্বীকার করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থে মুরারির গ্রন্থের বহু অংশের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যায়। মুরারির গ্রন্থ যে দামোদর ও মুরারির প্রশ্নোত্তরের ছলে লেখা, তা লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে বলেছেন,

দামোদর পণ্ডিত সর্ব্ব পুছিল তাহারে। আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোকবন্ধে কৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত। দামোদর সংবাদ—মুরারি মুখোদিত॥

এই কথা লোচন তাঁর গ্রন্থের নানা জায়গাতে বলেছেন। এক জায়গায়,

মুরারি গুপ্ত বেজা প্রভুতত্ত্ব জানে। দামোদর পণ্ডিত পুছিলা তাঁর স্থানে॥

বলে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ডে লিখেছেন,

মুরারি দেখিয়া প্রভু বোলে পুনর্ব্বার। পঢ়হ আপন শ্লোক শুনিব তোমার॥
এ বোল শুনিঞা সেই মুরারি চতুর। পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ শুনয়ে ঠাকুর॥

এর পরে তিনি 'রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশমুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তম্' ইত্যাদি একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটি মুরারির গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রক্রম সপ্তম সর্গে পাওয়া যায়।

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় কবিকর্ণপুর লিখেছেন,

মুরারিগুপ্তচরণৈশ্চৈতন্যচরিতামৃতে।
উক্তো মুনিসুতঃ প্রাতস্তুলসীপত্রমাহরন্॥
অধৌতমভিশপ্তঃ স পিত্রা যবনতাং গতঃ।
স এব হরিদাসঃ সন্ জাতঃ পরমভক্তিমান্॥

মুরারি গুপ্তের গ্রন্থে সত্যিই এই কথা আছে—প্রথম প্রক্রমের চতুর্থ সর্গের নবম থেকে দ্বাদশ ছত্রে।

সুতরাং মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তবে এর রচনাকাল নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের একেবারে শেষে এই রচনাকালসূচক শ্লোকটি ছিল,

চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চবিংশতিবৎসরে।
আষাঢ় সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

এর অর্থ করা হয়েছিল ১৪২৫ শকাব্দে (১৫০৩ খৃঃ) আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে এই গ্রন্থ শেষ হয়। বলা বাহুল্য এই ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব কারণ ঐ সময় মহাপ্রভুর বয়স মাত্র ১৮ বছর ছিল এবং তাঁর মহাপুরুষলক্ষণও কিছুই তখন বিকশিত হয়নি। তিনি 'চৈতন্য' নাম নেবার সাত বছর আগে "চৈতন্যচরিত" লেখা হওয়া অসম্ভব। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৮ম বর্ষে ২৬৮ পৃষ্ঠায় এবং প্রকাশিত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এই শ্লোকটি যেভাবে ছাপা হয়েছে, তাতে 'পঞ্চবিংশতি'র জায়গায় 'পঞ্চত্রিংশতি' পাঠ দেখা যায়। তার ফলে অনেকে মনে করেছেন যে, ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খৃষ্টাব্দে) বইটির রচনা শেষ হয়। কিন্তু বইটিতে মহাপ্রভুর জীবনের ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী ঘটনাও অনেক বর্ণিত হয়েছে, তাঁর গম্ভীরালীলার বর্ণনা আছে, এমন কি তাঁর মৃত্যুর পর্যন্ত উল্লেখ আছে। তাহলে কি ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ অবধি বর্ণনাটুকুই অকৃত্রিম, তার পরবর্তী ঘটনার সবই প্রক্ষিপ্ত? ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার কিন্তু এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন না। তার কারণ, এই বই-এর মহাপ্রভুর বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পর বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি লোচন প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু বৃন্দাবনভ্রমণ করে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন।

দুটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমতঃ, গ্রন্থশেষের শ্লোকটির মধ্যে 'শকাব্দ' কথাটি কোথাও উল্লিখিত হয় নি। এ থেকে শ্লোকটির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ জাগে। কারণ মুরারি গুপ্তের মত পণ্ডিত লোক গ্রন্থরচনাকাল নির্দ্দেশের সময় অব্দের উল্লেখ করবেন না, এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ 'পঞ্চবিংশতি' অশুদ্ধ রূপ—শুদ্ধ রূপ হবে 'পঞ্চবিংশ'। কিন্তু 'পঞ্চবিংশ বৎসরে' অথবা 'পঞ্চবিংশ শক বৎসরে' লিখলে ছন্দোপতন হয়।

অতএব শ্লোকটি কোন সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের প্রক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। আমাদের ধারণা যে ঠিক্, তা এই শ্লোকটির আগের আটটি শ্লোক থেকেও বোঝা যাবে।

এই আটটি শ্লোকে মুরারি গুপ্তের যেভাবে প্রশস্তি করা হয়েছে. নিজের সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোক সেরকম লিখতে পারেন না, বিনয়ী বৈষ্ণব মুরারি তো দূরের কথা। গ্রন্থ রচিত হওয়ার বহু পরে মুরারি গুপ্তের কোন একজন ভক্ত এই শ্লোকগুলি জুড়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রথম আটটিতে মুরারি গুপ্তের মহিমা জ্ঞাপন করেছেন এবং শেষ শ্লোকটিতে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী গ্রন্থের রচনাকাল জানিয়েছেন। ভদ্রলোকের ইতিহাস ও সংস্কৃত, দুই বিষয়েই অল্প জ্ঞান থাকার জন্যে শ্লোকটিতে দু দিক দিয়েই মারাত্মক ভুল থেকে গেছে।

রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ হওয়াতে এখন মুরারি গুপ্তের গ্রন্থসমাপ্তির সময় সহজেই ঠিক্ করা যায়। বইটির প্রথম প্রক্রম দ্বিতীয় সর্গে চৈতন্যদেবের তিরোধানের উল্লেখ আছে,

তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠৈস্তৈঃ প্রসাধিতঃ।
জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহর্দ্ধিমৎ ॥

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে। তারপরে গ্রন্থরচনায় হাত দিলে গ্রন্থ শেষ করতে অন্ততঃ ২।৩ বছর লাগবার কথা। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে' কবিকর্ণপুর এই গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন ও গ্রন্থকারের প্রতি উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। সুতরাং ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের অন্ততঃ ৫।৬ বছর আগে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই হিসাবে আনুমানিক ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।

॥ চৌদ্দ ॥

কবিকর্ণপূর

চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠপুত্র পরমানন্দদাস সেন 'কবিকর্ণপূর' উপাধিতেই সকলের কাছে পরিচিত। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তিনি তিনখানি বই লিখেছিলেন। এই তিনখানি বইএর নাম চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

এদের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন সমস্যা নেই। বইএর শেষে কবি লিখেছেন

> বেদাঃ রসাঃ শ্রুতয়ঃ ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে।
> শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি॥
> বারে সুধাকিরণনাম্ন্যসিতদ্বিতীয়া-
> তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য॥

এর থেকে বোঝা যায় ১৪৬৪ শকাব্দের আষাঢ় মাসে অর্থাৎ ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে এই বই সমাপ্ত হয়েছে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষেও অনুরূপ রচনাকালনির্দেশক শ্লোক পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই,

> শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
> গৌরোহরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
> তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়-লীলা-
> গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥

এর থেকে জানা যায় ১৪৯৪ শক=১৫৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচিত হয়। কিন্তু ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই তারিখকে নাটকের রচনাকাল বলে মানতে অনিচ্ছুক। এই নাটক ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের আগেই রচিত হয়েছিল বলে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তার মধ্যে কতকগুলি যুক্তি

৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ খণ্ডন করেছেন (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, পৃঃ ৭৫১-৭৫৭ দ্রঃ)। কিন্তু কয়েকটি যুক্তি এখনও প্রণিধানযোগ্য। সেগুলি এই :—

(১) শ্রীচৈতন্যের বিরহে শোকাকুল মহারাজ প্রতাপরুদ্রের শোক অপনোদনের জন্যে এই নাটক রচিত হয়েছিল বলে নাটকের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হয়েছে। প্রতাপরুদ্র ১৫৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগমন করেছিলেন। সুতরাং নাটক তার আগে রচিত হয়।

(২) নাটকে লেখকের পিতা শিবানন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে খুব অল্প কথাই আছে। মহাকাব্য যদি আগে লেখা হত, তাহলে তাতে লেখক নিজের পিতার সম্বন্ধে এত অল্প কথা লিখতেন না। এর একমাত্র সঙ্গত কারণ এই হতে পারে যে, নাটকে আগেই এ সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে বলে লেখক মহাকাব্যে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

(৩) নাটকে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ভুল বা মুরারি গুপ্তের কড়চা প্রভৃতি প্রামাণিক চরিতগ্রন্থের উক্তির বিরোধী। অথচ মহাকাব্যে সেই সব বিষয়ে সঠিক তথ্য দেওয়া হয়েছে। নাটক যদি ১৫৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হত, তাহলে মহাকাব্যে খাঁটি খবর দিয়ে তারপর বিনা কারণে লেখক মহাকাব্যরচনার ত্রিশ বছর বাদে মিথ্যা খবর দিতেন না।

কিন্তু নাটকখানি যে সত্যিই ১৫৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল, তা গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিশ্লেষণ করে ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ দেখিয়েছেন। নাটকের শেষে একটি শ্লোক আছে,

> শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্নিতং
> জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
> এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৈত্যেকশেষং গতে
> কো জানাতু শৃনোতু ক স্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাং॥

এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করে ৺তর্কবাগীশ লিখেছেন, "শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৈত্যেক শেষং গতে' এই কথাও লক্ষ্য করা…কর্ত্তব্য। কবিকর্ণপূর উক্ত স্থলে দুঃখসূচক 'শিব শিব' শব্দের প্রয়োগ করিয়া কি বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও বুঝা আবশ্যক। কবিকর্ণপূরের ঐ কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নাটক সমাপ্তিকালে শ্রীচৈতন্যদেবের 'প্রিয়মণ্ডল' অর্থাৎ রাজা প্রতাপরুদ্র ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি উৎকলীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ও অন্যান্য

গৌড়ীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কেহ জীবিত ছিলেন না। তাঁহারা তখন স্মৃতি মাত্র শেষ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই কবিকর্ণপূর দুঃখ প্রকাশ করিয়া উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন—'তৎপ্রিয়মণ্ডলে স্মৃত্যৈক শেষং গতে কো জানাতু শৃণোতু কঃ।' অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্তগণ তখন সেই শরীরে বিদ্যমান না থাকায় এই লীলা-কথা কে বুঝিবেন? কে শুনিবেন? 'তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্।' অতএব এই লীলা-কথার দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেব প্রীত হউন।"

ডঃ মজুমদার ও ৺তর্কবাগীশের সমস্ত যুক্তি প্রণিধান করে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের রচনাকাল সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে পৌছোতে আমরা বাধ্য হই যে—রাজা প্রতাপরুদ্রের নির্বন্ধ অনুযায়ী ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের আগেই কবিকর্ণপূর নাটক লিখতে সুরু করেন। নাটকের অধিকাংশ রচিত হবার পরে (সম্ভবতঃ প্রতাপরুদ্রের পরলোকগমনের জন্যে) তাতে ছেদ পড়ে। পরে তিনি ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে 'চৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য' রচনা করেন, কিন্তু নাটকটি অসমাপ্তই থেকে যায়। দীর্ঘকাল পরে (হয়তো অন্য কারও নির্বন্ধাতিশয্যে) ১৫৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নাটকটি শেষ করেন—যখন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সকলেই পরলোকগমন করেছেন।

কবিকর্ণপূরের অপর গ্রন্থ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পরিকরদের তত্ত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে এই বইটি থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র অধিকাংশ পুঁথিতে বইটির রচনাকাল পাওয়া যায় "শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে" অর্থাৎ ১৪৯৮ শক (=১৫৭৬-৭৭ খৃঃ)। এই পাঠই সঙ্গত। মাত্র একখানি পুঁথিতে "শাকে রসারসমিতে মনুনৈব যুক্তে" অর্থাৎ ১৪৬৭ শক (=১৫৪৫-৪৬ খৃঃ) রচনাকাল পাওয়া যায়। এই তারিখ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র রচনাকাল হতে পারেনা। কারণ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে 'চৈতন্যভাগবত'কার বৃন্দাবদাসকে 'বেদব্যাস' বলা হয়েছে। কিন্তু ১৫৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচিত হয়েছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। যদি হয়েও থাকে, তাহলে গ্রন্থরচনার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ বৃন্দাবনদাস 'বেদব্যাস' আখ্যা পেয়ে গেলেন বলে মনে করা যায় না। 'চৈতন্যভাগবত' রচনার অন্ততঃ একপুরুষ পরে এবং বৃন্দাবনদাসের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচিত হয়েছিল বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং ১৫৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দই বইটির রচনাকাল।

এই বইগুলি ছাড়া কবিকর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় পদও লিখেছিলেন। সম্ভবতঃ

বাংলা ভাষাতেও লিখেছিলেন। 'পরমানন্দ' ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলি তাঁর লেখা বলেই মনে হয়।

কবিকর্ণপূরের জন্ম কোন সময়ে হয়েছিল তা একটি বিতর্কমূলক বিষয়। কবিকর্ণপূরেরা তিন ভাই—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দদাস। চৈতন্যদাসের নাম থেকে মনে হয়, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও 'চৈতন্য' নাম গ্রহণের পরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তারও পরে রামদাস এবং তারও পরে কবিকর্ণপূর পরমানন্দদাসের জন্ম হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে কবিকর্ণপূরের জন্মের আগে তাঁর পিতা শিবানন্দ সেন নীলাচলে গিয়ে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করতেন। প্রভু শিবানন্দকে বলেন,

এবার তোমার যেই হইবে কুমার
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার ॥

'পুরীদাস' নামে পরমানন্দ পুরীর দাস। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশমাঙ্কেও দেখি শিবানন্দের সঙ্গে তাঁর ছোটছেলে আসছেন শুনে মহাপ্রভু পরমানন্দ পুরীকে বললেন, "স্বামিন্, তব দাসঃ।" তাই শিবানন্দের ছোটছেলে

"প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস।"

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, সাত বছর বয়সে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুকে একটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়ে চমৎকৃত করেছিলেন। কিন্তু ঐ ঘটনার সাল জানা যায় না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে কবিকর্ণপূর ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাহলে চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য রচনার সময় তাঁর বয়স হয় মাত্র ১৮ বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের পুঁথির লিপিকর লিখেছেন, মহাকাব্য রচনার সময় কবিকর্ণপূরের বয়স মাত্র ষোল বছর ছিল। কিন্তু এই দুই মতের কোনটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে যে কবিত্ব, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখা যায়, তা ২৪।২৫ বছরের আগে সম্ভব বলে মনে হয় না। অন্ততপক্ষে এই কাব্য যে ১৬ বা ১৮ বছরের বালকের রচনা নয়, তা নিঃসংশয়েই বলা যায়। তারপর এই দুই মত অনুসারে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় কবিকর্ণপূরের বয়স হয় ৯ বা ৭ বছর। কিন্তু ঐ সময় কবিকর্ণপূরের বয়স অত কম ছিল না। কারণ মহাকাব্যের চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ সর্গে মহাপ্রভুর ও ভক্তদের উপস্থিতিতে নীলাচলের রথযাত্রার যে বিবরণ কবিকর্ণপূর দিয়েছেন,

তা যে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ সর্গের একাদশ শ্লোকে কবি স্পষ্টই বলেছেন, তিনি ভক্তদের প্রথম রথযাত্রা দর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন না, অন্য এক বছরের বর্ণনা দিচ্ছেন। প্রথম বারের রথযাত্রার সময় তাঁর জন্ম হয়নি বলে তিনি অন্য এক বছরের রথযাত্রা, যা নিজের চোখে তিনি দেখেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার মধ্যে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় যেরকম সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে, ৭ বা ৯ বছর বয়সের সময়কার স্মৃতি থেকে লিখলে তেমন সম্ভব হত বলে মনে হয় না। তাছাড়া চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনা থেকে বোঝা যায় রাজা প্রতাপরুদ্র কবিকর্ণপুরকে ঐ নাটক লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রতাপরুদ্র ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগমন করেন। তার আগে কবিকর্ণপুরের বয়স ১৬।১৭ বছরের বেশী হয়নি বলে যদি ধরা যায়, তা হলে প্রতাপরুদ্র আর সব লোককে বাদ দিয়ে ঐ বয়সের একটি বালককে কেন নাটক লিখতে অনুরোধ করবেন তা বোঝা যায় না। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে রূপ গোস্বামী কবিকর্ণপুরের একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন। ঐ সময়ে কবিকর্ণপুরের বয়স ২৭।২৮ বছরের কম ছিল বলে মনে হয় না। এই ক'টি কারণ থেকে আমার মনে হয়, আনুমানিক ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে কবিকর্ণপুরের জন্ম হয়েছিল।

কবিকর্ণপুর তাঁর পিতা শিবানন্দ সেনের কাছে চৈতন্য-জীবনী শুনে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' রচনার সময় যে শিবানন্দ জীবিত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ গ্রন্থের শেষে কবি লিখেছেন,

ইহ পরমকৃপালোর্গৌরচন্দ্রস্য কোঽপি
প্রণয়রসশরীরঃ শ্রীশিবানন্দ সেনঃ।
ভুবি নিবসতি তস্যাপত্যমেকং কনীয়-
স্তুকৃত পরমমৌগ্ধ্যাচ্চিত্রমেতং প্রবন্ধং॥

(এই পৃথিবীতে পরম কৃপালু গৌরচন্দ্রের কোন এক প্রণয়রসশরীর (প্রিয়পাত্র) শিবানন্দ সেন বাস করেন, তাঁরই কনিষ্ঠপুত্র পরম মুগ্ধতায় এই চিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছে।)

॥ পনের ॥

রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য

এদেশে ভাগবতপুরাণের জনপ্রিয়তা রামায়ণ বা মহাভারতের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে বাংলা ভাষায় বহু কাব্য লেখা হয়েছে। তার মধ্যে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রাচীনতম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা ভাষায় ভাগবতপুরাণের অনুবাদ খুব বেশী হয়নি। যে কখানি অনুবাদগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতচার্যের অনুবাদই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এই রঘুনাথ পণ্ডিতের নিবাস ছিল বরাহনগরে। ইনি ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের পূর্ণাঙ্গ আকারে অনুবাদ করেন। রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত। কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় লেখা আছে, "নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যা গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥" যদুনাথ দাসের "শাখানির্ণয়ামৃতম্"এ আছে, "বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয়-পাত্রকম্। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫৭)

রঘুনাথ নিজে বলেছেন যে তিনি "পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুত গদাধর" এর শিষ্য ছিলেন। যদুনাথ প্রভৃতির লেখা গদাধরের শাখানির্ণয়েও রঘুনাথের নাম আছে। কিন্তু তিনি চৈতন্যদেব ও গদাধর পণ্ডিতের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। কারণ সন্ন্যাসের পরে যখন চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বাংলায় আসেন, তখন তিনি বরাহনগরে রঘুনাথের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর ভাগবত পাঠ শোনেন এবং তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দেন। একথা আমরা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে পাই,

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥

প্রভু বোলে ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য। ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য॥

এই ঘটনা ঘটেছিল ১৫১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে। অনুমান হয়, এর কিছু পরেই রঘুনাথ ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন। যা হোক্, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই রঘুনাথের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' রচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

॥ ষোল ॥

কবিশেখর

'পদকল্পতরু' প্রভৃতি পদসঙ্কলনগ্রন্থে কবিশেখর, শেখর ও রায়শেখর ভণিতার বহু উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যায়। এই তিন ভণিতা মূলতঃ একই কবির। তার প্রমাণ, এই তিন ভণিতার পদেই শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনকে বন্দনা করা হয়েছে। এই কবি ছিলেন রঘুনন্দনের শিষ্য। গোপালদাস-রসিকদাসের শাখানির্ণয়ে রঘুনন্দনের অষ্টম শাখায় 'কবিশেখরের' নাম পাওয়া যায়।

কবিশেখরের নামে বিচ্ছিন্ন পদ ছাড়া দু'খানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'। এতে কৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কবিশেখর, শেখর ও রায়শেখর তিন ভণিতাই পাওয়া যায়। অপরটি হচ্ছে গোপালবিজয়। এর সূচনায় কবি এই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন,

তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত। তবে কৈল গোপালের কীর্ত্তন-অমৃত ॥
গোপীনাথবিজয় নাটক কৈল আর। তবু গোপবেশে মন না পুরে আমার ॥
তবেই পাঁচালি করি গোপালবিজয়ে। বৈষ্ণব জনের রেণু ধরিয়া হৃদয়ে ॥
সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন। শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন ॥
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হারাবতি। কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি ॥

কারও কারও মতে গোপালবিজয় অন্য এক কবিশেখরের রচনা। কিন্তু এ মত সমর্থন করা যায় না। কারণ গোপালবিজয়ে খুব অল্প হলেও, শেখর ও রায়শেখর ভণিতা পাওয়া যায়। যেমন,

শেখর যে কহে গোপালবিজয়ে শুনিতে অতি রসাল।

—বা. সা. ই. ১।১, পৃঃ ৪০৫, পা. টী.

মন্দ সুবর্ণে কভু জোউ নাহি রহে। রায়শেখর তাহা দেখিল কথা কহে ॥

—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬১ নং পুঁথি, ৮৫ পত্র

এছাড়া, 'গোপালবিজয়' ও 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'র ভণিতার ধরণে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। 'গোপালবিজয়ে'র বিভিন্ন পুঁথি থেকে এবং 'দণ্ডাত্মিকা'

পদাবলীর বৃন্দাবন থেকে প্রকাশিত সংস্করণ (১৯০২) থেকে কয়েকটি মাত্র ভণিতা উদ্ধৃত করে এই সাদৃশ্য দেখাচ্ছি।

গোপালবিজয় :—

(১) গোপালবিজয় নর শুন একমনে। কহে কবিশেখর অমৃত বরিষণে ॥

(২) কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি। হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাষাবলী॥

(৩) দানপ্রবন্ধকথা শুন সর্ব্বজনে। কহে কবিশেখর অমৃত বরিষণে ॥

(৪) কহে কবিশেখর সরসবচনে। হাসিতে নাচিতে পারে নন্দের নন্দনে ॥

দণ্ডাত্মিকা-পদাবলী :—

(১) অলকা তিলক দেই চমকি নেহারি। কহে কবিশেখর জাও বলিহারি ॥

(২) কহ কবিশেখর রাই না করিহ ডর। গোপতে ভুঞ্জিবে সুখ কি জানিবে নর ॥

(৩) কহে কবিশেখর শুন সখীগণ। জয়পরাজয় দেখ হইয়া মহাজন ॥

(৪) কহে কবিশেখর করি অনুমানে। এতিখনে দুহুঁজনে করলি সিনানে ॥

কবিশেখর-ভণিতাযুক্ত একটি পদে আছে, "বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর কবিশেখর ইহ রস গায় ॥" এর সঙ্গে গোপালবিজয়ের "বৃন্দাবন ভরি রসের বাদলে তাহে প্রেমতরঙ্গেতে অধিক উথলে ॥" উক্তির চমৎকার মিল আছে (বা. সা, ই., ১১. পৃ: ৪১৩ দ্র:)।

রায়শেখর-কবিশেখর ও গোপালবিজয়-কার কবিশেখর যে একই লোক এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আর একটি যুক্তি দেখানো যেতে পারে। রামগোপাল দাস রসিকদাসের সহযোগিতায় যে 'শাখা নির্ণয়' লিখেছিলেন, তাতে মাত্র একজন কবিশেখরের নামই উল্লিখিত হয়েছে। এই কবিশেখরকে রঘুনন্দনের শিষ্য বলে তাঁর লেখা রঘুনন্দন-বন্দনা পদ উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। অথচ রামগোপালদাস তাঁর 'রসকল্পবল্লী'-তে 'গোপালবিজয়ে'র কতকাংশ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি দুই কবিশেখরের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখা 'শাখানির্ণয়ে' যখন মাত্র একজন কবিশেখরের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি দুই কবিশেখরকে অভিন্ন বলেই জানতেন। রামগোপালদাস সপ্তদশ শতাব্দীর লোক, সুতরাং এবিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'গোপালবিজয়ে'র রচনাকাল সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকেও এই কাব্য রঘুনন্দনের শিষ্য কবিশেখরের রচনা বলে মনে হয়। একদিকে গোপাল-বিজয়ের 'গোপী-অনুগতি' ভাব, অপরদিকে "বৈষ্ণব জনের রেণু ধরিয়া হৃদয়ে,"

"হের শুন রাধা আদি পরমবল্লভা" প্রভৃতি উক্তি থেকে বোঝা যায় এই কাব্য চৈতন্যপরবর্তী সময়ের রচনা। তেমনি বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথির লিপিকাল থেকে জানা যায় এই কাব্য ১৬০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ের রচনা নয়। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬৫ নং পুঁথি। এর লিপিকাল "সকাব্দাঃ ॥ ১৫৯৫"। কিন্তু এতে আদর্শ পুঁথির লিপিকালটিও পাওয়া যায়— "শাকে গজাব্ধি সর (শর) চন্দ্রমিতে মুকুন্দ জষঃ (যশঃ) প্রদেন শ্রীনরোত্তম-নন্দীলিখিত পুস্তক গোপালবিজয়সিষ্ট (শিষ্ট) জনবন্দনায় ॥" 'শাকে গজাব্ধি শরচন্দ্র' অর্থাৎ ১৫৪৮ শক=১৬২৬-২৭ খৃঃ। অপর একটি পুঁথি সম্বন্ধে ৺শিবরতন মিত্র লিখেছেন, "লেখকের 'রতন লাইব্রেরী'তেও এই গ্রন্থের (গোপালবিজয়ের) একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।…এই পুঁথিটির হস্তলিপি তারিখ ১৫৩৫ শকাব্দা (=১৬১৩-১৪ খৃঃ)।" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক, পৃঃ ৫৬) সুতরাং সময়ের বিচারেও 'গোপালবিজয়' রঘুনন্দনের শিষ্য কবিশেখরের রচনা বলেই প্রতীত হয়।

এই সমস্ত কারণে আমরা 'গোপালবিজয়'কে আলোচ্য কবিশেখরের রচনা বলেই সিদ্ধান্ত করছি। 'গোপালবিজয়ে'র উপক্রমে উল্লিখিত 'গোপালের কীর্ত্তন অমৃত' এবং 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' অভিন্ন বলে মনে হয়। 'গোপাল-বিজয়' ও 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' কোনটিতেই কবির গুরু রঘুনন্দনের উল্লেখ পাওয়া যায় না, এটি একটি লক্ষণীয় বিষয়। সম্ভবতঃ এই সমস্ত গ্রন্থ রচনার পরে কবি রঘুনন্দনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

এবার আর একটি বিষয়ের আলোচনা করছি। রামগোপাল দাস রঘু-নন্দনের শাখানির্ণয়ে লিখেছেন,

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ড বাসী। যাহার কবিতাগীতে ত্রিভুবন ভাসি ॥
তাঁর হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়। প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দড় ॥

ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি। যাহার কবিতা গানে ঘুচয়ে দুর্গতি ॥

ডঃ সুকুমার সেন এই কবিরঞ্জন বা ছোট বিদ্যাপতিকে আমাদের আলোচ্য কবিশেখরের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। তিনি লিখেছেন, "কবিশেখর ও কবিরঞ্জন দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ধরিতে আমাদের আপত্তি আছে। দুই জনেই বৈদ্য, শ্রীখণ্ড বাসী, রঘুনন্দনের শিষ্য; দুই জনেই পদ লিখিয়াছেন একই রীতিতে।……আমার মনে হয় কবিরঞ্জন কবিশেখরেরই নামান্তর বা

উপাধিভেদ।* ডঃ সেন তাঁর মত সমর্থনে কয়েকটি অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ২১৯-২২১)। ডঃ শহীদুল্লাহ 'বিদ্যাপতি-শতকে'র ভূমিকায় ডঃ সেনের অভিমত সমর্থন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, "(নগেন্দ্রনাথ) গুপ্ত মহাশয়ের (বিদ্যাপতি-পদ-সংগ্রহের) ৫৩৩ ও ৫৩৪ নং পদ দুটি যে একই কবির রচনা, তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ৫৩৩ নং পদের ভণিতায় কবিশেখর এবং ৫৩৪ নং পদের ভণিতায় বিদ্যাপতি।" পদ দুটিতে জটিলা-কুটিলার উল্লেখ থাকায় তারা মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা হতে পারে না। এরা যে কোন বাঙালী কবির লেখা, তা সহজেই বোঝা যায়। 'কবিরঞ্জন' ভিন্ন অন্য কোন বাঙালী 'বিদ্যাপতি' কবির সন্ধান আমরা জানি না। সুতরাং এই দুই পদ কবিরঞ্জনের লেখা এবং তাঁর 'কবিশেখর' উপাধিও ছিল বলে মনে হয়। এই সমস্ত বিষয় মিলিয়ে দেখলে কবিশেখর ও কবিরঞ্জন একই লোক বলে মনে হয়।

এখন এই কবিশেখর বা কবিরঞ্জন বা বাঙালী বিদ্যাপতির জীবৎকাল সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণের চেষ্টা করা যাক্। ইনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য, সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর লোক। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক না শেষ দিক, তা স্থির করা দরকার। রামগোপালদাস তাঁর 'রসকল্পবল্লী'তে লিখেছেন,

জসরাজ খান দামোদর মহাকবি। কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী॥

এর থেকে জানা যায়, যশোরাজ খান, দামোদর ও কবিরঞ্জন তিন জনেই রাজ-দরবারে কাজ করতেন। যশোরাজ খানের লেখা "এক পয়োধর চন্দন লেপিত" পদের ভণিতায় "শ্রীযুক্ত হুসন জগত ভূষণ" এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) দরবারে কাজ করতেন বলে মনে হয়। দামোদর গোবিন্দদাসের মাতামহ, সুতরাং তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক এবং তিনিও সম্ভবতঃ হোসেন শাহেরই কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং উদ্ধৃত তালিকায় উল্লিখিত তৃতীয় কবি কবিরঞ্জনও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক ও হোসেন শাহী আমলের রাজকর্মচারী ছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। এই ধারণার সমর্থন পাচ্ছি 'বিদ্যাপতি ও 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদের ভণিতা থেকে। ভণিতাগুলি নীচে উদ্ধৃত করছি,

(১) বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি চিরেজিব জীবথু গ্যাসদীন সুরতান ॥

(২) বিদ্যাপতি ভানি অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসীর মধুপ ভুলে কমল বাণী ॥
শাহ হুসেন অনুমানে যারে হানল মদনবাণে
চিরঞ্জীবী হউ পঞ্চ-গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥

(৩) কবিশেখর ভন অপরূপ রূপ দেখি। রাএ নসরৎ শাহ ভুললি কমলমুখি॥

তৃতীয় ভণিতাটি রাগতরঙ্গিণীর একটি পদে পাওয়া যায়। পদটির নীচে রাগতরঙ্গিণী-কার লোচন লিখেছেন, "ইতি বিদ্যাপতেঃ।"

এই তিনটি ভণিতাকে অনেকে মৈথিল বিদ্যাপতির বলে মনে করেন। তাঁদের মতে এই ভণিতাগুলিতে উল্লিখিত 'গ্যাসদীন সুরতান' বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০ খৃঃ) বা দিল্লীর সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন তোঘলক (১৩৯৩ খৃঃ); 'শাহ নসীর' বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ (? ১৪৩৫-১৪৫৯ খৃঃ) 'নসরৎ শাহ' দিল্লীর সুলতান নসরৎ শাহ (১৩৯৫-১৩৯৯ খৃঃ) এবং 'শাহ হুসেন' জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ (সিংহাসনে আরোহণ ১৪৫৮ খৃঃ)। কিন্তু এই মতের ভিত্তি দৃঢ় নয়। মৈথিল বিদ্যাপতি তাঁর পদের ভণিতায় ভিন্ন দেশের সুলতানদের প্রশস্তি করবেন কেন, তার কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কারণে আমাদের মনে হয় এই পদগুলি বাঙালী বিদ্যাপতি বা রঘুনন্দনের শিষ্য কবিশেখরের রচনা এবং উদ্ধৃত ভণিতাগুলিতে উল্লিখিত 'শাহ হুসেন' বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ), 'শাহ নসীর' ও 'নসরৎ শাহ' তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২খৃঃ) এবং 'গ্যাসদীন সুলতান' হুসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খৃঃ)। এই সমস্ত পদগুলির কোন কোনটি কেবলমাত্র মিথিলায় পাওয়া গেলেও এগুলি বাঙালী কবির লেখা নয় বলা চলে না, কারণ মৈথিল বিদ্যাপতির পদ যেমন বাংলায় এসেছে, বাঙালী কবির পদও তেমনি মিথিলায় যেতে পারে। এই পদগুলির ভাষা ও ছন্দ বাংলা-ঘেঁষা।

সুতরাং আমরা এখন বলতে পারি, রঘুনন্দনের শিষ্য কবিশেখর হোসেন শাহী সুলতানদের অধীনে কাজ করতেন। তিনি ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে কাব্য রচনা

করেছিলেন। রঘুনন্দনের আনুমানিক জীবৎকাল ১৪৯৫-১৫৮০। তাতে কিন্তু কিছু আসে যায় না, কারণ গুরুশিষ্যের সমবয়সী হবার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত মহাজনদের তালিকায় কবিশেখরের নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৫৭০ খৃঃর আগে তিনি পরলোকগমন করেছিলেন বলে মনে হয়।

॥ সতের ॥

বৃন্দাবনদাস

বৃন্দাবনদাস সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় চৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে'র কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্যে এই গ্রন্থ বাঙালীর এক অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য। প্রথমতঃ, এত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ আর একটিও পাওয়া যায় না, যার প্রায় ষোল আনা অংশই বিশুদ্ধ ও অবিকৃত আকারে আমাদের হাতে পৌঁছেছে; এপর্যন্ত চৈতন্য-ভাগবতের শত শত পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে পাঠভেদ খুবই অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয়তঃ, এইটিই সর্বপ্রথম বাংলা গ্রন্থ, যাতে দেবদেবী বা পৌরাণিক চরিত্রের বদলে একজন মানুষের জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ বাঙালী কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দেখেছেন; তাঁদের এই মত অবশ্য আমরা সমর্থন করতে পারি না। বৃন্দাবনদাস ও তাঁর অনুবর্তী চরিতকাররা চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান বলেই জানতেন। কাজেই যে মনো-ভাব নিয়ে বাঙালী কবিরা শ্রীকৃষ্ণ, চণ্ডী, মনসা, প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, তার সঙ্গে এঁদের মনোভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য আমি দেখি না। মানুষ শ্রীচৈতন্যের জীবনকে যে এঁরা বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা করেছেন, তার কারণ এঁদের বাস্তবনিষ্ঠতা নয়, ভগবানের অন্যান্য লীলার মত নরলীলাকেও অবিকলভাবে চিত্রিত করবার অভিলাষ।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এর মধ্যে তদানীন্তন সমাজের বিশদ ও অবিকল প্রতিফলন। সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে এত অজস্র তথ্য এর পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে যে একবার চোখ বুলোলেও বহু বিষয় জানা যায়। ছোটখাট দু একটি উক্তির মধ্যে দিয়ে বৃন্দাবনদাস কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা ভাবতে অবাক লাগে। এর একটি দৃষ্টান্ত দিই। 'চৈতন্যভাগবত' মধ্যখণ্ডের ২৩শ ও ২৪শ অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে গদাধর। সে পাপিষ্ঠ নহে কভু অদ্বৈত কিঙ্কর ॥

এর থেকে আমরা জানতে পারি, সে সময় চৈতন্যদেবের অনুবর্তী বৈষ্ণবসম্প্রদায় নানা দলে বিভক্ত হয়েছিল ; অদ্বৈতের একদল ভক্ত গদাধরের নিন্দা করতেন এবং তাতে অদ্বৈতের প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছিল না।

বৃন্দাবনদাস স্পষ্টভাবে 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল জানাননি। সুতরাং বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে আমরা এই বইএর রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

শ্রীচৈতন্যদেব গয়া থেকে ফেরার পরে যে সময় নবদ্বীপে লীলাকীর্তনাদি করছিলেন, তখন বৃন্দাবনের জননী নারায়ণী তাঁর কৃপা লাভ করেন। বৃন্দাবনদাস নিজে বলেছেন যে নারায়ণীর বয়স ঐ সময় ছিল চার বছর ("চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত")। ঐ সময় মহাপ্রভুর বয়স ২৩ বছর। সুতরাং মহাপ্রভুর ১৯ বছর বয়সের সময় অর্থাৎ ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন-দাসের জননী নারায়ণীর জন্ম হয়। নারায়ণীর মাত্র ১৩ বছর বয়সের সময় বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়েছিল ধরলেও বৃন্দাবনদাসের জন্মসাল হয় ১৫১৮ খৃঃ। আর বৃন্দাবনদাস মাত্র ২০ বছর বয়সে চৈতন্যভাগবত রচনা করেছিলেন ধরলেও চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল হয় ১৫৩৮ খৃঃ।

কেউ কেউ মনে করেন মহাপ্রভুর জীবৎকালেই চৈতন্যভাগবত সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর মৃত্যুর সময় বৃন্দাবনদাসের বয়স কোন মতেই ১৫ বছরের বেশী হয় না। তাছাড়া বৃন্দাবনদাস গ্রন্থের সুরুতে চৈতন্যলীলার সূত্র বর্ণন প্রসঙ্গে লিখেছেন যে মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে যান। সেখান থেকে নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন,

শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়। ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায়॥

ভ্রমণপর্ব শেষ হলে,

শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন। অহর্নিশ করিলেন হরি সঙ্কীর্ত্তন॥

শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহা মহেশ্বর। নীলাচলে বাস অষ্টাদশ সম্বৎসর॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে, সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু ছ' বছর তীর্থভ্রমণ করে ১৮ বছর নীলাচলে বাস করেন এবং তার পর লীলাসংবরণ করেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্টভাবে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর

কথা উল্লিখিত না হলেও পরোক্ষভাবে হয়েছে। এই দুই কারণে চৈতন্য-দেবের জীবৎকালে চৈতন্যভাগবত রচিত হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না।

চৈতন্যভাগবত রচিত হবার সময়ে নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২২শ অধ্যায়ের এই উক্তি দেখে আমাদের মনে হয়, নিত্যানন্দ ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন না,

নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার। কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিতাই। দেখিব কি পারিষদ সঙ্গে এক ঠাঁই॥

যাহোক্, চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল নির্ণয়ের পক্ষে এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ ঠিক্ কোন্ সময়ে নিত্যানন্দ পরলোক গমন করেন, তা জানা নেই।

বৃন্দাবনদাস মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, "গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকটি মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে উদ্ধৃত। মুরারি গুপ্তের রামাষ্টকের পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকও বৃন্দাবনদাস উদ্ধার করিয়াছেন।" এছাড়া তাঁর গ্রন্থের অনেক অংশ মুরারির গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদ বলে মনে হয়। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর দু' তিন বছর বাদে লেখা হয়। সুতরাং এদিক দিয়েও ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের পরে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়েছিল বলে স্বীকার করতে হয়।

চৈতন্যভাগবতের রচনাকালের উর্ধ্বতম সীমা নিধারণ করা গেল। অধস্তম সীমা নির্ধারণ করা যায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল থেকে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে,

আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি। বৃন্দাবনদাস প্রচারিলা সর্ব্বোপরি॥

এখানে 'সর্ব্বোপরি' কথাটি লক্ষ্য করবার মত। চৈতন্যভাগবত রচনার পর অন্ততঃ ১০ বছর অতিবাহিত না হলে এইভাবে অপর কবির সশ্রদ্ধ উল্লেখ লাভ তার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু জয়ানন্দ "বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদ মালা পাঞা" গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর থেকে মনে করা যেতে পারে, চৈতন্যভাগবত রচনার সময় বীরভদ্র বালক ছিলেন, কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থরচনার সময় তিনি পূর্ণবয়স্ক। এই হিসাবে দুই গ্রন্থের রচনার মধ্যে অন্ততঃ ১০ বছর ব্যবধান না ধরে উপায় নেই। জয়ানন্দ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা দেখাব যে তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকালের অধস্তম সীমা ১৫৬০ খৃঃ। সুতরাং চৈতন্যভাগবতের রচনাকালের নিম্নতম সীমা ১৫৫০ খৃঃ। সুতরাং

১৫৩৮ থেকে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের ভিতর বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। ঐ সময় তাঁর বয়স ২০ থেকে ৩২ এর মধ্যে ছিল। চৈতন্যভাগবত যে যুবকের রচনা, তা বইটির বর্ণনা থেকেও বোঝা যায়।

চৈতন্যভাগবতের আকস্মিক পরিসমাপ্তি থেকে মনে হয় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়নি। অম্বিকানাথ ব্রহ্মচারী "চৈতন্যভাগবতের অবশিষ্ট অধ্যায়ত্রয়" নাম দিয়ে যা প্রকাশ করেছিলেন, তা যে বৃন্দাবনদাসের লেখা নয় তা বিশেষজ্ঞেরা প্রমাণ করেছেন। অম্বিকানাথ এক পুঁথিতে চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল নির্দেশক এই শ্লোকটি দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন।

চৌদ্দশত সাতানব্বই শকের গণন। নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হইল সমাপন॥

কিন্তু ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে বৃন্দাবনদাসকে 'বেদব্যাস' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, চৈতন্যভাগবত রচনার জন্যই বৃন্দাবনদাস বেদব্যাসের মর্যাদা লাভ করেছেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে যদি চৈতন্যভাগবত রচিত হয়, তাহলে বলতে হবে চৈতন্যভাগবত লেখা হতে না হতেই বৃন্দাবনদাস 'বেদব্যাস' আখ্যা লাভ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনীরচনা ছাড়া বৃন্দাবনদাসের এই উপাধি লাভের আর কোন কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী কর্তৃক উদ্ধৃত রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকটি যে চৈতন্যভাগবতের শেষে থাকতে পারে না, তা সহজেই বোঝা যায়। চৈতন্যভাগবত অসমাপ্ত গ্রন্থ। সুতরাং বৃন্দাবনদাস 'গ্রন্থ হৈল সমাপন' লিখতে পারেন না। অম্বিকাচরণ প্রকাশিত চৈতন্যভাগবতের অতিরিক্ত তিনটি অধ্যায়ের মত তাঁর আবিষ্কৃত রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটিও অন্য লোকের কল্পনার সৃষ্টি, বৃন্দাবনদাসের রচনা নয়।

॥ আঠার ॥

জয়ানন্দ

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হলেও নানা কারণে সর্বসাধারণের মধ্যে তেমন প্রচার লাভ করেনি। জয়ানন্দ নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না বলে বৈষ্ণব সমাজেও তাঁর গ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। এক যদুনাথ দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃত' ছাড়া অন্যত্র তাঁর নাম পাওয়া যায় না। অবশ্য তাঁর পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ করেছেন।

নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব লেখকদের রচিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে জয়ানন্দের বর্ণনার অনেক ক্ষেত্রে অমিল দেখা যায়। কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে যে জয়ানন্দই ভুল করেছেন, বিনা প্রমাণে এমন কথা বলা চলে না। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক তথ্য একমাত্র জয়ানন্দই সঠিকভাবে পরিবেশন করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চৈতন্যদেবের জন্মের রাত্রিতে যে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল. একথা অনেক চরিতকারই লিখেছেন, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ সর্বগ্রাস না আংশিক, সে কথা আর কেউ বলেননি। একমাত্র জয়ানন্দই বলেছেন,

প্রথমে প্রভুর জন্ম কর্ম্ম সুপ্রকাশ। ফাল্গুন মাসে রাহু চন্দ্রে সর্বগ্রাস ॥

এখন জ্যোতিষিক গণনার ফলে নিশ্চিত ভাবে জানা গিয়েছে যে ঐদিন সর্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণই হয়েছিল। লোচনদাস বলেন, আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথি রবিবারে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়েছিল। ঐ সপ্তমী যে শুক্লা সপ্তমী, তা জ্যোতিষগণনা করে জানা যায়। জয়ানন্দ সোজাসুজি 'আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা' বলে নিজের উক্তির অভ্রান্ততার প্রমাণ রেখে গেছেন। জয়ানন্দ মহাপ্রভুর ভ্রমণপথের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তাও নানা সূত্র থেকে সমর্থিত হয়।

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল জানাননি। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমাদের আনুষঙ্গিক প্রমাণ থেকে রচনাকালটি নির্ণয় করতে হবে।

জয়ানন্দ লিখেছেন যে চৈতন্যদেব যখন নীলাচল থেকে স্থলপথে গৌড়ে আসেন, তখন তিনি তাঁর পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের ঘরে একদিনের জন্যে আতিথ্য-

গ্রহণ করেন। জয়ানন্দ তখন নিতান্ত শিশু, কারণ তাঁর মা তাঁকে কোলে নিয়ে রান্না করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য শিশু জয়ানন্দকে আশীর্বাদ করেন, 'জয়ানন্দ' নামটিও তাঁরই দেওয়া। কেউ কেউ জয়ানন্দের এই বিবরণের অবিকল যাথার্থ্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "শ্রীচৈতন্যের জলপথে গৌড়ে আসাই অধিক সম্ভব।······সেই জন্য মনে হয় গৌড়ে আসার সময় অপেক্ষা গৌড় হইতে ফেরার সময় শ্রীচৈতন্যের আমাইপুরা যাওয়া অধিকতর সম্ভব।" কিন্তু এই মত স্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রীচৈতন্যের জলপথে নীলাচল থেকে গৌড়ে আসার কথা কেবল মাত্র কবিকর্ণপুর লিখেছেন। কবিকর্ণপুরের মতে শ্রীচৈতন্য উৎকল-সীমান্ত থেকে জলপথে রওনা হয়ে প্রথমে পাণিহাটি গ্রামে আসেন। সেখান থেকে কুমারহট্ট, সেখান থেকে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া, সেখান থেকে নবদ্বীপের ওপারে কুলিয়া গ্রামে যান। কিন্তু চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত, নিত্যানন্দের শিষ্য বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দ তিনজনেই একবাক্যে বলেছেন যে, প্রভু প্রথমে কুলিয়ায় বিদ্যাবাচস্পতির বাড়ীতে এসে নবদ্বীপের লোকদের দর্শন দান করেন। তারপর রামকেলি বা কৃষ্ণকেলিতে যান। বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দের মতে সেখান থেকে ফিরে মহাপ্রভু শান্তিপুরে, সেখান থেকে কুমারহট্টে, সেখান থেকে বরাহনগরে আসেন। বিমানবাবু লিখেছেন, "রাস্তাঘাট-সম্বন্ধে ভাবোন্মত্ত নিত্যানন্দ অপেক্ষা গৌড়ীয় যাত্রিগণের পথপ্রদর্শক শিবানন্দ সেনের পুত্রের কথা অধিক নির্ভরযোগ্য।" একথার তাৎপর্য বুঝলাম না। শিবানন্দ গৌড়ীয় যাত্রীদের পথপ্রদর্শক হতে পারেন, কিন্তু মহাপ্রভুকে তো পথ দেখিয়ে নীলাচল থেকে গৌড়ে নিয়ে আসেননি। মহাপ্রভুর নীলাচল থেকে গৌড়ে আগমনের সময় কবিকর্ণপুরের জন্ম হয়নি, সুতরাং তাঁর কথা এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়।

জয়ানন্দের উক্তিকে মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস পরোক্ষে সমর্থন করেছেন বিদ্যাবাচস্পতির বাড়ীতে মহাপ্রভুর প্রথম আসার কথা লিখে। বিমানবিহারী-বাবু নিজেই একথা স্বীকার করে লিখেছেন, "যদি জয়ানন্দের মত অনুসরণ করিয়া ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রভু জলেশ্বর ও দাঁতন হইয়া মন্দারণ পরগণা এবং বর্দ্ধমানের মধ্য দিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস কেন প্রথমেই শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপের অপর পারে আসার কথা বলিলেন তাহার কারণ বুঝা যায়।" সুতরাং জয়ানন্দ-বর্ণিত পথেই যে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে গৌড়ে এসেছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের

কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু এসম্বন্ধে বিমানবাবু বলেন, "ওড্রদেশের সীমা হইতে জলপথে পানিহাটীতে না আসিয়া শ্রীচৈতন্য কি স্থলপথে—অত্যন্ত ঘোরা পথে—নবদ্বীপের নিকটে আসিয়াছিলেন?" একথারও তাৎপর্য বুঝলাম না। তখন প্রধানতঃ স্থলপথেই নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে আসা যাওয়া চলত। কবিকর্ণপুর তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের একাদশ সর্গে মহাপ্রভুর এবং চতুর্দশ সর্গে ভক্তদের বাংলা থেকে স্থলপথে নীলাচলে যাওয়ারই বর্ণনা দিয়েছেন। আর মহাপ্রভু যখন নীলাচল থেকে গৌড়ে এসেছিলেন, তখন তাঁর শুধু মাত্র আগমন নয়, সেই সঙ্গে ভ্রমণ এবং বিভিন্ন জায়গার ভক্তদের সঙ্গে মিলনও সম্ভবতঃ উদ্দেশ্য ছিল। জলপথে বা সহজ পথে না আসার এও একটা কারণ হতে পারে। যাহোক্, বিমানবাবুর যুক্তি খুব দৃঢ় বলে মনে হয় না। সুতরাং মহাপ্রভুর ভ্রমণ-পথ সম্বন্ধে জয়ানন্দ যে বিবরণ দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের বাড়ীতে মহাপ্রভুর পদার্পণ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ দেখি না। আমরা আগে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, শ্রীচৈতন্য ১৪৩৬ শক বা ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে নীলাচল থেকে গৌড়ে এসেছিলেন। ঐ সময়ে জয়ানন্দের বয়স তিন চার বছরের মত ধরলে তাঁর জন্ম-সাল হয় প্রায় ১৫১০ খৃষ্টাব্দ। বৃন্দাবনদাস তাঁর আগে চৈতন্যচরিতগ্রন্থ লিখলেও তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন, কারণ বৃন্দাবনদাসের মা নারায়ণীর জন্ম-সাল ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের আগে লেখা হয়নি। বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দের গ্রন্থরচনার মধ্যে অন্ততঃ ১০ বছর ব্যবধান ছিল, তা 'বৃন্দাবনদাস' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখিয়েছি। সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দের আগে লেখা নয়।

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্য-দ্বেষী খুড়ো-জ্যাঠার নাম করে তাঁদের 'পাষণ্ড' বলেছেন,

খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্প ভক্তি। মহা পাষণ্ড তবো ধরে মহা শক্তি॥

এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় তাঁর খুড়ো ও জ্যাঠা ঐ সময় সশরীরে বর্তমান ছিলেন। যে লোকের জ্যাঠা বেঁচে থাকে, তার বয়স ৫০ বছরের বেশী ধরা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। সুতরাং ১৫১০+৫০=১৫৬০ খৃষ্টাব্দের পরে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়নি।

অতএব জয়ানন্দ ১৫৪৮ থেকে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা গেল।

॥ উনিশ ॥

লোচনদাস

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলকে মৌলিক গ্রন্থ বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ এর প্রায় বারো আনা অংশই মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ। লোচনদাসের সংযোজিত অংশগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সন্দেহের অতীত নয়।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের আনুমানিক রচনাকাল স্থির করা খুব কঠিন নয়। তাঁর গুরু ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরহরি সরকার। এই নরহরি চৈতন্যদেবের জন্মের আগেই "ব্রজরস গান" করেছিলেন বলে রায়-শেখরের নামাঙ্কিত পদে পাওয়া যায়। যাহোক্, ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পরে নরহরি সরকার জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর শিষ্য লোচনদাসের জন্ম ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের পরে নিশ্চয়ই হয়নি। সুতরাং তাঁর গ্রন্থরচনাকাল ১৬০০ খৃঃর পরবর্তী নয়। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচনার সময় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কেননা চৈতন্যমঙ্গলে আছে,

বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে। জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে॥

সুতরাং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনার পরে অন্ততঃ এক পুরুষ অতিক্রান্ত হবার পরে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ১৫৩৮ থেকে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি। সুতরাং লোচনদাসের গ্রন্থের রচনাকালের উর্ধ্বতম সীমা হয় ১৫৬০ খৃঃ।

॥ কুড়ি ॥

চূড়ামণিদাস

চূড়ামণিদাসের লেখা চৈতন্যচরিতগ্রন্থ আজও পর্যন্ত অপ্রকাশিত রয়েছে, তবে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে শীঘ্রই বইখানি প্রকাশিত হচ্ছে বলে শুনেছি। ১৩০২ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজে এই গ্রন্থের পরিচয় দান করেন (বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৩৮৫) এবং বিশ্বকোষে 'চৈতন্যচন্দ্র' শীর্ষক আলোচনায় (বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৪০৫-৪৬৩) এই বই থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃতও করেন। তাঁর পরে দীনেশচন্দ্র সেন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নানা উপলক্ষে চূড়ামণিদাসের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেননি। পরে ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) এবং ১৩৬০ সালের বিশ্বভারতী পত্রিকায় এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি অবলম্বনে এই গ্রন্থের পরিচয় দেন এবং দেখান যে, এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'গৌরাঙ্গবিজয়'।

চূড়ামণিদাস লিখেছেন যে মহাপ্রভুর জন্মের খবর শুনে বৌদ্ধেরাও আনন্দিত হয়েছিলেন। এর থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু অনুমান করেন যে, চৈতন্যভক্ত হলেও চূড়ামণিদাস প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। চূড়ামণিদাসের গুরু ছিলেন চৈতন্যদেবের পার্ষদ ধনঞ্জয় পণ্ডিত। একথা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই জানা যায়। তিনি ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও নিত্যানন্দের কাছে তাঁর গ্রন্থের উপকরণ পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন।

চূড়ামণিদাসের গ্রন্থ অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। চূড়ামণিদাসের মতে বাল্যকাল থেকেই চৈতন্যদেবের অলৌকিক মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই সময়েই নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান। তারপর, মাধবেন্দ্র পুরী চর্মচক্ষে কৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন ও তাঁরই অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই জাতীয় অনৈসর্গিক ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত চূড়ামণিদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। চূড়ামণিদাস বহু ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট

ভুল খবরও দিয়েছেন। যেমন "চূড়ামণিদাস বলেন যে, চৈতন্যের জন্মনক্ষত্র রোহিণী ও জন্মরাশি বৃষ এই কারণে গণক রাশি অনুসারে ইহার নাম বিশ্বম্ভর রাখিয়াছিল। কিন্তু একথা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক, চৈতন্য রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহা হইলে সেই দিন কখনই চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারিত না।" (বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৪১১) এই সব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, চূড়ামণিদাস বিশুদ্ধ ভক্তের দৃষ্টি নিয়ে চৈতন্য-চরিত বর্ণনা করে গেছেন, ইতিহাসবোধ তাঁর একেবারেই ছিল না। সুতরাং চূড়ামণিদাসের যেসব কথার পিছনে অন্য কোন সূত্রের সমর্থন নেই, তাদের তথ্য বলে গ্রহণ করা নিরাপদ হবে না।

চূড়ামণিদাসের গ্রন্থে অলৌকিক বর্ণনার আতিশয্য থেকে মনে হয়, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর অনেকদিন পরে, যখন চৈতন্যদেব ভক্তের কাছে মানুষ বলে গণ্য না হয়ে দেবতা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছিলেন, সেই সময়ে চূড়ামণিদাস এই বই লিখেছিলেন। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে এই বই লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ও নিত্যানন্দের সঙ্গলাভকারীর পক্ষে ততদিন বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব।

॥ একুশ ॥

শ্রীনিবাস আচার্য

শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যাঁদের চেষ্টায় বাংলাদেশে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, শ্রীনিবাস আচার্যের স্থান তাঁদের পুরোভাগে। মহাপ্রভুর জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে প্রথম স্ফুরণ, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের লেখনীতে যার পূর্ণ রূপায়ণ, সেই ধর্মকে তার আদি উৎসভূমির লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন শ্রীনিবাস আচার্য। অন্য কেউ এ কাজ এত সার্থকভাবে করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এই অনন্যসাধারণ মহাপুরুষের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অল্প। তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সময়ও আজ পর্যন্ত সর্ববাদিসম্মত ভাবে নিরূপণ করা হয়নি। আমাদের পক্ষে সে চেষ্টা করা অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ শ্রীনিবাস আচার্য শুধু শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, একজন উচ্চশ্রেণীর পদকর্তাও ছিলেন। তাঁর লেখা যে ক'টি পদ পাওয়া গিয়েছে, সবগুলিই অতি চমৎকার।

প্রথমে, যে সূত্রগুলির মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। এদের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে প্রেমবিলাস। এর লেখক নিত্যানন্দদাস লিখেছেন যে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর আজ্ঞায় এই বই লিখেছেন। সমসাময়িক গ্রন্থকার গুরুচরণদাসের প্রেমামৃতে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কোন কোন পুঁথিতে নাকি বইটির রচনাকাল দেওয়া আছে ১৫২২ শক=১৬০০-১৬০১ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু বইটি বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে শেষ চারটি "বিলাস" বা অধ্যায় নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত। বাকী অংশেও অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান আছে।

গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃতেও শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী দেওয়া আছে। কিন্তু এই বইএর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে, সম্পূর্ণ বইটি এখনও ছাপা হয়নি।

আর একটি বই হচ্ছে যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ। এর রচনাকাল নাকি ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ। বইটির অকৃত্রিমতা (অন্ততঃ সর্বাংশে) সন্দেহের বিষয়।

এছাড়া মনোহরদাসের 'অনুরাগবল্লী'তে শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বইটির লেখক শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যপুত্রের শিষ্য। রচনাকাল ১৭৫৩ সংবৎ ও ১৬১৮ শকাব্দের চৈত্রমাস=১৬৯৭ খৃঃ। বইটির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের প্রায় ১০০ বছর পরে রচিত বলে এর সাক্ষ্যকে গ্রহণ করবার আগে যাচাই করে নিতে হবে।

তারপর, নরহরি চক্রবর্তী রচিত ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে, বিশেষতঃ ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস আচার্যের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। নরহরি শ্রীনিবাসচরিত্র নামে আর একটি বই লিখেছিলেন, ভক্তি-রত্নাকরে তার উল্লেখ আছে, কিন্তু বইটি পাওয়া যায়নি। নরহরি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্যের পুত্র। বিশ্বনাথ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ভাগবতের টীকা রচনা করেছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে 'অনুরাগবল্লী'র উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে। সুতরাং ভক্তিরত্নাকরের রচনাকাল ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ধরা যায়। নরোত্তমবিলাস তার পরের রচনা।

নরহরির ঐতিহাসিক চেতনা ও তথ্যপ্রমাণনিষ্ঠা সেযুগের পক্ষে বিস্ময়কর। যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন, প্রায় ক্ষেত্রেই তার স্বপক্ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, তিনি জীব গোস্বামী ও বীরভদ্র গোস্বামীর কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। আধুনিকপূর্ব যুগে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর মেলেনা বললেই হয়। এরকম লোক শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, সমসাময়িক না হলেও তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেখানে প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের উক্তির সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরের উক্তির মিল আছে, তাকে সত্য বলেই মানতে হবে।

ভক্তিরত্নাকর অবলম্বনে আমরা নীচে শ্রীনিবাস আচার্যের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করলাম।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কয়েক বছর পরে শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম হয়। বাল্যবয়সে তাঁর সঙ্গে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের দেখা হয়। শৈশব থেকেই শ্রীনিবাস শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। অল্প বয়সে পিতাকে হারিয়ে শ্রীনিবাস অধিকতর গৌরভক্ত হয়ে ওঠেন।

চৈতন্যকে স্বচক্ষে দেখবার ইচ্ছা আর তিনি দমন করতে পারেন না, রওনা হন নীলাচলের দিকে। তখন তিনি নিতান্তই কিশোরবয়স্ক;

কৈশোর বয়স অতি সুন্দর শরীর। যে দেখে বারেক সে হইতে নারে স্থির।

(ভক্তিরত্নাকর, তৃতীয় তরঙ্গ)

কিন্তু রাস্তার মাঝখানে তিনি শুনলেন মহাপ্রভু দেহরক্ষা করেছেন। শুনে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তখন তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত করে নীলাচলে যেতে বললেন। শ্রীনিবাস নীলাচলে গেলেন এবং সেখানে গদাধর পণ্ডিত, বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর দেখা হল।

তারপরে শ্রীনিবাস আবার বাংলাদেশে ফিরে এসে নানা স্থান ভ্রমণ করেন। নবদ্বীপে গিয়ে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে দেখা করলেন। এইভাবে গমনাগমনের মধ্য দিয়ে কিছুদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে গদাধর পণ্ডিত, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতির অদর্শন ঘটেছিল। শ্রীনিবাস নানা তীর্থ পর্যটন করে মথুরায় এসে পৌছোলেন। এখানে এসে শুনলেন কাশীশ্বর গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, সনাতন, রূপ প্রভৃতি পরলোকগমন করেছেন, গোপালভট্ট, রঘুনাথদাস প্রভৃতি তাঁদের শোকে মুহ্যমান। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়ে গোপালভট্টের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন; তিনি জীব গোস্বামীরও দর্শন পেলেন। এখানে নরোত্তম আচার্য এবং শ্যামানন্দ গোস্বামীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হল। শ্রীনিবাস কয়েকবছর বৃন্দাবনে বাস করে জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে আচার্য পদবী লাভ করলেন।

তারপর বৃন্দাবনের গোস্বামীরা শ্রীনিবাসকে বললেন বাংলায় ফিরে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে। শ্রীনিবাস বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে নরোত্তমদাস ও শ্যামানন্দকে সাথী করে রওনা হলেন বাংলার দিকে। কিছু দিন পরে তাঁরা বাংলায় এসে পৌছোলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমায় পৌছোবার পরে রাজা বীর হাম্বীরের লোকেরা তাঁদের উপর চড়াও হয়ে সমস্ত বৈষ্ণবগ্রন্থ লুঠ করে নিয়ে গেল। শ্রীনিবাস তখন বীর হাম্বীরের সভায় গেলেন। বীর হাম্বীর দস্যু হলেও ধর্মের প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল। তাঁর সভায় ভাগবত পাঠ হত। শ্রীনিবাস সেখানে উপস্থিত হয়ে ভ্রমরগীতা পাঠ করে রাজাকে মুগ্ধ করলেন। রাজার তখন মন পরিবর্তিত হল, তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, তাঁর বই

ফিরিয়ে দিলেন এবং দস্যুবৃত্তি একেবারে ত্যাগ করলেন। শ্রীনিবাস তখন সারা বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস আর সন্ন্যাসী থাকলেন না, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করলেন। প্রথমে যাজিগ্রামের গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদীকে এবং তারপরে গোপালপুরের রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা গৌরাঙ্গপ্রিয়াকে তিনি বিবাহ করেন। এই দুই বিবাহের ফলে তাঁর কয়েকটি পুত্রকন্যার জন্ম হয়।

উপরে যে বিবরণ সঙ্কলিত হল, তার বিভিন্ন ঘটনার সময় অনায়াসেই নির্ণয় করা যায়। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খৃঃ) সময় শ্রীনিবাস কিশোরবয়স্ক। ঐ সময় তাঁর বয়স ১৩।১৪ বছরের মত ছিল ধরলে ১৫১৯।১৫২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম বলা যেতে পারে।

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও গদাধর পণ্ডিতের মৃত্যুর পরে শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনের দিকে রওনা হন। সুতরাং ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের পরে, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছেছিলেন ধরা যেতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যে সনাতন, রূপ, রঘুনাথভট্ট ও কাশীশ্বর গোস্বামীর মৃত্যু সম্ভব ও স্বাভাবিক। তারপর শ্রীনিবাস ছয় সাত বছর বৃন্দাবনে বাস করে জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন ধরা যেতে পারে। এই হিসাবে বৈষ্ণবগ্রন্থ নিয়ে প্রেমধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৫৭১-১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় গিয়েছিলেন ধরা যেতে পারে। তারপর গ্রন্থ লুঠ, গ্রন্থ উদ্ধার, বীর হাম্বীরের উদ্ধার প্রভৃতির পরে তিনি প্রায় ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেছিলেন ধরা যেতে পারে। ঐ সময়ে তাঁর বয়স হয় ৫৫।৫৬ বছর। ঐ বয়সে দুটি বিবাহ করা এবং কয়েকটি সন্তানের জনক হওয়া মোটেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়। শ্রীনিবাস আচার্যের পিতাও যে খুব বেশী বয়সে পুত্রের জনক হয়েছিলেন, একথা ভক্তিরত্নাকর থেকেই জানা যায়। তাছাড়া শ্রীনিবাসের দুই স্ত্রী ছিলেন বলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর কয়েকটি সন্তান লাভ সম্ভব।

কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার এই কালনির্ণয় অনেকেই মানতে চান না। তাঁরা যেসব আপত্তি তুলেছেন, সেগুলি আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা, তার বিচার করা যাক্।

শ্রীনিবাস আচার্য ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে বৃন্দাবনে পৌঁছেছিলেন বলে আমরা ধরেছি। তাহলে রূপ-সনাতন প্রভৃতি তার আগে পরলোক

গমন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয় তা মানতে চান না। তিনি বলেন, "১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে যে তাঁহারা ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে; ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর সাহ যে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা।" কিন্তু ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে রূপ-সনাতনের সঙ্গে আকবরের সাক্ষাৎকার মোটেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা নয়, কিংবদন্তী মাত্র। ঐ কিংবদন্তী যে ভিত্তিহীন, তা ডঃ নলিনীনাথ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন (বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৪৫, পৃঃ ৫১-৫২ দ্রঃ)।

আপত্তির দ্বিতীয় কারণ, বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে প্রতিবাদীদের স্বকপোলকল্পিত ধারণা। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে বীর হাম্বীর যে বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন, তা তাঁরা স্বীকার করতে চান না। সুতরাং বীর হাম্বীর কোন সময়ে রাজত্ব করেছিলেন, সেই প্রশ্নটি সাবধানে বিচার করে দেখা দরকার।

আবুল ফজল রচিত আকবর নামা থেকে জানা যায় যে, আকবরের রাজত্বের ৩৫শ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে হাম্বীর মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে কতলু খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন। বহারিস্তান-ই-ঘায়বি নামক সমসাময়িক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, প্রায় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বীর হাম্বীর মোগল সেনাপতি ইসলাম খাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং প্রায় ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে মোগলের বিদ্রোহ করেন, যার জন্যে তাঁকে দমন করতে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর-মন্দির নামক একটি প্রাচীন মন্দিরে খোদিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে বীর হাম্বীর ঐ মন্দির তৈরী করেছিলেন। অতএব বীর হাম্বীর অন্ততপক্ষে ১৫৯১ থেকে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে রাজত্ব করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে যিনি কতলু খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে বিপন্ন জগৎসিংহকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি যে ঐ সময়ে অত্যন্ত সমরকুশল ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দীর্ঘদিনের রাজত্ব ও যুদ্ধপরিচালনার অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি এই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বলে ভাবা স্বাভাবিক। একই লোকের পক্ষে পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করা মোটেই অসম্ভব নয়। ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। এই দিক দিয়ে, ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বা তারও আগে থেকে বীর হাম্বীর রাজত্ব করছিলেন বলে আমরা যে সিদ্ধান্ত করেছি, তা কিছুমাত্র অসঙ্গত হয়

না। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দেও বীর হাম্বীর রাজত্ব করতেন বলে কোন কোন সূত্রে পাওয়া যায়। 'বাংলায় ভ্রমণ' দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১৫২) লেখা আছে, "১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব সোলেমান কররানীর পুত্র দায়ুদ খাঁ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু বীর হাম্বীরের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে।"

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয় নিজের সুবিধামত ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে বীর হাম্বীরের বয়স ২৫।২৬ বছর ধরেছেন এবং তাই থেকে হিসাব করে ১৫৭২ থেকে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম হয়েছিল বলে মনে করেছেন। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের মত গ্রন্থের উক্তিকে উড়িয়ে দেবার আগে সাবধান হয়ে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করা উচিত। নাথ মহোদয় তা করেননি বলে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্য যে চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত করছি।

ভক্তিরত্নাকরে লেখকের স্বকপোলকল্পিত কথা বিশেষ নেই। যা কিছু তিনি লিখেছেন, তার পক্ষে তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন কিশোর শ্রীনিবাস শ্রীচৈতন্যকে দেখবার জন্যে নীলাচলে যাচ্ছিলেন, পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সংবাদ পেলেন,

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন। কতদূরে শুনিল চৈতন্য সংগোপন ॥

তারপর,

প্রভু ইচ্ছা মতে হইল নিদ্রা আকর্ষণ। স্বপ্নছলে গৌরচন্দ্র দিলেন দর্শন ॥

....

শ্রীনিবাস মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিল। প্রেমাবেশে প্রভু অতিশয় আশ্বাসিল ॥

এই পর্যন্ত লিখে 'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা' তাঁর উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন,

"তথাহি শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ কৃত নবপদ্যে ॥
গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধে র্জনমুখাৎ শ্রুত্বাতিরোধানতাং।
দুঃখোঘৈঃ সমুহু র্মূর্চ্ছ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্ ॥"

(শ্রীপুরুষোত্তমধামে গমন করতে ইচ্ছুক শ্রীনিবাস কৃপানিধি প্রভু চৈতন্যের তিরোধানবার্তা লোকমুখে শুনে অতি দুঃখে পুনঃ পুনঃ মূর্ছা প্রাপ্ত হতে

লাগলেন। অনন্তর ভগবান ভক্তের দুঃখ দর্শনে নিজের দয়া জানাবার জন্যে স্বপ্নে অনেক আশ্বাসবাক্য বললেন।)

নৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের অত্যন্ত বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীনিবাস আচার্যের অনেক শাখাবর্ণন গ্রন্থে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়,

শ্রীরামচন্দ্রগোবিন্দকর্ণপুরনৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৌ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদানবিচক্ষণাঃ॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র, গোবিন্দ, কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লবীদাস, গোপীরমণ ও গোকুল এই আট কবিরাজ।

ভক্তিরত্নাকরের (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৯, পৃঃ ৬১৯) এক জায়গায় শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদের নামের এক বিস্তৃত তালিকা দেওয়া আছে; সেখানেও স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে,

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো। যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো॥

এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি সংস্কৃত শাখানির্ণয়ের পুঁথি (G 5638 নং) আছে। পুঁথির লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দী, রচনাকাল শ্রীনিবাস আচার্যের সমসাময়িক বলে মনে হয়। এতেও শ্রীনিবাসের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের নাম পাই,

কর্ণপুরো নৃসিংহঃ শ্রীভগবান্ কবিনৃপতিঃ।
বল্লবিদাস কবিরাজৌ শ্রীগোপীরমণ গোকুলৌ॥

'কবিরাজ' এবং 'কবিনৃপতি' একই কথা। গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁর 'সঙ্গীতমাধব' নাটকে নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, "সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যো স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগাসীদভিন্নঃ।"

সুতরাং নৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। অতএব শ্রীনিবাসের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে তাঁর কথা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য। তিনি যখন বলেছেন যে শ্রীনিবাস আচার্য চৈতন্যদেবের জীবৎকালে জন্মেছিলেন এবং নীলাচলে যাবার পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-সংবাদ শুনেছিলেন, তখন আর এ বিষয়ে কোন কথা উঠতেই পারেনা।

ভক্তিরত্নাকরের বিবৃতির আর একটি অংশ নৃসিংহ কবিরাজের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়। সেটি হচ্ছে, শ্রীনিবাস রূপ-সনাতনের মৃত্যুর পরে বৃন্দাবনে

পৌঁছেছিলেন এবং গোপালভট্টই তাঁর গুরু। ভক্তিরত্নাকরে নৃসিংহ কবিরাজের 'নবপদ্য' থেকে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে আছে, বৃন্দাবনে যাবার পথে রূপ-সনাতনের বিয়োগসংবাদ শুনে যখন শ্রীনিবাস বিলাপ করছিলেন, তখন রূপ-সনাতন তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সান্ত্বনা দেন এবং গোপালভট্টের কাছে দীক্ষা নিতে ও কর্তব্যপালন করতে বলেন,

"তথাহি নব পদ্যে ॥

স্বপ্নে শ্রীল সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ
প্রোচুস্তং নহি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাং স্তথাস্মৎ কৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয় ॥"

আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, আনুমানিক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্যের বিবাহ হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ উপস্থাপিত করছি। ভক্তিরত্নাকরের চতুর্দশ তরঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যকে লেখা জীব গোস্বামীর দুটি চিঠি উদ্ধৃত আছে। প্রথম চিঠিতে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র বৃন্দাবনদাসের কুশল এবং তিনি কিছু লেখাপড়া করতে চেয়েছেন কিনা জানতে চেয়েছেন—"স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি নবেত্যপি"। দ্বিতীয় চিঠিখানি প্রথম চিঠির কিছুকাল পরে লেখা—কারণ "প্রথম পত্রে লেখা হইয়াছে—হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংশোধন কিঞ্চিৎ বাকী আছে, বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছে; তাই এখন তাহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল না। দ্বিতীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে—পূর্ব্বে আপনার (শ্রীনিবাসের) নিকটে যে হরিনামামৃত-ব্যাকরণ পাঠান হইয়াছে, তাহার অধ্যাপন যদি আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভাষ্য-বৃত্ত্যাদি অনুসারে ভ্রমাদির সংশোধন করিয়া লইবেন।" হরিনামামৃত সংশোধনের আগে প্রথম চিঠি লেখা, সংশোধনের পর বাংলায় পাঠানো এবং তার অধ্যাপন সুরু হবার সময় উপস্থিত হলে দ্বিতীয় চিঠি লেখা। সুতরাং দুই চিঠির মাঝখানে কয়েক বছর ব্যবধান ধরা যায়। দ্বিতীয় চিঠিতে জীব গোস্বামী লিখেছেন যে, তিনি গোপালচম্পূ (পূর্বচম্পূ) বাংলায় পাঠাচ্ছেন, উত্তরচম্পূ সবেমাত্র লেখা হয়েছে, বিচারমূলক সংশোধন তখনও বাকী আছে। গোপালচম্পূর পূর্বভাগ ও উত্তরভাগের রচনাসমাপ্তি-কাল যথাক্রমে ১৫৮৮ খৃঃ ও ১৫৯২ খৃঃ। এরই মাঝামাঝি সময়ে দ্বিতীয়

চিঠি ও তার কয়েক বছর আগে প্রথম চিঠি লেখা হয়। প্রথম চিঠি ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে যদি লেখা হয়, এবং সেই সময়ে যদি শ্রীনিবাস আচার্যের ছেলে বৃন্দাবনদাসের লেখাপড়া করবার বয়স হয়, তাহলে বৃন্দাবনদাসের জন্ম কিছুতেই ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের পরে হতে পারে না। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় চিঠিতে জীব গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের ভ্রাতা-ভগিনীদের প্রতিও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। সুতরাং ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীনিবাসের কয়েকটি পুত্রকন্যা হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। অতএব শ্রীনিবাসের বিবাহের সময় ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের বেশী পরে ধরা যায় না।

সুতরাং শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কাল সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত করেছি, তা যথার্থ বলে প্রমাণ হচ্ছে। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস তাঁর 'বৃন্দাবন-কথা'য় লিখেছেন যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরদের বাড়ীর এক পুঁথিতে দেখেছেন, তাতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম এবং ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিরোভাব লেখা আছে। এই দুই তারিখ অকৃত্রিম হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

॥ বাইশ ॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ কবিরই পরিচয় ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। মুষ্টিমেয় যে ক'জনের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ।

ভক্তিরত্নাকর থেকে জানা যায় যে, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও তাঁর বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং জীব গোস্বামী তাঁর পদ আস্বাদন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সংস্কৃত শাখানির্ণয়ের পুঁথিতে (নং G 5638) শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য হিসেবে সস্ত্রীক রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস এবং গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহের নাম পাওয়া যায়,

সস্ত্রীকো (কৌ) রামচন্দ্র-শ্রীগোবিন্দ-কবি-পার্থিবৌ।
তৎপুত্রো দিব্যসিংহাখ্য(:) কবিরাজঃ শ্রিয়া যুতঃ ॥

গোবিন্দদাসের পদ আস্বাদনে মুগ্ধ হয়ে জীবগোস্বামী তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেটি ভক্তিরত্নাকরের চতুর্দশ তরঙ্গে পাওয়া যায়।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' আদিলীলায় ১১শ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের শিষ্য হিসেবেও রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম পাই।

কংসারিসেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ ॥

এই রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজকে অনেকে কবিভ্রাতৃযুগল রামচন্দ্র-গোবিন্দ থেকে পৃথক লোক বলে মনে করেন। কিন্তু চরিতামৃতে যখন রামচন্দ্র ও গোবিন্দের একই সঙ্গে নাম করা হয়েছে এবং তাঁদের কবিরাজ বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তখন এঁদের আমাদের আলোচ্য রামচন্দ্র ও গোবিন্দের সঙ্গে অভিন্ন না ধরে উপায় নেই।

এই দুই ভাই চরিতামৃতে নিত্যানন্দের শিষ্য হিসেবে এবং অন্যত্র শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন কেন? এ সম্বন্ধে আমাদের যা

মনে হয় তা বলছি। ভক্তিরত্নাকর থেকে জানা যায় যে, গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন এবং রামচন্দ্র-গোবিন্দের শৈশবেই তাঁদের পিতার মৃত্যু ঘটে। আমাদের মনে হয় পিতার জীবদ্দশাতে রামচন্দ্র-গোবিন্দ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লেখা আছে, পিতৃবিয়োগের পরে রামচন্দ্র-গোবিন্দ শক্তিধর্ম-উপাসক মাতামহের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন এবং মাতামহের প্রভাবে তাঁরাও শাক্ত হয়ে যান। তারপর অনেকদিন বাদে প্রথমে রামচন্দ্র ও পরে গোবিন্দ শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন, আসলে যা পুনর্দীক্ষাগ্রহণ।

নিত্যানন্দ ১৫৪০ খৃঃর বেশী পরে জীবিত ছিলেন না। কাজেই ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গোবিন্দদাসের জন্ম ধরলে শৈশবে নিত্যানন্দের কাছে তাঁর প্রথম দীক্ষা গ্রহণের এবং বেশী বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণের সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

গোবিন্দদাস কতদিন জীবিত ছিলেন, তাও মোটামুটি ভাবে নির্ধারণ করা যায়। তাঁর 'প্রেম আগুনি মনহি গুনি গুনি' পদের ভণিতায় 'প্রতাপ-আদিত্যে'র নাম পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের একটি পুঁথিতে (শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস সংগৃহীত) আমরা এই পাঠ পাই,

জানি পুন পুন সো পিয়া পরশন সে পিয়া পূজে পাচ বান রে।
ও রস গাহক প্রতাপ আদিত্য দাস গোবিন্দ ভান রে॥

অন্যত্র 'প্রতাপ আদিত্য'র জায়গায় 'প্রাত আদিত' পাঠ পাওয়া যায়। কোন কোন পুঁথিতে এর জায়গায় 'রায় চম্পতি'র নাম পাই। মূল পাঠ আমাদের পুঁথিতেই সঠিকভাবে পাওয়া যায় এবং তাতে 'প্রতাপ-আদিত্য' ও 'রায় চম্পতি' দুজনেরই নাম আছে। উপরে উদ্ধৃত অংশের ঠিক পরেই আছে,

বিরহমোচন ও তুয়া লোচন রোজ হেরব কান রে।
রায় চম্পতি বচন মানিয়ে দাস গোবিন্দ ভান রে॥

পদটিতে উল্লিখিত 'প্রতাপ-আদিত্য' নিঃসন্দেহে যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। গোবিন্দদাস যখন প্রতাপাদিত্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন তিনি যে অন্ততঃ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

॥ তেইশ ॥

জ্ঞানদাস

মহাকবি জ্ঞানদাসের পরিচয় ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে প্রায় কোন তথ্যই সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নিত্যানন্দের শিষ্যদের তালিকায় এক জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়,

পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর। শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥

এঁকেই কবি জ্ঞানদাসের সঙ্গে অভিন্ন ধরা হয়। ভক্তিরত্নাকরের মতে জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। ভক্তিরত্নাকরে ও নরোত্তমবিলাসে কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত মহাজনদের তালিকায় জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়। নরোত্তমবিলাসেও চৈতন্যচরিতামৃতের মত 'জ্ঞানদাস মনোহর' লেখা রয়েছে,

শ্রীল রঘুপতি উপ্যাধ্যায় মহীধর। মুরারি মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥

'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে (২য় সং, পৃঃ ৩১৩) সঙ্কলিত 'নরহরিদাস' ভণিতাযুক্ত একটি পদে কবি জ্ঞানদাসের এই বিবরণ পাওয়া যায়,

শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাঁদড়া মাঁদড়া গ্রাম তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগ্যেতে রত বাল্যকাল হৈতে দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ ॥

....

মদনমঙ্গল নাম রূপে গুণে অনুপাম আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে বাবা আউল ছিল সহচর ॥

চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ও পদটির সাক্ষ্য মিলিয়ে— জ্ঞানদাস ১৫২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৫৭০ থেকে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত কাটোয়া ও খেতরীর উৎসবে প্রবীণ বয়সে উপস্থিত হন বলে আনুমানিকভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়।

॥ চব্বিশ ॥

দ্বিজ মাধব

দ্বিজ মাধব নামে কবির ভণিতাযুক্ত চণ্ডীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এই তিনখানি কাব্য পাওয়া যায়। অনেকে প্রধানতঃ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে এই তিনটি কাব্য বিভিন্ন লোকের লেখা বলে মনে করেন। কিন্তু এই তিন কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করলে এঁদের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও পুঁথিতে এই দুই ছত্র অথবা এদের পাঠান্তর পাওয়া যায়,

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার। মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥

আর চণ্ডীমঙ্গলের সমস্ত পুঁথির উপক্রমে পাই,

পরাশর-সুত হয় মাধব তার নাম। কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপাম ॥

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে 'দ্বিজ মাধব' এর সঙ্গে 'মাধব আচার্য্য' ভণিতাও বহু জায়গায় পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলেরও কোন কোন পুঁথিতে আছে,

তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য। ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য ॥

গঙ্গামঙ্গলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের ভণিতার মিল খুব বেশী। গঙ্গামঙ্গলে পাই,

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্রচরণকমল। দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল ॥

আর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে পাই,

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্রচরণকমল। দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

সুতরাং তিনটি কাব্যই যে এক লোকের লেখা, তাতে সংশয়ের অবকাশ অল্প।

চণ্ডীমঙ্গলের উপক্রম থেকে জানা যায় দ্বিজ মাধব পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যের পুঁথি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় না, কেবল উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের জনপ্রিয়তাই হয়তো পশ্চিমবঙ্গে দ্বিজ মাধবের কাব্যের প্রচার লোপ করেছিল। অবশ্য দ্বিজ মাধবের পূর্ববঙ্গে বসতিস্থাপনও এর কারণ হতে পারে।

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল "ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত" অর্থাৎ ১৫০১ শক বা ১৫৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দ। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় আছে, "মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্বশীতল। যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥" দৈবকীনন্দন নিত্যানন্দের প্রিয় পাত্র পুরুষোত্তমের শিষ্য, সুতরাং তাঁর বৈষ্ণববন্দনার রচনাকাল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী নয়। দ্বিজ মাধব তার অনেক আগেই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেছিলেন।

॥ পঁচিশ ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মধ্যযুগে এমন খুব অল্প বাংলা কাব্যই রচিত হয়েছে, যা নিয়ে বাঙালী গর্ব করতে পারে। যে দু একখানি হয়েছে, তার মধ্যে 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' নামে পরিচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের নামই অগ্রগণ্য।

মুকুন্দরাম ঠিক্ কোন্ সময় জীবিত ছিলেন, তা আমাদের সকলেরই জানা আছে, কারণ তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের শাসনকর্তা মানসিংহের নাম করেছেন। কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কতদিন বেঁচে ছিলেন, কবে কাব্য রচনা করেছিলেন, এই সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা এপর্যন্ত হয়নি। বর্তমান আলোচনায় এই সব প্রশ্নেরই সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

মুকুন্দরামের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনার প্রধান উপকরণ তাঁর আত্মকাহিনী। অবশ্য তিনি দুটি আত্মকাহিনী লিখেছিলেন। প্রথম আত্মকাহিনীটি মুকুন্দরামের গ্রাম দামিন্যায় রক্ষিত একটি পুঁথিতে (যে পুঁথি অবলম্বনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকঙ্কণচণ্ডীর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন) এবং কাইতি গ্রামের এক পুঁথিতে পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটি অধিকাংশ পুঁথিতেই পাওয়া যায়। বর্ধমান সাহিত্যসভার ৩২ নং পুঁথিতে (ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৭৫-৭৬ পৃষ্ঠায় যে পুঁথিটির ফটো ছাপিয়েছেন) একসঙ্গে দুটি আত্মকাহিনীই আছে। প্রথম আত্মকাহিনীতে মুকুন্দরাম স্বগ্রাম দামিন্যার বিবরণ এবং তাঁর বংশপরিচয় দিয়েছেন। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর সঙ্গে এই আত্মকাহিনীর এদিক দিয়ে বেশ মিল আছে। দ্বিতীয় আত্মকাহিনীতে তিনি তাঁর দেশত্যাগের করুণ কাহিনী এবং কাব্যরচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। মুকুন্দরামের কালনির্ণয়ের সূত্র এই দ্বিতীয় আত্মকাহিনীতেই পাওয়া যায়।

বহুপ্রচারের ফলে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের পাঠ আর বিশুদ্ধ নেই, তার মধ্যে নানা ভেজাল এসে ঢুকেছে। একই কারণে এই দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটির বেলায়ও তাই হয়েছে। এর অনেক জায়গা, বিশেষ করে লোক ও স্থানের নামগুলি প্রচলিত সংস্করণগুলিতে ও বহু পুঁথিতে বিকৃতভাবে পাওয়া যায়। আমরা এরকম কতকগুলি বিকৃত অংশের উল্লেখ করে আমাদের ধারণা অনুযায়ী শুদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করছি।

মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে আত্মকাহিনীর দ্বিতীয় শ্লোকটি এইভাবে পাই,

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ॥

কিন্তু "সে মানসিংহের কালে" যদি অত্যাচারী ডিহিদার মামুদ সরিফ উৎপীড়ন করতে থাকে, তাহলে মানসিংহ 'ধন্য রাজা' হন্ কেমন করে? আর ষোড়শ শতাব্দীতে 'ডিহিদার' পদের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। সুতরাং এই পাঠে ভুল আছে। শুদ্ধ পাঠ ঠিক করবার জন্যে আমি অনেকগুলি পুঁথি দেখি। কিন্তু 'সে মানসিংহের কালে'র জায়গায় 'রাজা মানসিংহের কালে' ছাড়া আর কিছু পেলাম না, তবে অনেক সমালোচক পুঁথির উল্লেখ না করে 'অধর্ম্মী রাজার কালে' পাঠ গ্রহণ করেছেন দেখলাম। 'ডিহিদার' শব্দেরও কোন সন্তোষজনক পাঠান্তর পাইনি। শেষ পর্যন্ত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এর প্রথম সংস্করণে (১৮৭৩ খৃঃ) এই পাঠ পেলাম,

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মহম্মদ সরিফে॥

রামগতি কোন্ পুঁথিতে এই পাঠ পেয়েছিলেন, তাও উল্লেখ করেছেন। "কবিকঙ্কণ, আঁড়রাগ্রামের যে ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা রঘুনাথদেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের বংশীয়েরা উক্ত আঁড়রাগ্রাম হইতে ২ ক্রোশ দূরবর্তী 'সেনাপতে' নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস করেন। তাঁহারা কহেন যে, তাঁহাদের বাটীতে যে চণ্ডীপুস্তক বর্ত্তমান আছে, তাহা কবিকঙ্কণের

স্বহস্তলিখিত।" রামগতি এই পুঁথি থেকেই উপরোদ্ধৃত শ্লোকটির পাঠ নিয়েছেন। বলা বাহুল্য "অধর্ম্মী রাজার কালে" ইত্যাদি পাঠই ঠিক্।

প্রচলিত পাঠে আছে,

সঙ্গে দামোদর নন্দী সে জানে স্বপন সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।

বিভিন্ন পুঁথিতে 'দামোদর নন্দী'র জায়গায় 'ডামালনন্দী,' 'গোপালদাস নন্দী' প্রভৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের পাঠ,

সঙ্গে ভাই রামানন্দা সে জানে স্বপ্নের সন্ধি
অনুদিন করিত যতন॥

এই পাঠ যে ঠিক্, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প। মুকুন্দরামের দেশত্যাগের সময় ভাই ছাড়া অন্য কোন সঙ্গী ছিল না। সুতরাং অন্য কোন লোকের পক্ষে মুকুন্দরামের স্বপ্নের ব্যাপার জানবার কথা নয়। ভাইয়ের নাম যে 'রামানন্দ'—তা শুধু রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থে নয়, আত্মকাহিনীর বহু পুঁথিতে পাওয়া যায়। উপরোদ্ধৃত অংশে মিলের অনুরোধে 'রামানন্দ' 'রামানন্দী' হয়েছে। অন্য অনেক জায়গায় ভাইয়ের নাম 'রমানাথ' বা 'রামনিধি' পাওয়া যায়, কিন্তু তা যে ঠিক নয়, তা এখন সহজেই বোঝা যাবে।

প্রচলিত সংস্করণগুলিতে আছে,

সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈল গম্ভীর-খাঁ সনে।

'গম্ভীর খাঁ'র জায়গায় 'গরীব খাঁ', 'মুনিব খাঁ' ও 'মীর খাঁ' নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এর চাইতে অনেক ভাল পাঠ পাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১৪১ নং পুঁথিতে—"যুক্তি কৈল গ্রাম্ভারির সনে"। 'গ্রাম্ভারি' মানে গ্রামের মোড়ল। দেশত্যাগের সময় গ্রামের মোড়লের সঙ্গে যুক্তি করাই স্বাভাবিক। সুতরাং এই পাঠই ঠিক বলে মনে হয়।

প্রচলিত সংস্করণগুলিতে আত্মকাহিনীর পরিসমাপ্তির অংশটি সংক্ষিপ্ত ও অগোছালো বলে মনে হয়। ডঃ সুকুমার সেন উল্লিখিত ও ব্যবহৃত বর্ধমান সাহিত্য সভার ৩২নং পুঁথিতে পরিসমাপ্তির অংশটি সঠিকভাবে পাওয়া যায় বলে মনে করি (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৩৭৪-৭৬ দ্রষ্টব্য)।

এখন, মুকুন্দরামের আবির্ভাবকাল ও গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করা যাক্। আত্মকাহিনীতে কবি বলেছেন যে স্থানীয় শাসনকর্তা মহম্মদ

(বা মামুদ) সরিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যাচারে তিনি দেশ ছেড়ে ব্রাহ্মণভূমি আড়রাতে চলে আসতে বাধ্য হন। সেখানকার রাজা বাঁকুড়ারায় কবিকে আশ্রয় দেন এবং তাঁর ছেলে রঘুনাথ রায় কবিকে গুরু বলে পূজা করেন। রঘুনাথ যখন রাজা, সেই সময় মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন।

চণ্ডীমঙ্গল কখন সম্পূর্ণ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আত্মকাহিনীতে মানসিংহের উল্লেখ অনেকখানি সাহায্য করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত History of Bengal, Vol. II থেকে জানা যায় যে ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খৃঃ পর্যন্ত মানসিংহ বাংলা ও উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন।

এখন, আত্মকাহিনীতে "সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ সরিফ" পাঠ অভ্রান্ত ধরলে বলতে হবে মানসিংহের শাসনকালে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন এবং তার অনেক পরে কাব্যরচনা করেছিলেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি এখানে শুদ্ধ পাঠ "অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে" ইত্যাদি। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যে, যেসময় মুকুন্দরাম এই আত্মকাহিনী লিখছিলেন, সেই সময়ে মানসিংহ গৌড়, বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী কোন এক অধর্মী রাজার শাসনকালে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ বা তার কিছু পরে মুকুন্দরাম এই আত্মকাহিনী রচনা করেন, সন্দেহ নেই। মূল কাব্য তার আগেই শেষ হয়েছিল, কারণ আত্ম-কাহিনীর প্রথমেই আছে,

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হৈল যেন মতে।

আত্মকাহিনী ও মূল কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে উপরে যে সিদ্ধান্ত করলাম, তার সমর্থন পাচ্ছি আর এক জায়গা থেকে। "চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র পুঁথিতে একটি চৌতিশা পাওয়া গিয়াছে। কোন ভণিতা নাই, তবে পুঁথিতে আছে কবিকঙ্কণের চৌতিশা। চৌতিশার পাঠ মুদ্রিত পুস্তকের পাঠের সহিত মিলে না। চৌতিশাটির শেষে রচনাকাল দেওয়া আছে।

চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত।
পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত ॥

এখানে প্রথম ছত্রে স্পষ্টতঃ সিন্ধু স্থলে ইন্দু পাঠ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা পাই ১৫১৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই সাল গ্রন্থরচনার তারিখ হইতে কোনই বাধা নাই।"

চৌতিশার রচনাকালের কয়েকমাস পরে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে (১৫১৬ শকের প্রথমে) মানসিংহ বাংলা ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হন। কিন্তু তাতে কোন অসঙ্গতি হচ্ছে না, কারণ চৌতিশা লেখবার কিছুকাল পরে মুকুন্দরাম গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন এবং তারও পরে আত্মকাহিনী লেখেন। ইতিমধ্যে মানসিংহ এসে গিয়েছেন। সুতরাং ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ বা তার সামান্য পরে মুকুন্দরাম গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন, এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি দৃঢ় হল।

মুকুন্দরামের ছাত্র ও পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যা কিছু তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তার থেকেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। ১৮৭৩ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন, "আমাদের পরমসুহৃৎ মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল ও বংশাবলী প্রভৃতি পূর্ব্বোলিখিত রাজবাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, রাজা রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ শক [১৫৭৩ খৃঃ অঃ] হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৪ শক [১৬০৬ খৃঃ অঃ] পর্যন্ত ৩০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন।" রঘুনাথের রাজত্বকাল সম্বন্ধে এই উক্তির সমর্থন পাচ্ছি ১৩১২ বঙ্গাব্দের 'প্রদীপে' প্রকাশিত অম্বিকাচরণ গুপ্তের প্রবন্ধ থেকে।

দুটি শিলালিপির সাক্ষ্যও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। প্রথম শিলালিপিটি আবিষ্কার করেন শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ। মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী গ্রামে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে উড়িয়া অক্ষরে এই শিলালিপিটি লেখা আছে; এর পাঠ :—

"শ্রীমানসিংহ মহারাজ শুভরাজ্যে নিজ কুলে কুমুদানন্দ শ্রীল রঘুনাথ শর্মা ভূমিপ সুত শ্রীচক্রধর শর্মা প্রকাশিলে সর্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি। শকাব্দ ১৫২৬ কামিলা রত্নপাত্র।" ('পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', পৃঃ ৪১৬ দ্রষ্টব্য)

এখানে মানসিংহের উল্লেখ লক্ষ্যণীয়। মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রাজা রঘুনাথ এবং এই রাজা রঘুনাথ দুজনেই মানসিংহের সমসাময়িক এবং আড়রা থেকে কেশিয়াড়ীর দূরত্ব মাত্র ৫০।৫৫ মাইল। সুতরাং দুজন

অভিন্ন বলে মনে হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রঘুনাথের পুত্র চক্রধর শর্মার নাম থাকায় মনে হয় তার আগেই রঘুনাথের মৃত্যু ঘটেছিল। সুতরাং ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের রাজত্বের অবসান ঘটেছিল, এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিটি 'সেনাপতে' গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত জয়পুর গ্রামের জয়চণ্ডীর প্রস্তর মন্দিরে পাওয়া গিয়েছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এর কথা আমায় প্রথম বলেন। শিলালিপিটির তারিখ ১৫৪৫ শক বা ১৬২৩-২৪ খৃঃ। এতে "দ্বিজাবনীশ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণভূমির অধিপতি 'শ্রীধর'-এর নাম আছে। সুতরাং রঘুনাথের রাজত্ব যে তার আগে শেষ হয়েছিল, তা এর থেকেও বোঝা যাচ্ছে।

অতএব ১৫০৩ খৃষ্টাব্দেই রঘুনাথ রায়ের রাজত্ব শেষ হয়েছিল বলে স্থির করা যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল তার আগেই রচিত হয়েছিল। এদিক দিয়েও আমাদের আগেকার সিদ্ধান্তই সমর্থিত হচ্ছে।

এতদূর পর্যন্ত কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ছাপা বইগুলিতে যে সময়নির্দেশক শ্লোক আছে, তার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের কি করে খাপ খাওয়ানো যায়, সেটি একটি সমস্যা। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৫ শক বা ১৮২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে। তারই শেষে এই শ্লোকগুলি ছিল,

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥
অভয়া মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যেবা মনোরথ পূরে তার আশ॥

ইত্যাদি

এই শ্লোকগুলি এতদিন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু সম্প্রতি বর্ধমান সাহিত্য সভার ২০০১ নং পুঁথিতে আমরা এই শ্লোকগুলি পেয়েছি। এই পুঁথির লিপিকাল ১৮৪২ খৃঃ। সুতরাং সন্দেহ করা যেতে পারে যে,

ছাপা বই থেকেই শ্লোকগুলি নেওয়া হয়েছে। এ সন্দেহ নিরসনের জন্যে আমরা পুঁথি থেকে শ্লোকগুলি অবিকলভাবে উদ্ধৃত করছি,

শকে রষ রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতমত দিলা গিত হরের বণিতা॥
অভয়া মঙ্গল গিত গাইল মুকুন্দ।
আশোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
জার জেবা মনোরথ পুরে অভিলাষ॥

ইত্যাদি

ছাপা বইএর সঙ্গে এর পাঠের হুবহু মিল নেই, সুতরাং ছাপা বই থেকে যে শ্লোকগুলি পুঁথিতে গৃহীত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, প্রথম ছাপা সংস্করণের সঙ্গে এই পুঁথির মূল গ্রন্থের পাঠেও সর্বত্র মিল নেই।

"শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা"র থেকে পাওয়া যায় ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময় মুকুন্দরামের কাব্যরচনার কাল হতে পারে না, কারণ মানসিংহের শাসনকাল এর পঞ্চাশ বছর পরবর্তী। সুতরাং এ তারিখ কিসের?

আত্মকাহিনীতে কবি বলেছেন যে দেশ ছেড়ে আড়রায় যাবার সময় মাঝপথে গোথড়া বা গোচড়্যা গ্রামে যখন তিনি ক্ষুধায় পরিশ্রমে কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন দেবী চণ্ডী স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে চণ্ডীমঙ্গল লিখতে আদেশ দেন। বহু সমালোচক যুক্তিসঙ্গতভাবে বলেছেন 'শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা' ঐ স্বপ্নাদেশ লাভের তারিখ। তাহলে ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম স্বপ্নাদেশ লাভ করেছিলেন বলে ধরতে পারি। ডঃ সুকুমার সেন সম্প্রতি 'মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল' নামে একটি প্রবন্ধে নানা যুক্তি দেখিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ১৪৬৬ শকাব্দেই মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২৫৫)।

অনেকে 'রস' অর্থে ৯ ধরে 'শকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা'—১৪৯৯ শকাব্দ ধরেন। কিন্তু তিনটি কারণে এই মত সমর্থন করা যায় না। প্রথমতঃ 'রস' শব্দটি যখন সংখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন সর্বত্র ৬ অর্থেই প্রযুক্ত হয়, ৯ অর্থে ব্যবহারের কোন দৃষ্টান্ত এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়তঃ,

রামগতি ন্যায়রত্ন এবং অম্বিকাচরণ গুপ্ত বিভিন্ন সময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে লিখেছিলেন যে, ১৪৯৫ শক বা ১৫৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বপ্নাদেশ লাভের পরে মুকুন্দরাম আড়রায় যান। তার পরে রঘুনাথ রায় রাজা হন। সুতরাং ১৪৯৫ শকের আগেই মুকুন্দরাম স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন, ১৪৯৯ শকে পেতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, উপরে উল্লিখিত বর্ধমান সাহিত্যসভার ২০০১ নং পুঁথিতে উপরোক্ত শ্লোকগুলির ঠিক আগে স্পষ্টভাবে "সকা ১৪৬৬" লেখা আছে।

একথা সত্য যে ১৪৬৬ শক ও মানসিংহের বাংলা-উড়িষ্যার সুবেদারী লাভের মধ্যে ৫০ বছরের তফাৎ। কিন্তু তাতেও কোন ক্ষতি হচ্ছে না। কারণ দেশত্যাগের সময় কবি যুবক ছিলেন বলে মনে হয়। যেহেতু আত্ম-কাহিনীতে তিনি তাঁর একটি মাত্র শিশুসন্তানের উল্লেখ করেছেন—"কান্দে শিশু ওদনের তরে।" আর চণ্ডীমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করার সময়ে তিনি বৃদ্ধ। ভণিতায় তিনি বারবার তাঁর পুত্রবধূ বলে অভিহিতা চিত্রলেখার নাম করেছেন এবং দামিন্যার পুঁথিতে আছে,

শিবরাম বংশধর কৃপা কর মহেশ্বর
রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।

এই সাক্ষ্য অনুসারে কবির তখন পৌত্র হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি চণ্ডী-মঙ্গলের এক জায়গায় "বুঢ়ারে না করে গুণ মোহন ঔষধ" বলে নিজের বার্ধক্যের প্রমাণ দিয়েছেন।

তারপর কবি যখন আরড়ায় পৌছোন, তখন রঘুনাথ ছাত্র এবং "শিশু",

সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশু পাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ দ্বিজ কুলে অবদাত
গুরু বলি কৈল পূজিত॥

অথচ চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময় রঘুনাথই রাজা। এদিক দিয়েও কবির স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তি ও কাব্য রচনার সময়ের মধ্যে বহু বছরের ব্যবধান সপ্রমাণ হয়।

সুতরাং ২৪।২৫ বছরের মত বয়সে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন ও স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন এবং ৭৪।৭৫ বছরের মত বয়সে চণ্ডীমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন বলে স্থির করলে কোন দিক দিয়ে কোন অসঙ্গতি হয় না। সুতরাং আমরা এখন বলতে পারি, ১৫২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মুকুন্দরাম

চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে দেশত্যাগ করেন ও দেবীর স্বপ্নাদেশ পান, ১৫৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে চৌতিশা লেখেন এবং ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে চণ্ডীমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করেন।

মুকুন্দরামের ছেলে শিবরাম চক্রবর্তীর জীবৎকাল সম্বন্ধে কিছু স্বতন্ত্র তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেগুলির সঙ্গে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গতি থাকে কিনা, তা এবার দেখা যাক।

শিবরাম চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত একটি জমি দানের সনদ দেখেছিলেন অম্বিকাচরণ গুপ্ত। এতে "কুতুব খাঁ নামক কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর" ছিল এবং এঁর মারফৎ "দামুন্তা গ্রামে ষোল বিঘা বাস্ত বাগাত ইত্যাদি নিষ্কর করিয়া" দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে সনদটিতে "লিখিত তারিখ বড়ই দুর্ব্বোধ কেবল ফাল্গুন মাস এবং সন ১০২৫ সাল বেশ বুঝিতে পারা যায়।" সুতরাং ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরামের ছেলে শিবরাম চক্রবর্তী জীবিত ছিলেন।

আর একটি দলিল দেখেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি লিখেছেন, "বারা খাঁ বর্দ্ধমান সিলিমবাদ পরগণার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ১৬৪০ খৃ. অ. (১০৪৭ বাং সনে) কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্য্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জমী প্রদান করেন। কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত দান পত্রখানি কতকদিনের জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন।" সুতরাং শিবরাম ১৬৪০ খৃষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন।

আরও একটি দলিলে এক শিবরাম চক্রবর্তীর নাম পেয়েছি। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্রে'র ২য় খণ্ডে (পৃঃ ৩৪৬) দলিলটি সংগৃহীত হয়েছে। দলিলটির নকল নীচে উদ্ধৃত করছি।

(পারসী মোহর)

৭॰ ং॰ আদিকীর্দ্দি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত সিবরাম চক্রবর্ত্তি সদাসয়েষু শ্রীলিখিত কার্য্যঞ্চ আগে মৌজে মুজ্জাপুর তোমাকে আয়মা দিন ওয়া দোয়া করিয়া ভোগস্বত্ব গ্রামের রাজস্ব আমীদির তোমার সহিত রাজস্বের দায় নাহি আর আমরা আবহ পরগনাতে জে তোমার আমল আছে তাহা আমলস্বহ ইতি তা ২১ ফাল্গুন সন ১০৫৯ সাল—

এই দলিলে উল্লিখিত "সিবরাম চক্রবর্ত্তি"র সঙ্গে মুকুন্দরামের ছেলে শিবরাম চক্রবর্তীর অভিন্নতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকলেও সময় এবং

স্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় দুজনের অভিন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু মুকুন্দরাম যদি ১৪২০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে বর্তমান থাকেন, তাহলে তাঁর ছেলে শিবরাম কি ১০৫৯ সনের ফাল্গুন মাস বা ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকতে পারেন? এর উত্তরে বলা যায়, শিবরাম যদি ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রায় ৮৩ বছর বয়সে স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকতে পারেন। এই উক্তির বিরুদ্ধে কেউ কেউ আত্মকাহিনীর "কান্দে শিশু ওদনের তরে" চরণটি উদ্ধৃত করে বলবেন মুকুন্দরামের দেশত্যাগের অর্থাৎ ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের আগেই শিবরামের জন্ম হয়েছিল। এর জবাবে বলা যায়, "ওদনের তরে" যে শিশু কাঁদছিল, সে শিবরাম নয়, মুকুন্দরামের আর এক ছেলে। মুকুন্দরামের আর একটি ছেলে ছিল এবং চণ্ডীমঙ্গল রচনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। বর্দ্ধমান সাহিত্য সভার ৩২ নং পুথিতে আত্মকাহিনীর মধ্যে মুকুন্দরামের এই উক্তি পাওয়া যায়,

> কি আর কহিব কাজ কহিতে বড়ই লাজ
> গীত না করিয়া মৈল ছাল্যা।
> শুন রঘু নরপতি দুঃখে কর অবগতি
> আকালে বিকাইল মোর হাল্যা॥

সুতরাং ১৫৭০ খৃঃর মত সময়ে শিবরামের জন্ম ধরতে কোন বাধা নেই। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, অম্বিকাচরণ গুপ্ত ও দীনেশচন্দ্র সেন কথিত দলিল দুটি আমরা কেউই দেখিনি। সুতরাং তাঁদের উল্লিখিত তারিখ নির্ভুল কিনা, সেসম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ আছে। তৃতীয় দলিলটিতে উল্লিখিত "সিবরাম চক্রবর্ত্তি" যে মুকুন্দরামের ছেলে, তারও কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং ১৬১৯, ১৬৪০ ও ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে যে মুকুন্দরামের ছেলে শিবরাম চক্রবর্তী জীবিত ছিলেন, তা একেবারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ঐ সব সালে তিনি জীবিত ছিলেন ধরে নিলেও মুকুন্দরামের জন্মকাল, দেশত্যাগকাল ও কাব্যরচনাকাল সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন করার দরকার হয় না।

॥ ছাব্বিশ ॥

কাশীরাম দাস

কাশীরাম দাসের মহাভারত যে শুধু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাই নয়, জনপ্রিয়তার দিক দিয়েও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভিন্ন আর কোন বাংলা কাব্য তার কাছে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু কৃত্তিবাস শুধু বাংলা রামায়ণের শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় কবি নন, তিনিই আদি কবি। কাশীরাম দাস এই দ্বিতীয় গৌরব দাবী করতে পারেন না। তাঁরও আগে বহু কবি 'অমৃত সমান' 'মহাভারতের কথা'কে মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে সাধারণ লোকের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলেই কাশীরাম যশের স্বর্ণমন্দিরে পৌঁছেছেন।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়। কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে 'জগন্নাথমঙ্গল' রচনা করেন ('ত্রিশ' সংখ্যক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। 'জগন্নাথমঙ্গলে' কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার উল্লেখ আছে,

> কমলাকান্তের হল্য এ তিন কোঙর।
> প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
> দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
> রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত-পুরাণ॥

সুতরাং কাশীরাম দাসের মহাভারত ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের আগেই লেখা হয়েছিল। ঠিক কোন্ সময়ে লেখা হয়েছিল, তাও মোটামুটিভাবে জানা যায়। ১২৩৬ সালে লেখা একটি বিরাট পর্বের পুঁথিতে এই রচনাকালনির্দেশক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

> চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
> বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥

এর থেকে দক্ষিণাগতিতে ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪-৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোদ্ধৃত পয়ারটি কাশীরামের লেখা কিনা, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ একটি পুঁথিতে এই শ্লোকগুলি পাওয়া গিয়েছে,

> ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
> তিনপর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ॥

আদি সভা (বন) যে রচিল পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি ॥
পূর্ব্বে তিঁহ আরম্ভিয়া ছিলা এই পুঁথি।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো হইল স্বর্গগতি ॥

উপরোদ্ধৃত উক্তি অনুযায়ী কাশীরাম যদি মাত্র তিনটি পর্ব লিখে পরলোকগমন করে থাকেন, তাহলে বিরাট পর্বের সমাপ্তিসূচক শ্লোকটি কাশীরাম লিখতে পারেন না। সুতরাং তার সাক্ষ্যেরও কোন মূল্য থাকে না।

কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর মহাভারতের অনুবাদের ভূমিকায় এই প্রবাদ-শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন,

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর ॥

এখানেও বলা হয়েছে কাশীরাম বিরাটপর্বের কিয়দংশ লিখে পরলোকগমন করেছিলেন। সুতরাং রচনাকালসূচক শ্লোকটির বিরুদ্ধে এখানেও সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু অনুকূল সাক্ষ্যেরও অভাব নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৩৪নং পুঁথিতে পাওয়া গেছে,

ধন্য ধন্য কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
চারিপর্ব্ব ভারতের করিলা প্রকাশ ॥
আদি সভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি ॥

এই উক্তিই ঠিক্ বলে আমরা মনে করি। অতএব বিরাট পর্বটি কাশীরাম দাসেরই রচিত এবং ১৬০৪-০৫ খৃষ্টাব্দেই তা সম্পূর্ণ হয়েছিল বলা যায়।

কাশীরামদাসের মহাভারতের আদিপর্বের একটি পুঁথিতে এইভাবে হেঁয়ালীতে রচনাকাল দেওয়া আছে,

শকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিনগুণে।
রুক্মিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে ॥

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় এই হেঁয়ালীর এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "পঞ্চাননের পাঁচ মুখেই বিধু। অতএব বিধুমুখ = ৫। ইহার তিনগুণ = ১৫। রুক্মিণীনন্দন কাম, কামের পঞ্চশর। 'অঙ্ক' শব্দ দ্ব্যর্থ; ১৫, এই অঙ্কের ৫ অঙ্ক; এবং অঙ্কে কোলে, দুই বাহুতে। অর্থাৎ ৫ এর পর দুই। জলনিধি, সাগর = ৪। সমুদয় অঙ্ক ১৫২৪ শক।"

আচার্য যোগেশচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা মানতে কয়েকটি কারণে অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, আদি ও বিরাটপর্বের রচনাসমাপ্তিকালের ব্যবধান যদি মাত্র দু' বছর হয়, তাহলে বলতে হবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই কাশীরাম সভা, বন ও বিরাট এই তিনটি বৃহদায়তন পর্বের রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, 'রুক্মিণীনন্দন অঙ্কে' পদের যে ব্যাখ্যা আচার্য্য যোগেশচন্দ্র দিয়েছেন, তা কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয়। আর মদনের পাঁচ শর বলে মদন=৫ বোঝাবে কেন ? 'মদন' শব্দ ১৩ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত হেঁয়ালীর ব্যাখ্যা এই :—

বিধুমুখ তিনগুণে=১৫, রুক্মিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে=১৩+৪=১৭, অথবা ১৩+৭=২০।

অতএব ১৫১৭ শক (=১৫৯৫-৯৬ খৃঃ), বা ১৫২০ শক (=১৫৯৮-৯৯ খৃঃ) আদিপর্বের রচনাসমাপ্তিকাল বলে আমাদের ধারণা। মোটের উপর কাশীরাম দাসের মহাভারত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে রচিত হয়েছিল বললে ভুল হয়না।

কাশীরামদাস যে তাঁর নামে প্রচলিত মহাভারতের সবটা লেখেননি, তাতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। বিরাট পর্বের পরবর্তী পর্বগুলি তাঁর লেখা নয়। উদ্যোগপর্ব, দ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্বের পুঁথিতে নন্দরামের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং নন্দরাম অন্ততঃ উদ্যোগ থেকে কর্ণপর্ব অবধি লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

এসম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি "বিশ্বকোষ অফিসে রক্ষিত কাশীদাসী মহাভারতের একখানি প্রাচীন পুঁথি"তে এই ছত্রগুলি পেয়ে তাঁর সম্পাদিত কাশীরামদাসের মহাভারতের ভূমিকায় প্রকাশ করেন,

কাশীরাম দাশয় তিঁহ জ্যেষ্ঠতাত। মৃত্যুকালে আজ্ঞা কৈল শিরে দিয়া হাত ॥
আয়ু অবশেষ বাপু যাই পরলোকে। রচিতে না পালাঙ পোথা পাই বড় শোকে ॥
আশীর্ব্বাদ করি আমি বলিহে তোমারে। পাণ্ডব চরিত্র বাপু রচিবা আদরে ॥
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি ভাবি রাধা-শ্যাম। দ্রোণপর্ব্ব ভারত রচিল নন্দরাম ॥

ডঃ সুকুমার সেনও উদ্যোগপর্বের একটি পুঁথিতে এই কটি ছত্র পেয়েছেন,

কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা। ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা ॥
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহো খুল্লতাত। প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্ব্বাদ ॥

আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক। রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক॥
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে। রচিবে পাণ্ডব কথা পরম সাদরে॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেই জন। অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ॥
কাশীদাস মহাশয় আশীর্ব্বাদ দিল। তাঁহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল॥
(বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৪৫৮-৫৯)

সাহিত্যপরিষদের একটি উদ্যোগপর্বের পুঁথিতে (১২৪২ নং পুঁথি, ৩ পত্র) এই অংশটি পাওয়া গিয়েছে,

নন্দরামদাসে বলে শুন শ্যামরায়। আমারে অভয়প্রভু দেহ জন্ম-দায়॥
জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোক কালে। আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন। ভারত অমৃত তুমি করহ রচন॥
তাঁর আশীর্ব্বাদে আর ব্রাহ্মণ কৃপাতে। দিনে দিনে আশয় হৈল্য ভারত রচিতে॥

নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী হইতে সংগৃহীত ১০৮৩ সনের একখানি দামোদরের পদাবলীর উপর লিখিত হইয়াছে যে, ঐ বর্ষে ১৮ই ফাল্গুন কৃষ্ণতৃতীয়ার দিন নন্দরামদাসের মৃত্যু ঘটে" (বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা, পৃঃ ২৶৹)। অতএব এই সূত্রের সাক্ষ্য অনুসারে নন্দরামদাস ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

নন্দরামদাস কিন্তু কাশীরামদাসের অসম্পূর্ণ কাব্যকে সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "কাশীরামের নামে প্রচলিত কাব্যের শান্তি-পর্ব্ব কৃষ্ণানন্দ বসুর রচনা এবং স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব জয়ন্তদেবের রচনা।" জয়ন্তদেব সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "কোন কোন পুথিতে কচিৎ 'কাশীর নন্দন' ভণিতা দেখা যায়। স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের রচয়িতা জয়ন্তদেবের পিতার নাম কাশীদাস। কাশীরামের পদবীও দেব। সুতরাং আপাততঃ জয়ন্তদেবকে কাশীরামের পুত্র ধরা চলে। জয়ন্তের ভণিতা,—'জয়ন্ত রচিল কাশীদাসের নন্দন'। জয়ন্তদেবকে আমরাও কাশীরামের পুত্র বলে মনে করি।" কাশীরামদাসের মৃত্যুর সময়ে জয়ন্তদেব হয়তো অল্পবয়স্ক ছিলেন, তাই কাশীরাম ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামদাসকে তাঁর মহাভারত সম্পূর্ণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। কাশীদাসী মহাভারতের মৌষলপর্বও কাশীরামদাসের পুত্রের রচনা, কেননা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি মৌষলপর্বের পুঁথিতে এই ভণিতা পাওয়া গেছে,

কাশীর নন্দন কহে অমৃতের সার। ইহা রচি পিতা মোর গেলা স্বর্গদ্বার॥

কাশীরামদাসের অসমাপ্ত মহাভারত যাঁরা পূরণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম ও পুত্র জয়ন্তদেব অন্ততপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় অবধি নিশ্চয়ই বর্তমান ছিলেন। এঁদের রচনার মাঝখানের পর্বগুলি যাঁদের লেখা, তাঁরাও তাহলে ঐ সময়েরই লোক হবেন। গায়েন ও লিপিকরদের কল্যাণে এঁদের ভণিতা বাদ পড়ে ক্রমশঃ সমগ্র মহাভারতখানাই কাশীরামদাসের নামে চলে গেছে।

॥ সাতাশ ॥

গোবিন্দদাস

(কালিকামঙ্গল-রচয়িতা)

গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলই বোধহয় এই শ্রেণীর সমস্ত কাব্যের মধ্যে প্রাচীনতম। এর পুঁথির (এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি, নং A 21) শেষে এই রচনাকাল-নির্দেশক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

"মুনি মক্ষর বাণ শশী সকল পরিমিত।
এই কালে রচিল কালীকা চণ্ডীর গীত॥"

মুনি=৭; কেউ কেউ মক্ষর=অক্ষর=ব্রহ্ম=১ ধরেন, কিন্তু এই গণনা কষ্টকল্পনার পর্যায়ে পড়ে। মক্ষর 'পক্ষ' শব্দের বিকৃতরূপ ধরাই যুক্তিসঙ্গত সুতরাং শব্দটির অর্থ ২। বাণ=৫, শশী=১। 'সকল' 'শক' শব্দের বিকৃত রূপ। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাব্যটির রচনাকাল ১৫২৭ শকাব্দ বা ১৬০৫-০৬ খৃষ্টাব্দ।

॥ আটাশ ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অধিকাংশ পুঁথির শেষে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।

সূর্যোঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

সিন্ধু=৭, অগ্নি=৩, বাণ=৫, ইন্দু=১ ধরে প্রায় সকলে ১৫৩৭ শকাব্দই চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল বলে মনে করেন। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে 'সিন্ধু' শব্দের অর্থ ৪। অতএব 'শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ'র অর্থ ১৫৩৪ শকাব্দও হতে পারে। ১৫৩৭ শকে সৌরমত ও গৌণচান্দ্র মত অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি রবিবারে পড়েছিল আর ১৫৩৪ শকে মুখ্যচান্দ্র মত অনুযায়ী ঐ তিথি রবিবারে পড়েছিল। অতএব 'চৈতন্যচরিতামৃত' ৭ই জুন, ১৬১২ বা ৭ই মে, ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

'প্রেমবিলাসে'র ২৪শ বিলাসে উপরোদ্ধৃত শোকটির একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়, তাতে 'সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌর জায়গায় 'অগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ' (১৫০৩) লেখা আছে। কিন্তু এই পাঠান্তরের কোন মূল্য নেই। কারণ প্রথমতঃ, এই ২৪শ বিলাস জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, ১৫০৩ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি রবিবারে পড়েনি। তৃতীয়তঃ, তখনও জীব গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' সম্পূর্ণ হয়নি। 'গোপালচম্পূ'র পূর্বভাগ ১৫১০ শক বা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে এবং উত্তরভাগ ১৫১৪ শক বা ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সম্পর্ণ হয়। চরিতামৃতে 'গোপালচম্পূ'র উল্লেখ আছে।

অবশ্য কয়েকটি যুক্তি থেকে মনে হয় চৈতন্যচরিতামৃত ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়েছিল। সেগুলি এই :—

(১) প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের মতে শ্রীনিবাস আচার্য যখন বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণবগ্রন্থ নিয়ে বাংলায় আসেন (আঃ ১৫৭২ খৃঃ), তখন 'চৈতন্য-

চরিতামৃত'ও এনেছিলেন, বীর হাম্বীরের লোকেরা তা লুঠ করে এবং এই খবর শুনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রাণত্যাগ করেন।

(২) পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি গ্রন্থের মতে চৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময় রঘুনাথ দাস, গোপালভট্ট ও জীব গোস্বামী জীবিত ছিলেন। এঁরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক বা তার আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এঁদের জীবিত থাকা অসম্ভব।

(৩) চরিতামৃতে কৃষ্ণদাসের ভাষা থেকে মনে হয়, তিনি 'চৈতন্য-ভাগবত'কার বৃন্দাবনদাস ও ভূগর্ভ গোস্বামীর আদেশ পেয়েছিলেন। বৃন্দাবন-দাস অতদিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না এবং ভূগর্ভ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের আগেই পরলোকগমন করেছিলেন। এছাড়া কৃষ্ণদাস গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্তী ও রূপগোস্বামীর সঙ্গী যাদবাচার্য গোস্বামীর আজ্ঞা পেয়েছিলেন। এঁদেরও অতদিন বাঁচা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

(৪) চরিতামৃতে শ্রীনিবাস আচার্যের কোন উল্লেখ নেই। অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শ্রীনিবাসের প্রভাব ও খ্যাতি চরমে পৌঁছেছিল।

প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে বলা যায়, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের আলোচ্য উক্তি যে সর্বৈব মিথ্যা, তা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করেছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ৩২৩-৩২৬)। ভক্তিরত্নাকরে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই, বরং এর বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে (ঐ, পৃঃ ৩২৪-৩২৫)।

দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা যায়, রঘুনাথ দাস, গোপালভট্ট ও জীব গোস্বামী যদি ঐ সময়ে জীবিত থাকতেন, তাহলে চরিতামৃত রচনা করার আগে কৃষ্ণদাস তাঁদের আজ্ঞা নিতেন। তিনি তাঁর আজ্ঞাদানকারীদের নামের যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে ছয় গোস্বামীর মধ্যে কারও উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, তাঁরা তার আগেই পরলোকগমন করেছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র "সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার" উক্তি থেকে বোঝায় না, রঘুনাথ দাস ঐ সময় জীবিত ছিলেন। গোপালভট্ট দাক্ষিণাত্যের লোক, সুতরাং তিনি চরিতামৃত রচনার সময় জীবিত থাকলে চরিতামৃতের মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ বর্ণনায় স্থান নির্দেশে অত গোলযোগ ঘটত বলে মনে হয় না। বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত পূর্বোক্ত পাতড়ার (এই বইএর ১৫৬-১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) মতে জীব গোস্বামী ১৬১০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস ১৬১০ খৃঃর পরেও চরিতামৃত রচনা সুরু করতে পারেন।

তৃতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা চলে, কৃষ্ণদাস কয়েক জায়গায় বৃন্দাবনদাসের আজ্ঞার উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু এ আজ্ঞা বোধহয় সাক্ষাৎ আজ্ঞা নয়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান। তাঁর আজ্ঞা লয়ে লিখি যাহাতে কল্যাণ॥" ধ্যানযোগে আজ্ঞা নিতে বৃন্দাবনদাসের জীবিত থাকার দরকার হয় না। ভূগর্ভও কৃষ্ণদাসকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। "পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি। গৌরকথা বিনা যাঁর মুখে অন্য নাই॥" লিখেই কৃষ্ণদাস ভূগর্ভের শিষ্য চৈতন্যদাসের আজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যদাসের গুরু হিসেবেই এখানে ভূগর্ভের উল্লেখ বলে মনে হয়। এই উল্লেখে কৃষ্ণদাস বর্তমানকালের ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না, কারণ তিনি চৈতন্য-পরিকরদের নিত্যত্বে বিশ্বাস করতেন। শিবানন্দ চক্রবর্তী ও যাদবাচার্য গোসাঞি সম্ভবতঃ অত্যন্ত দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন।

চতুর্থ যুক্তি সম্বন্ধে বলা চলে, শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। চৈতন্যদেবের তিরোধানের অনেক পরে তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেতা হয়েছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যদেবেরই জীবনকাহিনী, চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কথাও তার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। চৈতন্যপরবর্তীকালের বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস বর্ণনা তার লক্ষ্য ছিল না। এই কারণে শ্রীনিবাস আচার্য তার মধ্যে উল্লিখিত হননি। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, ও অদ্বৈতের শিষ্যদের নামের তালিকা দিয়েছেন, কিন্তু শ্রীনিবাস ছিলেন গোপাল ভট্টের শিষ্য। এজন্যেও তাঁর উল্লেখ নেই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপালচম্পূর উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি স্মার্ত রঘুনন্দনের 'একাদশীতত্ত্ব' ও 'উদ্বাহতত্ত্ব' থেকেও শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন (চৈ. চ. ১।১৫।৩ শ্লোক ও ১।২।১৪ শ্লোক)। ঐ দুই বই সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের আগে সুদূর বৃন্দাবনে এই অবৈষ্ণব গ্রন্থকারের গ্রন্থ এত উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এই সব বিষয় বিচার করলে ১৬১২ বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দকেই 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাসমাপ্তিকাল বলে নির্দেশ করা যায়।

এখন, কৃষ্ণদাসের জীবৎকাল সম্বন্ধে অন্যান্য যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার

সঙ্গে ১৬১২ বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করার সামঞ্জস্য থাকে কিনা দেখা যাক্। প্রথমে বয়সের প্রশ্ন বিবেচনা করা যাক্। চরিতামৃতের আদি লীলার ৫ম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস বলেছেন যে, তাঁর ভাইয়ের শ্রীচৈতন্যের উপর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের উপর ছিলনা। ঝামটপুরে তাঁর বাড়ীতে একদিন অহোরাত্র সংকীর্ত্তন হয়েছিল। সেইদিন তাঁর ভাই নিত্যানন্দের শিষ্য রামদাসের সঙ্গে তর্ক করেন। কৃষ্ণদাস তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভাইকে ভর্ৎসনা করেন এবং রামদাসের কোপে তাঁর "ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥" ঐ রাত্রেই কৃষ্ণদাস স্বপ্নে নিত্যানন্দের দেখা পান এবং তাঁর আদেশেই তিনি বৃন্দাবনে চলে আসেন। বৃন্দাবনে এসে তিনি রূপ, সনাতন এবং অন্যান্য গোস্বামীদের সান্নিধ্য লাভ করেন। সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর রচনাকাল ১৪৭৬ শক—১৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দ। তারপরেও তিনি জীবিত ছিলেন, যদিও কতদিন জীবিত ছিলেন তা জানা যায় না। রূপ গোস্বামী সনাতনের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। যাহোক্, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ২৪।২৫ বছরের মত বয়সে বৃন্দাবনে এসেছিলেন ধরলে কোন দিক দিয়ে কোন অসঙ্গতি হয় না। তিনি শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের দর্শন পেয়েছিলেন বলে ঘুণাক্ষরেও জানাননি। তার কারণ এই মনে হয়, তাঁর শৈশব বা বাল্যেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। ২৪।২৫ বছর বয়সে তাঁর পক্ষে বাড়ীতে অহোরাত্র সঙ্কীর্তন দেওয়া, ছোট ভাইএর সঙ্গে তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক ও গৃহত্যাগ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, ঐ বয়সে চৈতন্যদেব কি করেছিলেন তা মনে রাখলেই একথা বোঝা যাবে।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম ধরলে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তাঁর বয়স ৮০ বছরের উপর হয়। ঐ বয়সে এরকম একখানি উচ্চাঙ্গের বই লেখা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললে বলব, প্রতিভাবান লোকের পক্ষে একাজ করা সম্পূর্ণ সম্ভব। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অনেক বই ৮০ বছর পার হবার পরে লেখা। বিশেষ করে কৃষ্ণদাস নিজেই যখন বলেছেন গ্রন্থরচনার সময় তিনি 'জরাতুর', তখন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। এই জরার জন্যেই চৈতন্যদেবের মধ্যলীলার মাঝখানেই তিনি খাপছাড়া ভাবে অন্ত্যলীলার

সূত্রগুলি বর্ণনা করেছেন এবং অন্ত্যলীলার উপক্রমে সে কথার উল্লেখ করে এই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন,

আমি জরাগ্রস্ত—নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্য কোন কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন॥

সুতরাং কবির বয়স ঐ সময় ৮০ বছরের বেশী ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কবির অতিবার্ধক্যের জন্যই সম্ভবতঃ তাঁর কাব্যের স্থানে স্থানে ছন্দপতন দেখা যায়।

॥ উনত্রিশ ॥

ব্রজমোহন দাস

ব্রজমোহন দাস 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ' নামে যে চৈতন্যচরিতগ্রন্থ রচনা করেন, তার একখানি পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে বলে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। তিনি এই অপ্রকাশিত গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতও করেছেন। (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা, পৃঃ ৯৪ এবং 'যুগান্তর', ৮ই মার্চ, ১৯৫৫ দ্রষ্টব্য)।

এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জন্মের তারিখটি বার, মাস ও তিথি সমেত সঠিকভাবে পাওয়া যায়,

শাকে চৌদ্দশত আর সপ্ত বৎসর। বিষ্ণুবিংশতি তৃতীয় বৎসর অন্তর ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা বার রবিসুত জান। ত্রয়োবিংশ দিনে আবির্ভাব ভগবান ॥

মহাপ্রভুর বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে এই গ্রন্থের বর্ণনা এই,

গঙ্গাদাস দ্বিজস্থানে পড়িবারে দিল। অল্পে অধ্যাপক প্রভু সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল ॥
পড়িল সকল বিদ্যা করি গুরু লক্ষ্য। অষ্টাদশ বিদ্যাএতে প্রভু হৈলা দক্ষ ॥

এই বইতে বাসুদেব সার্বভৌমের একটি নতুন বচনও পাওয়া যায়,

শুন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বচন।
তথাহি—অবতরতি জগত্যাং কৃষ্ণচৈতন্যদেবে
ন ভবতি বিমলা ধীর্যস্য তস্যৈব ন স্যাৎ।
উদয়তি দিননাথে সৎপথে যস্য দৃষ্টি (:)
প্রসরতি নহি কিম্বা তস্য শক্তা তমিস্রে ॥

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বৃন্দাবনদাস ও মুরারির চরিতগ্রন্থ ইহার উপাদান এবং গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে চৈতন্যচরিতামৃতের (১৩।১ পত্রে) এবং 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী'র বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির "লিপিকাল ১৬২৫ শক ১৩ ফাল্গুন" অর্থাৎ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

॥ ত্রিশ ॥

গদাধর দাস

গদাধর দাস কাশীরাম দাসের অনুজ। তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গল' নামে একটি কাব্য পাওয়া গেছে। কাশীরামদাস নিজের বংশ ও বাসস্থান সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়েছেন, গদাধরদাস তার চেয়ে বেশী খবর দিয়েছেন।

জগন্নাথমঙ্গলের রচনাকাল গদাধরদাস এইভাবে নির্দেশ করেছেন,

চতুঃষষ্টি শকাব্দ সহস্র পঞ্চ শত। সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত॥
রাজচক্রবর্ত্তী শাহ-জাঁহা দিল্লিপতি। ধর্ম্মন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতী॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ। মহান প্রতাপী হয় বৈরীজয়যশ॥

সুতরাং শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে ও ১৫৬৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথমঙ্গল সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এখানে ১৫৬৪ শকাব্দ ও ১০৫০ সনের একত্র উল্লেখ থাকাতে একটু গোলযোগ হচ্ছে। কারণ শকাব্দকে অতীতাব্দ হিসাবেই সর্বত্র ব্যবহার করা হয় এবং বাংলা সনের সঙ্গে তার ব্যবধান ৫১৫ বছর। শকাব্দ কখনও কখনও চলতি বছর (current year) হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এবং তখন বাংলা সনের সঙ্গে তার ব্যবধান হয় ৫১৬ বছর। কিন্তু এখানে শকাব্দের সঙ্গে বাংলা সনের ব্যবধান ৫১৪ বছর। তাহলে কি এই উল্লেখে কিছু ভুল আছে? তা যে নেই, তার প্রমাণ পেয়েছি। আমরা আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেয়েছি, তাতেও শকাব্দের সঙ্গে বাংলা সনের ৫১৪ বছরের ব্যবধান।

প্রথমটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০৮৬ নং পুঁথির পুষ্পিকা। এটি অবিকল উদ্ধৃত করছি, "শকাব্দ ১৬৩৮ ॥ শক ॥ সন ১১২৪ সাল॥ মাহ ১৭ আষাঢ় রোজ রবিবার বেল ১ এক প্রহরের কালে সমাপ্ত হইল মোকাম রাধানগর পঁড়ুয়া পরগনে ভুরশীট তালুক শ্রীযুত কিত্তিচন্দ রায়ের। আমীন বাবুলাল বেহারি। তস্য ভেজুয়া আমীন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বাদসাহা শ্রীল শ্রীযুত ফররক সাহাজি (ফারুকশিয়র)॥

১৬৩৮ শকের ১৭ ই আষাঢ় রবিবারেই পড়েছিল।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিশ্বভারতীর ১৫৯ নং পুঁথির পুষ্পিকা। এতে আছে,

ইতি সন ১১৯৫ সালের আখেরি। তারিখ ২৯ জ্যৈষ্ট, রোজ মঙ্গলবার।

সক ১৭১১ সতের সও এগার। লিখিতং কাসিনাথদাস বসু ॥ (পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯২ দ্রঃ)

১৭১১ শকের ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবারেই পড়েছিল।

তৃতীয়টি হচ্ছে রামেশ্বরের শিবায়নের একটী পুঁথির পুষ্পিকা। এতে এই লিপিকাল দেওয়া আছে,

শকাব্দ ১৬৭১ ইতি সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৫ই মাঘ রোজ বুধবার (বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫)।

১৬৭১ শকের ৫ই মাঘ বুধবারেই পড়েছিল।

চতুর্থটি হচ্ছে পরশুরামের 'শ্রীবৎসচিন্তা উপাখ্যানে'র রচনাকাল। একটি পুঁথিতে রচনাকালটি এইভাবে পাওয়া যায়,

শকাব্দা পঞ্চদশ [শত] ভাদ্র মাস। চৌরাশী দশমী কৃষ্ণপক্ষে পরকাশ ॥
অষ্টাবিংশতি দিন বৃহস্পতিবারে। সন হাজার সত্তরি সাল……॥

১৫৮৪ শকের ভাদ্রমাসের ২৮শে তারিখে কৃষ্ণাদশমী তিথি ও বৃহস্পতিবার ছিল।

এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে :—

(১) জগন্নাথমঙ্গলে শক ও সনের উল্লেখে কোন ভুল নেই।

(২) আগে এদেশে অন্ততঃ কোন কোন অঞ্চলে এমন এক "সন" প্রচলিত ছিল. যার সঙ্গে শকাব্দের ব্যবধান ছিল ৫১৪ বছর এবং খৃষ্টাব্দের ব্যবধান ছিল ৫৯২ বছর।

যাহোক ১৬৩২ খৃষ্টাব্দেই যে গদাধরদাস 'জগন্নাথমঙ্গল' সম্পূর্ণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্কন্দপুরাণের উৎকল-খণ্ড অবলম্বনে জগন্নাথমঙ্গল রচিত হয়। স্কন্দপুরাণ অর্বাচীন হলেও তা যে ষোড়শ শতাব্দীর পরে রচিত নয় তা এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

॥ একত্রিশ ॥

শিবরাম ঘোষ

শিবরাম ঘোষের লেখা দুইখানি কাব্যের সন্ধান এপর্যন্ত পাওয়া গেছে। প্রথমটির নাম কালিকামঙ্গল, যদিও কাব্যের বিষয়বস্তু বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ সিংহাসনের গল্প। "ইহাতে বত্রিশ সিংহাসনের গল্পের মধ্য দিয়া কালীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে। তাই ইহার নাম কালিকামঙ্গল। পুত্তলিকা-গুলির নামের মধ্যেও কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। দুঃখের বিষয়, প্রাপ্ত পুথিখানি অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাতে সমস্ত পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী পাওয়া যায় না। মাত্র বারটি পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী ইহাতে আছে। কাহিনীগুলিতে কালীভক্ত বিক্রমাদিত্যের পূর্ব ও বর্তমান জীবনের বৃত্তান্ত আনুপূর্বী অনুসারে বিবৃত হইয়াছে—কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনার বর্ণনামাত্র ইহাদের উপজীব্য নয়।" (সা. প. প. ১৩৪৯, পৃঃ ১৩০)

অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর একাধিক প্রবন্ধে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্যটির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এর পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে (নং ১৫৫৮)।

শিবরাম ঘোষের আর একটি রচনা 'একাদশীর পাঁচালী'। এর ১১৭৩ সালের (১৭৬৬-৬৭ খৃঃ) পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ১০৪৫-এ এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। 'কালিকামঙ্গল ও 'একাদশীর পাঁচালী'র রচয়িতা যে অভিন্ন, তার প্রমাণ আমরা দিচ্ছি। 'কালিকামঙ্গলে' "রাজেন্দ্র ঘোষের সুত রচিল কৌতুকে" ও "রাধিকানন্দন শিবরাম ঘোষ ভনে' উক্তি পাওয়া যায় (সা. প. প. ১৩৪৯, পৃঃ ১৩৯)। আর একাদশীর পাঁচালীতে আছে,

বাপ রাজেন্দ্র ঘোষ রাধিকা জননী।
মহাগুরু দুইজন বন্দো পুটপাণি ॥

দুটি রচনাতেই যখন কবির পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ এবং মাতার নাম রাধিকা বলে উল্লিখিত হয়েছে, তখন দুটির কবি নিশ্চয়ই অভিন্ন।

'কালিকামঙ্গলে' কবির সময়ের কোন হদিশ পাওয়া যায়না। কিন্তু একাদশীর পাঁচালীতে পাওয়া যায়,

শশি শূন্য রস অগ্নি শকের বৎসর।
পাৎসা অরং সাহা ডিল্লি ঈশ্বর॥

এখানে স্পষ্টই অঙ্কের দক্ষিণা গতি। ডঃ সুকুমার সেন 'শক' অর্থে বঙ্গাব্দ ধরেছেন এবং "রচনাকাল ১০৬৩ সাল (১৬৫৬-৫৭)" বলেছেন। কিন্তু ১৬৫৭-৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লির সম্রাট ছিলেন সাজাহান, অরং সাহা বা ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যের সুবেদার মাত্র। অতএব এখানে শুদ্ধ পাঠ "শশী রস শূন্য অগ্নি শকের বৎসর" ছিল বলে মনে করি। ১৬০৩ শক বা ১৬৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব বাদ্‌শাহ ছিলেন। এইটিই 'একাদশীর পাঁচালী'র রচনাকাল।

॥ বত্রিশ ॥

ভবানন্দ

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে লেখা প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলির মধ্যে ভবানন্দের হরিবংশ অন্যতম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ভবানন্দের জীবৎকাল এতদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। হরিবংশের যে সমস্ত পুথি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনখানির লিপিকাল ১০৯৬ বঙ্গাব্দ বা ১৬৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দ। অন্যান্য পুঁথির সঙ্গে তুলনা করলে এই পুঁথিতে নানা অসঙ্গতি ও কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আবিষ্কার করা যায়। এই কারণে পুঁথির লিপিকালের অন্ততঃ বছর পঞ্চাশ আগে অর্থাৎ অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভবানন্দের জীবৎ-কাল নির্দ্ধারণ করতে হয়।

ভবানন্দ নিজেকে 'শিবানন্দ সুত' বলেছেন. এছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কোন তথ্য হরিবংশ থেকে পাওয়া যায় না। তাঁর অন্য কোন বই এর নামও আমরা শুনিনি।

কিন্তু ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Aspects of early Assamese literature গ্রন্থে (p. 248) U. C. Lekharu হরিবংশের লেখক হিসেবে "One Bhavananda Misra, son of Sivananda"র নাম করেছেন। ভবানন্দের 'মিশ্র' উপাধির উল্লেখ এইখানেই প্রথম পেলাম। ঐ লেখক ভবানন্দের সময় সম্বন্ধে বলেছেন, "In his Govinda Carita the poet refers to the patronage of Candranarayana, king of Darrang (1565-1582 Saka)." সুতরাং ভবানন্দ ১৬৪৩ থেকে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

॥ তেত্রিশ ॥

দৌলত কাজী ও আলাওল

দৌলত কাজী ও আলাওল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দুই স্তম্ভ। প্রাচীন যুগের বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে এঁরাই শীর্ষস্থানীয়। শুধু তাই নয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধর্ম-অসম্পৃক্ত লৌকিক রচনার যা সামান্য কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তার মধ্যে এঁদের দানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দুই বাঙালী মুসলমান কবি আরাকান দেশের অবাঙালী ও অমুসলমান রাজাদের সভায় থেকে বাংলা কাব্য রচনা করেছিলেন।

এই দুই কবির মধ্যে কি সময়ের দিক দিয়ে, কি কবি হিসাবে দৌলত কাজীই অগ্রগণ্য। আরাকানরাজ থিরি-থু-থম্মার রাজত্বকালে (১৬২২-১৬৩৮ খৃঃ) তাঁর অমাত্য আশরফ খানের আজ্ঞায় দৌলত কাজী 'সতী ময়নামতী' কাব্য রচনা করেন। অবশ্য থিরি-থু-থম্মা ১৬২২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করলেও ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের আগে যে তাঁর অভিষেক হয়নি এবং অভিষেকের আগেই যে দৌলত কাজীর কাব্য রচিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত সাহিত্য-প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭-৮ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দৌলত কাজী কাব্য রচনা করেছিলেন। অবশ্য দৌলত কাজী তাঁর কাব্য অসম্পূর্ণ রেখেই দেহত্যাগ করেন।

আলাওলের বিভিন্ন গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করাও বিশেষ দুরূহ নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'পদ্মাবতী' লেখা হয়েছিল মাগন ঠাকুর নামে জনৈক রাজপুরুষের আজ্ঞায়। আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী'তে লিখেছেন যে, আরাকানরাজ 'নৃপদগ্রী' বা নরপদিগ্যির (১৬৩৮-১৬৪৫ খৃঃ) মৃত্যুর পর যখন তাঁর কন্যা 'জশাশিনি' (যশস্বিনী) সিংহাসনে অরোহণ করেন, তখন শৈশবকাল থেকে যে মাগন ঠাকুরকে তিনি পাত্রের পদে অধিষ্ঠিত দেখে আসছেন, তাঁকে মুখ্য পাত্র নিযুক্ত করেন,

যখন আছিল নৃপদগ্রী সিংহাসনে। জশাশিনি কন্যা তান আছিল ভবনে ॥

....

বৃদ্ধ নরপতি যদি হইল স্বর্গবাসী। জশাশিান কন্যা বার দিল তক্তে আসি ॥
শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি। মোক্ষ (মুখ্য) পাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী ॥

(সা. প. প., ১৩৩৩, পৃঃ ৮০)

কিন্তু আরাকানদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, নরপদিগিগ্যির মৃত্যুর পর থদো মিন্তার রাজা হন এবং ১৬৪৫ থেকে ১৬৫২ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পদ্মাবতীতে 'থদো মিন্তার' এর নাম রয়েছে 'সাদ উমংদার' রূপে।

মিম্বি মহারাজবংশ যগুপি হইল ধ্বংস নৃপদগ্রী হইল রাজ্যপাল
রাজ্যসুখভোগ মূল কি দিব তাহার তুল রস ভোগে গোঙাইল কাল ॥
এক পুত্র এক কন্যা সংসারেতে ধন্য ধন্যা জন্মিলেক নৃপতিসম্ভব।
চলিতে ত্রিদিস (ত্রিদিব) স্থান পুত্র কন্যা রাজ্যদান যারে দেখি লজ্জিত বাসব॥
সাদ উমংদার নাম রূপে গুণে অনুপাম মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেক।
দেখিতে সুচারু মুখ লোকের নয়ানশুখ জিনি পূর্ণচন্দ্র পরতেক ॥

(ঐ, পৃঃ ৬৩, ৭৯)

এর থেকে মনে হয় থদো-মিন্তার ও 'জশাশিনী' ভাইবোন এবং পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা যৌথভাবে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু আরাকানদেশের ইতিহাসে লেখা আছে, থদো মিন্তার নরপদিগিগ্যির ভ্রাতুষ্পুত্র। আর আলাওল তাঁর 'সয়ফুল-মলুক বদিউজ্জমাল'এ বলেছেন যে 'নৃপতিগিরি' বা নরপদিগিগ্যির কন্যা ছিলেন থদো-মিন্তারের স্ত্রী, এবং পরবর্তী রাজা 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা' বা 'থিরি সান্দ থুথম্মা'র জননী,

নৃপতিগিরির কন্যা পরমসুন্দরী। চদো নৃপতির ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী ॥
চদো উমংদার যদি গেল পরলোকে। ব্রতধর্ম্ম আচরি রহিল স্বামী শোকে ॥
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা নৃপতি শিশু দেখি। সকল অমাত্যগণ হইল একমুখী ॥

....

মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হইল যশস্বিনী। মুখ্য অমাত্য হইল মাগণ গুণমণি ॥
(আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৩৪ থেকে আমরা এই অংশ উদ্ধৃত করলাম। অন্যত্র এই অংশটির নানারকম পাঠান্তর পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের

মধ্যে অর্থসঙ্গতি ও ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতির ভাব। তাই উপরে উদ্ধৃত পাঠকেই প্রকৃত পাঠ বলে মনে করি।)

দেখা যাচ্ছে, এবারও মাগন ঠাকুরই রাজ্যের প্রধান কর্তা হলেন। যাহোক্, খদো-মিন্তারের সঙ্গে নরপদিগ্যির মেয়ের বিবাহের কোন কথা 'পদ্মাবতী'-তে নেই, তাতে লেখা আছে নরপদিগ্যির জীবদ্দশায় সিদ্দিক বংশীয় এক মুসলমানের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ হয়েছিল,

এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে। ধার্ম্মিক মোসলমান সিদ্দিকের বংশে॥
নানা গুণে শ্রীমন্ত মহৎ কুল শীল। তাঁহাকে ডাকিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল॥
(সা. প. প., ১৩৩৩, পৃঃ ৮০)

নরপদিগ্যির যে একটি মাত্রই মেয়ে ছিল, তাও 'পদ্মাবতী'র পূর্বোদ্ধৃত অংশ থেকে জানা যায়। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, খদো-মিন্তার নরপদিগ্যির ছেলে ছিলেন না এবং নরপদিগ্যির কন্যার দুবার বিবাহ হয়েছিল—প্রথমবার জনৈক সিদ্দিক বংশীয় মুসলমানের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়-বার খদো মিন্তারের সঙ্গে, সম্ভবতঃ রাজনৈতিক প্রয়োজনে। আলাওলের 'পদ্মাবতী'তে কেবলমাত্র প্রথম বিবাহেরই উল্লেখ থাকায় সহজেই বোঝা যায় যে নরপদিগ্যি-তনয়ার সঙ্গে খদো-মিন্তারের বিবাহের আগেই এই বই লেখা হয়েছিল। এই বিবাহ ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পরে ঘটেনি, কেননা বিবাহের পরে অন্ততঃ একটি সন্তানের ('শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা') জন্ম হয় এবং খদো-মিন্তার ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে মারা যান। সুতরাং ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের আগে, ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে আলাওলের 'পদ্মাবতী' রচিত হয়েছিল।

আরও একটি বিষয় থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায়। 'সয়ফুলমুল্লুক-বদিউজ্জমাল'এ আলাওল লিখেছেন যে, তিনি যখন পদ্মাবতী লিখেছিলেন, তখন তাঁর বুদ্ধি ও শক্তি ছিল। কিন্তু মাগন ঠাকুর যখন তাঁকে 'সয়ফুল-মুল্লুক' রচনা করতে আদেশ দেন, তখন বার্ধক্যহেতু তাঁর কর্মশক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। আমরা একটু পরেই দেখাব, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের কয়েক বছর আগে মাগন আলাওলকে 'সয়ফুলমুল্লুক' রচনা করতে আদেশ দেন। 'পদ্মাবতী' নিঃসন্দেহে তার বহু আগের রচনা। সুতরাং ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দই 'পদ্মাবতীর রচনাকালের নিম্নতম সীমা।

এবার উর্ধ্বতম সীমা দেখা যাক্। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে নরপদিগ্যি পরলোক গমন করেন। আলাওল পদ্মাবতীতে লিখেছেন, নরপদিগ্যির মৃত্যুর পরে তাঁর

কন্যা মুখ্য পাটেশ্বরী হন, তার পরে তিনি মাগনকে মুখ্য পাত্রের পদে নিযুক্ত করেন, তারপর মাগনের সঙ্গে আলাওলের পরিচয় হয়, তারপর মাগনের সভায় আলাওল কিছুকাল কাটাবার পর মাগন আলাওলকে 'পদ্মাবতী' রচনা করতে বলেন। সমস্ত ঘটনা ঘটতে অন্ততঃ দু'বছর সময় নিশ্চয়ই লেগেছিল। 'পদ্মাবতী' রচনা করতে আরো অন্তত: এক বছর লেগেছিল ধরতে পারি। সুতরাং ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের আগে 'পদ্মাবতী'র রচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। অতএব ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দই 'পদ্মাবতী'র সম্ভাব্য রচনাকাল।

'পদ্মাবতী'কে অনেকে আলাওলের প্রথম বয়সের রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু এই অনুমানের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে 'পদ্মাবতী' রচিত হয়েছিল। মাগন ঠাকুর আরাকানরাজ নৃপদগ্রী অর্থাৎ নরপদিগিগ্যির আমলে অর্থাৎ ১৬৩৮-১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজার পাত্র ছিলেন, নরপদিগিগ্যির কন্যা 'রুশাশিনী' শৈশবকালে তাঁকে পাত্রের পদে অধিষ্ঠিত দেখেছেন। সুতরাং মাগনঠাকুরের জন্ম বোধহয় ১৬০০ খৃষ্টাব্দের পরে হয়নি। এই মাগন ঠাকুর ছিলেন আলাওলের শিষ্য। 'সয়ফুল মুল্লুক-বদিউজ্জমাল'এ আলাওল লিখেছেন,

এক যে প্রসঙ্গ আর রসের কৌতুক। শ্রীযুত মাগন মনে হৈল অতি সুখ ॥
আমারে বলিলা গুরু কর অবধান। ফারসীর ভাষা এই প্রসঙ্গ পুরাণ ॥

'সয়ফুল মুল্লুকে'ই দেখি, সৈয়দ মুসা আলাওলকে বলছেন,

পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীযুক্ত মাগন। আছিল তোমার শিষ্য মোর বন্ধুজন ॥

অতএব মাগনের গুরু আলাওলের জন্মসালও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী নয়। সুতরাং ৪৫ বছর বয়সের পরে আলাওল 'পদ্মাবতী' লিখেছিলেন সন্দেহ নেই।

থদো-মিন্তারের মৃত্যুর পরে অর্থাৎ ১৬৫২ খৃষ্টাব্দের পরে মাগন ঠাকুরেরই আজ্ঞায় আলাওল 'সয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জমাল' লিখতে সুরু করেন, কিন্তু মাগনের মৃত্যুর ফলে এই বই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তারপর শাজাহানের ছেলে শুজা আরাকানে আসেন,

মহাদেবী মুখ্য পাত্র শ্রীযুত মাগন। সয়ফুল মুলুক গ্রন্থ করাইল রচন ॥
সাঙ্গ না হইতে পুথী পাইল পরলোক। কতকাল মোর মনে আছিল সে শোক।
তার পাছে শাহ শুজা নৃপ কুলেশ্বর। দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর ॥

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে শুজা রোসাঙ্গে আসেন। সুতরাং তার আগেই এর প্রথমাংশ লেখা শেষ হয়েছিল।

'পদ্মাবতী' রচনার পর আলাওল আরাকানরাজ 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা' অর্থাৎ থিরি-সান্দ-থু-থম্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খৃঃ) মহাপাত্র সোলেমানের আদেশে দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করেন। এর শেষে আলাওল এই রচনাসমাপ্তিকাল দিয়েছেন,

মুসলমানী শক সংখ্যা শুন দিয়া মন। অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু শূন্য দেখিয়া আপনে ছুই দিগে। সুত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে॥
মগধির সনের শুনহ বিবরণ। যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন॥

অতএব ১০৭০ হিজিরা এবং ১০২০ মঘী সনে অর্থাৎ ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আলাওল 'সতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন উপরে উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে কোন পুরোনো পুঁথির লিপিসমাপ্তির তারিখ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ তারিখ যে গ্রন্থরচনাসমাপ্তিরই, তার প্রমাণ, আলাওল তাঁর লেখা অংশের সূচনায় " শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম সে নৃপ মহাশয় " এর উল্লেখ করেছেন।

আলাওলের পরবর্তী গ্রন্থ ইউসুফ গদা রচিত 'তোহফা' নামে আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমানী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ। এর সূচনায় আলাওল এইভাবে রচনাকাল নির্দ্দেশ করেছেন,

সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক। রচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মাণিক॥
ছুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল। আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল॥

এর থেকে বোঝা যায় ৭৯৫ হিজিরা বা ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে মূলগ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং তার ২৭৮ বছর পরে অর্থাৎ ১০৭৩ হিজিরা বা ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে আলাওল এর অনুবাদ আরম্ভ করেন। "রিতু যোগ অভ্র এক" (১০২৬) মঘী সন অর্থাৎ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ শেষ হয়েছিল বলে আলাওল জানিয়েছেন। এই অনুবাদও সান্দ-থু-থম্মার মহাপাত্র সোলেমানের আজ্ঞায় করা হয়েছিল।

ইতিপূর্বে আলাওল পূর্বোক্ত মাগন ঠাকুরের আজ্ঞায় 'সয়ফুলমুল্লুক-বদিউজ্জমাল' নামে একটি বই লিখতে সুরু করেছিলেন, কিন্তু মাগন ঠাকুরের মৃত্যুতে তাঁর আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। পরে সৈয়দ মুসা নামে একজন মহৎ ব্যক্তির আজ্ঞায় তিনি এই বই সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি 'মজলিস নবরাজ' উপাধিধারী কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আজ্ঞায় 'দারা সেকেন্দারনামা' নাম দিয়ে নেজামির লেখা ফার্সী কাব্য সেকান্দারনামা অনুবাদ করেন। অনেকে মনে করেন, 'মজলিস নবরাজ' ও 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা' একই লোক, এবং তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা 'দারা-সেকেন্দারনামা'র (?) এই উক্তি উদ্ধৃত করেন,

আসলেতে শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা নাম হয়। নব মজলিস বলি সর্ব্বলোকে কয়॥

(সা. প. প., ১৩৩৩, পৃঃ ৭৭)। কিন্তু 'দারা-সেকেন্দারনামা'র যে সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আমরা দেখেছি, তাদের একটিতেও এই শ্লোকটি পাইনি। 'মজলিস নবরাজ' যে মুসলমান ছিলেন, তার প্রমাণ 'দারা-সেকেন্দারনামা'তে তাঁর প্রতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের এই উক্তি,

আনন্দের স্থল মাত্র তোমার সমীপ। মোছলমানি দিনে তুমি উজ্জ্বল প্রদীপ॥
মছজিদ পুষ্কর্ণী দিয়া কৈলা বহু কাম। স্বদেশে বিদেশে পুণ্য তোমা কীর্ত্তি নাম।

অতএব তিনি আরাকানরাজের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "মজলিস নবরাজের দানে কবি রাজকর শোধ করিয়াছিলেন, সুতরাং মজলিস রাজা ছিলেন না।"

যাহোক, সয়ফুল-মুল্লুক ও দারা-সেকেন্দারনামার রচনাকাল নির্ণয় করা যায় এই দুই গ্রন্থে একটি বিখ্যাত ঘটনার উল্লেখ থেকে।

শাজাহানের পুত্র শুজা যখন ঔরংজেবের সেনাপতি মীরজুমলার কাছে পরাজিত হয়ে আরাকানরাজের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময়ে আলাওলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য হয়। কিন্তু কিছু পরেই আরাকানরাজের সঙ্গে শুজার বিরোধ হয় এবং শুজা সপরিজনে নিহত হন। মীরজা নামে একজন দুষ্টলোকের চক্রান্তে আলাওলও রাজরোষে পড়েন ও বন্দী হন। পঞ্চাশ দিন কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করার পরে আলাওল মুক্তিলাভ করেন। এই ঘটনার নয় বছর বাদে সয়ফুল-মুল্লুকে লেখা এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে কবি লিখেছেন,

এহি মতে বহি গেল নবম বৎসর। খণ্ড কাব্য রহিল পুস্তক মনুহর॥
ছৈদ মুছা নামে এক পুরুষ মহন্ত। অভিন্ন মদন রূপ মহাগুণবন্ত॥
মহন্তজনের আজ্ঞা লঙ্গিতে না পারি। প্রবেশিনু গ্রন্থকর্ম্মে করতারে স্মরি॥

এবং 'দারা-সেকান্দারনামা'তেও অনুরূপ বিবরণ দিয়ে কবি লিখেছেন,

এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল। পুনরপি ভাগ্যরবি প্রকাশিত ভেল॥

তারপর মজলিস-নবরাজের আদেশে 'দারা-সেকান্দারনামা'র রচনা আরম্ভ হয়।

আচার্য যদুনাথ সরকারের History of Aurangzib (Vol II,1912, p. 288) থেকে জানা যায় যে, ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সুজার সঙ্গে আরাকানরাজের সংঘর্ষ বাধে। সুতরাং ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে আলাওল 'সয়ফুল-মুল্লুকে'র অবশিষ্টাংশ লেখা শুরু করেছিলেন এবং ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে 'দারা-সেকেন্দারনামা'র রচনা শুরু

হয়েছিল সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে পারি, শুজার শেষ পরিণামের বিবরণ দেবার সময় আচার্য যদুনাথ আলাওলের 'সয়ফুলমুলুক' ও 'দারা সেকেন্দারনামা'র সাক্ষ্যকে ব্যবহার করেননি। অথচ আলাওলের বর্ণনাই এসম্বন্ধে একমাত্র-প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। আর একটি কথাও প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে। শুজার সঙ্গে সংঘর্ষের সময় 'শ্রীচন্দ্রসুধর্ম্মা'র বয়স খুবই অল্প ছিল। কারণ আনুমানিক ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে 'পদ্মাবতী' রচনার সময় তাঁর পিতা থদো-মিন্তারেরই "প্রথম যৌবনকাল" ছিল। 'শ্রীচন্দ্রসুধর্ম্মা'র পিতামাতার বিবাহই ১৬৫০ খৃষ্টাব্দর কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল এবং ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর সময় তিনি "শিশু" ছিলেন। সুতরাং সুজার হত্যাকাণ্ডের জন্য 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা' স্বয়ং দায়ী ছিলেন কিনা, তা ভাববার বিষয়।

এই দুই বইতে আলাওল শুজাকে 'নৃপবর' ও 'নৃপকুলেশ্বর' বলেছেন, এ ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

আলাওল তাঁর তোহ্‌ফা গ্রন্থের সমাপ্তির যে তারিখ দিয়েছেন, তার থেকে দেখা যায় তাঁর কারামুক্তির অল্প পরেই এই বই লেখা হয়। এই বইতেও তাঁর নির্যাতনভোগের স্পষ্ট আভাস আছে,

মুঞি আলাওল হীন দৈববশ অনুদিন বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।

আলাওলের আর একটি বই হচ্ছে হপ্ত পয়কর। এই বইটি শুজার আরাকানে আগমনের অর্থাৎ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের পরে কোন এক সময়ে লেখা হয়েছিল, কেননা এই বইএ কবি আরাকানরাজ 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা'র প্রশস্তিপ্রসঙ্গে বলেছেন,

দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার শরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা ॥

'আরাকান রাজসভায়-বাংলা সাহিত্যে'র লেখকেরা এর থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে "কবি যখন 'হপ্ত পয়কর' রচনা করিতেছিলেন, তখন শাহ সুজা রোসাঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছিলেন।......সুতরাং আলাওলের 'হপ্তপয়কর' ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল।" এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে দুটি বাধা আছে। প্রথমতঃ 'হপ্ত পয়করে' কবি নিজের জীর্ণ অবস্থার জন্যে খেদ করেছেন,

তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত। যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুলচিত ॥

কিন্তু ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের পরেও বহু বছর কবি জীবিত ছিলেন। এর বার বছর পরে লেখা 'দারা-সেকেন্দারনামা'তে কবি শুধুমাত্র বলেছেন, "বৃদ্ধকাল হৈল এবে"।

দ্বিতীয়তঃ হপ্তপয়কর রচনার সময় আলাওলের আশ্রয়দাতা ছিলেন 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা'র প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মহাম্মদ। তাঁরই আদেশে এই বই লেখা হয়,

হেন মহা রাজ্যেশ্বর অখণ্ড-সম্পদ। তান মুখ্য সেনাপতি মহম্মদ সৈয়দ॥
আমিহ সভাতে তান থাকি অবিরত। অন্ন বস্ত্র দানে আমা পোষেন্ত সতত॥
আমা প্রতি আজ্ঞা কৈলা হরষিত মনে। উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে॥

অথচ আমরা জানি যে অন্ততঃ ১৬৫৯ থেকে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরাকানরাজের মহাপাত্র সোলেমান। সুতরাং ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের কয়েক বছর পরে এবং 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা'র রাজ্যাবসানের অর্থাৎ ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের আগে 'হপ্ত পয়কর' রচিত হয়েছিল বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সম্ভবতঃ কবি এখানে অতীত ঘটনা হিসেবে আরাকানরাজের কাছে সুজার আশ্রয় গ্রহণের উল্লেখ করেছেন।

এই বইগুলি ছাড়া আলাওল রচিত ইউসুফ-জোলায়খা, শিঁরিঁ-খোস্‌রোনামা, লায়লা-মজনুন ও আজিজকুমার-রসবতী নামে আরও চারখানি কাব্য পাওয়া গিয়েছে। আবদুল গফুর সিদ্দিকী এই কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন (সা.প.প.,১৩৩৩, পৃঃ ৭০-৭২ দ্রঃ)। কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়নি, সুতরাং এদের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা গেল না।

এখন আলাওল কতদিন জীবিত ছিলেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করি।

আলাওলের জন্ম-সাল যে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী নয় তা আগেই আলোচনা করে দেখিয়েছি। আলাওল যখন ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের পরে 'দারা সেকেন্দারনামা' সম্পূর্ণ করেছিলেন, তখন তাঁর জন্মসাল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের বেশী আগেও যাবেনা। 'দারা-সেকেন্দারনামা' রচনার সময় আলাওল নিজেকে বৃদ্ধ বলেছেন। সুতরাং ঐ সময়ে তাঁর বয়স ৭০ থেকে ৭৫ এর মধ্যে ছিল এবং তিনি প্রায় ১৬০০-১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

আলাওলের এই জীবৎকাল নির্ধারণ আর একদিক থেকেও সমর্থিত হয়। আলাওল তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁর পিতা ফতেহাবাদের "রাজ্যেশ্বর" মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত History of Bengal (Vol. II) থেকে জানা যায়, মজলিস কুতুব অন্ততঃ ১৫৭৬ থেকে ১৬১১ খৃঃ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর অমাত্য-পুত্র আলাওলের স্বাভাবিক জীবৎকাল ১৬০০-১৬৮০ খৃঃ।

॥ চৌত্রিশ ॥

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস কেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গলরচয়িতা। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দুজন কবির নাম নয়। 'কেতকা' মনসারই আর এক নাম। ক্ষেমানন্দই লিখেছেন' "কিআ পাতে জন্ম লইল কেতকা সুন্দরী।" তাই ক্ষেমানন্দ নিজেকে কেতকদাস বলেছেন। আর একটা কথা, অনেকের ধারণা, ক্ষেমানন্দ ভিন্ন আর কোন কবি মনসার 'কেতকা' নামের কথা বলেন নি। কিন্তু এ ধারণা ভুল। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের দিগ্‌বন্দনায় আছে,

কিয়াপাতে বন্দি গাইব কেতুকাসুন্দরী।
উন কোটি নাগের মাতা জয় বিষহরি॥

ক্ষেমানন্দের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট সূত্র পাওয়া যায়নি। ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যের মধ্যে রচনাকাল উল্লেখ করেননি। তাঁর আত্ম-কাহিনীর মধ্যে উল্লিখিত কয়েকজন লোকের নাম থেকে তাঁর সময় নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই নামগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে ঐক্য না থাকায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

অধিকাংশ পুঁথিতেই এই ছত্রটি পাওয়া যায়,

রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে পড়িল গাঁ
মনে যুক্তি করেন জনক।

কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে 'বারা খাঁ'র জায়গায় 'রাণা খাঁ' পাঠ আছে। যাহোক্ অধিকাংশ পুঁথির সাক্ষ্য অনুযায়ী 'বারা খাঁ' পাঠই শুদ্ধ ধরা যায়। এই 'বারা খাঁ'র সময় সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "তিনি ১৬৪০ খৃঃ অঃ (১০৪৭ বাং সনে) কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্য্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জমি প্রদান করেন। কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত দান পত্রখানি কতকদিনের জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন। ১৬৪০ খৃঃ অব্দের পরে বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হন এবং তৎপর কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল বিরচিত হয়"। এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "শিবরামের দলিলে যাঁহার স্বাক্ষর আছে তিনি বারা খাঁ নন, কুতব খাঁ।

সুতরাং বারা খাঁর সাহায্যে ক্ষেমানন্দের কাল নির্ণয় করা চলে না।" যে দলিলটিতে কুতুব খাঁর স্বাক্ষর আছে এবং যার কথা সুকুমার বাবু বলেছেন, তার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হচ্ছেন অম্বিকাচরণ গুপ্ত। অম্বিকাচরণের উক্তি অনুযায়ী দলিলটির তারিখ ১০২৫ সনের ফাল্গুন মাস=১৬১৯ খৃঃঅঃ। সুতরাং দীনেশবাবু যে দলিলটি দেখেছিলেন, তা এই দলিল নয়। কুতুব খাঁ ১৬১৯ খৃঃ-তে শিবরামকে "ষোল বিঘা বাস্তু বাগাত ইত্যাদি নিষ্কর করিয়া দেন, এবং কিছু ধানি জমি এবং চতুর্দ্দিকবর্ত্তী বহুগ্রামের সভাপণ্ডিতের অধিকার" দেন, তারপরে বারা খাঁ ১৬৪০ খৃঃ-তে তাঁকে আরও বিশ বিঘা জমি দান করেন। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে বেহুলার যাত্রাপথের বর্ণনায় কেবলমাত্র বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি স্থানের উল্লেখ আছে। এ থেকে মনে হয় তিনি বর্ধমান অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। আর বারা খাঁ ছিলেন বর্ধমান অঞ্চলেরই শাসনকর্তা। সুতরাং ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত বারা খাঁ এবং শিবরামের দলিলে স্বাক্ষরকারী বারা খাঁ অভিন্ন বলে মনে হয়। তাহলে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের কিছু পরেই ক্ষেমানন্দ কাব্য রচনা করেছিলেন বলতে হবে।

এছাড়া অনেকগুলি পুঁথিতে দেখি আত্মকাহিনীতে আছে,

রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভেটিতে যাই
নাম তাঁর ভারামল্ল।

এই ভারামল্ল কবিকে গুয়া পান এবং তিনখানি গ্রাম "লিখাপড়া বসতের স্থল" স্বরূপ দান করেন। তখন বারা খাঁ পরলোকগত। ইতিহাসে এক বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্লের নাম পাওয়া যায়। এঁর পিতার নাম কেশবমল্ল। ইনি টোডরমল্লের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন। টোডরমল্ল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল দুজনেই বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় পিতার সঙ্গে বাংলায় আসেন। সুতরাং ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পরে ভারামল্ল অতিবৃদ্ধ অবস্থায় জীবিত থাকতে পারেন। এইভাবে ক্ষেমানন্দের জীবৎকাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি হদিস্ পাওয়া যেতে পারত, কিন্তু পাঠান্তরই গোলমাল বাধিয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীর যে পাঠ প্রকাশ করেছেন তাতে বিষ্ণুদাসকে রাজা বলা হয়নি এবং ভারামল্লের নাম করা হয়নি। তার বদলে ঐ জায়গায় আছে,

বিষ্ণুদাসের ভাই তাহারে ভেটিতে যাই
নাম তার রামতারণ মণ্ডল।

আমাদের কিন্তু মনে হয় 'রাজা বিষ্ণুদাস' ও 'ভারামল্ল'ই মুল পাঠ। কারণ, ভারামল্ল বাংলার একজন অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী ছিলেন। এক কথায় তিনখানি গ্রাম দেওয়া ভারামল্লের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু যার তার পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষতঃ রামতারণ মণ্ডল সম্বন্ধে যখন আমরা কিছুই জানিনা। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ পুঁথিতেই যখন 'ভারামল্ল' নাম পাওয়া যাচ্ছে এবং সমসাময়িক ইতিহাসেও বিষ্ণুদাস-ভারামল্ল ভ্রাতৃযুগলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তখন 'রামতারণ মণ্ডল' লিপিকর প্রমাদ এবং 'ভারামল্ল'ই প্রকৃত পাঠ বলে বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পর বেশী দিন ভারামল্লের জীবিত থাকা সম্ভব বলে মনে হয় না। এই কারণে ১৬৪০ খৃঃ-র অল্প কিছুদিন পরে বারা খাঁর মৃত্যু ঘটেছিল এবং তার কিছু পরে ক্ষেমানন্দ কাব্যরচনা করেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

সনাতন চক্রবর্তী ও সনাতন ঘোষাল

আগেই বলেছি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ভাগবতপুরাণের অনুবাদ খুব বেশী পরিমাণে মেলে না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রায় একই নামের দুজন কবি ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম সনাতন চক্রবর্তী, অপরজনের নাম সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ।

এঁদের মধ্যে সনাতন চক্রবর্তীর অনুবাদের কথা আমরা কেবলমাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের উল্লেখ থেকে জানতে পারি। লালচাঁদ বিশ্বাস নামে একজন প্রকাশক ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের মূল ও সনাতন চক্রবর্তীর অনুবাদ এক সঙ্গে প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮০ শকাব্দের আষাঢ় মাসের বিবিধার্থসংগ্রহে (পৃঃ ৭২) তার সমালোচনা করে লেখেন, "এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে। যেহেতু সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালী পদ্য ইহাতে অতি সুচারুরূপে রক্ষা পাইয়াছে।" (বা. সা. ই., ১।২, পৃঃ ৯০০ দ্রষ্টব্য)

এর পরে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকেও সনাতন চক্রবর্তীর গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তা দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "১৬৫৮ খৃ. অব্দে সনাতন চক্রবর্তী নামক......একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। লেখক আওরঙ্গজীবের সঙ্গে সুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তকরচনার কাল-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে উহার কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃঃ ৪৭২) বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে রঘুনাথ পণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ লেখেন, "সনাতন চক্রবর্তী সমগ্র ভাগবতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন" (পৃঃ ৩, পাদটীকা)।

অন্ততঃ দুবার মুদ্রিত হলেও, এই গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন খবর আমরা দিতে পারলাম না। দীনেশবাবুর উক্তি

থেকে কেবল এইটুকু মাত্র জানতে পারছি যে, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

এখন সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশের কথা বলি। ইনি 'কলিকাতা'র ঘোষাল বংশের কৃষ্ণানন্দের পৌত্র। কটকে থেকে 'ভাষাভাগবত' নাম দিয়ে তিনি ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক অনুবাদ করেন। এই তথ্যগুলি আমরা বিভিন্ন স্কন্ধের শেষে কবির উক্তি থেকে পাই। যেমন প্রথম স্কন্ধের শেষে,

কৃষ্ণপক্ষ রবি তিথি তৃতীয় প্রহরে। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটক নগরে॥

চতুর্থ স্কন্ধের শেষে,

কৃষ্ণানন্দ তনয় তনয় সনাতন। বিরচিল ভাষাবন্ধ ভক্তের কারণ॥

নবম স্কন্ধের শেষে,

কলিকতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ। তাঁর পুত্র ভুবন বিদিত রামচন্দ্র॥
তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা। ভাষাভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা॥

বইএর 'ভাষাভাগবত' নামটি এর অন্য বহু জায়গাতেও পাওয়া যায়।

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৫১ সালে পুরীতে এই গ্রন্থের পুঁথি পান এবং বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় তা দান করেন। তাঁর অনুরোধে আমি ১৯৫৩ সালে এই গ্রন্থের সম্পাদনা সুরু করি। প্রথম চার স্কন্ধের সম্পাদনা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ১৯৫৪ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের যুগান্তরে আমি 'কলকাতার প্রাচীনতম কবি (?)' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং তাতেই সনাতন ঘোষাল ও তাঁর 'ভাষাভাগবতে'র কথা প্রথম সর্বসাধারণের গোচর করা হয়। সনাতন ঘোষালের উপরে উদ্ধৃত আত্মপরিচয় থেকে কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এসম্বন্ধে 'বিপ্রদাস পিপিলাই' এর প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি।

'ভাষাভাগবত'এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বিভিন্ন স্কন্ধের রচনাকাল কবি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তার মধ্যে দ্বিতীয় স্কন্ধের রচনাকাল সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়,

ষোলশ ষোড়শ শাকে তৈষ শেষ হৈতে।
সোমসুত দিনে নিশি সপ্তমী শেষেতে॥

অর্থাৎ ১৬১৬ শকাব্দের পৌষ মাসের শেষে বা ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় স্কন্ধ সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম স্কন্ধের রচনাকাল,

কালকলানিধিবিষ্ণুপদকালশশী।
শাকে মিত্র তুলা ধরে পদ্মকান্ত বসি ॥
কৃষ্ণপক্ষ রবি তিথি তৃতীয় প্রহরে।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটকনগরে ॥

এখানে 'অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু'র সংজ্ঞা অনুযায়ী কাল=৩ (সা. প. প., ১৩৩৬, পৃঃ ২২৯ দ্রঃ) ধরাই সঙ্গত। কলানিধি=চন্দ্র=১, বিষ্ণুপদকাল=৩+৩=৬, শশী=১। সুতরাং ১৬১৩ শকাব্দের তুলা বা কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অর্থাৎ ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্কন্ধ সম্পূর্ণ হয়েছিল ।

চতুর্থ স্কন্ধের রচনাকাল ১৬১৮ শকাব্দের আষাঢ় মাস অর্থাৎ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ।

বসুচন্দ্র ঋতু শশী শাক পরিমিতে।
নিবসেন পদ্মবন্ধু মিথুন রাশিতে ॥

নবম স্কন্ধের রচনাকাল,

গগন যুগল ঋতু সমুদ্র কুমার।
শাক পরিমিত বীর বিক্রম রাজার ॥

গগন=০, যুগল=২, ঋতু=৬, সমুদ্রকুমার=চন্দ্র=১। সুতরাং ১৬২০ শকাব্দে বা ১৬৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে নবম স্কন্ধ সম্পূর্ণ হয়েছিল। অবশ্য 'যুগল ঋতু' = ৬৬ বলে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তাহলে নবম স্কন্ধের রচনাকাল অন্য স্কন্ধগুলি রচনার পঞ্চাশ বছর পরে হয় এবং কবিকে অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘজীবী ধরতে হয়। সুতরাং এ ব্যাখ্যা টেঁকে না।

নবম স্কন্ধের পরে কবি আর অনুবাদ করেছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ এই স্কন্ধের শেষে তিনি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সম্ভবতঃ রঘুনাথ পণ্ডিতের 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী'তে ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক অনুবাদ নেই বলেই সনাতন ঘোষাল এই অভাব মোচনের চেষ্টা করেছেন।

সনাতন ঘোষালকে কেউ যেন সনাতন চক্রবর্তীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে না করেন। কারণ প্রথমতঃ, দীনেশবাবুর উক্তি অনুযায়ী সনাতন চক্রবর্তীর গ্রন্থরচনাকাল ১৬৫৮ খৃঃ, সনাতন ঘোষালের গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধের রচনাকাল তার ৩৩ বছর পরবর্তী। দ্বিতীয়তঃ, বসন্তরঞ্জন রায় সনাতন চক্রবর্তী কর্তৃক সমগ্র ভাগবতের অনুবাদেরই উল্লেখ করেছেন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর

একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ দেখেছিলেন। কিন্তু সনাতন ঘোষাল নয় স্কন্ধের পরে আর অনুবাদ করেছিলেন বলে মনে হয় না। তৃতীয়তঃ, আমরা সনাতন ঘোষালের গ্রন্থের সমস্ত ভণিতা তন্নতন্ন করে দেখেছি, কোথাও 'সনাতন চক্রবর্তী' নাম পাইনি। সুতরাং একমাত্র জোর করে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দুই কবিকে অভিন্ন বলা যায় না।

॥ ছত্রিশ ॥

রূপরাম চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গলকাব্য বাংলার মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা হলেও এই ধারাটির খুব প্রাচীন কোন রচনা এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ধর্মমঙ্গলকাব্যের আদি লেখক হিসেবে পরবর্তী কবিরা রামাই পণ্ডিত ও ময়ুরভট্টের নাম করেছেন। কিন্তু এঁদের মূল রচনার নিদর্শন, এমনকি এঁদের অস্তিত্বের পর্যন্ত সুনিশ্চিত প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। অনেকে মনে করেন, খেলারাম চক্রবর্তী নামে একজন কবি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু খেলারামের এই প্রাচীনত্ব যে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা আমরা 'উনচল্লিশ' সংখ্যক অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখাব। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলকাব্যে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে, কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায়নি এবং তাঁর আবির্ভাবকালটিও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

এঁদের বাদ দিলে আর যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধর্মমঙ্গলকার, তাঁদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী অন্যতম। এই রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের রচনাকাল জানিয়েছেন একটি দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর মধ্য দিয়ে,

শাকে সিমে জড় হৈলে যত শক হয়।
চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রয় ॥
রসের উপরে রস তায় রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কর্যা লেহ ॥

এই হেঁয়ালী বাংলার বিশিষ্ট গবেষকদের গলদ্ঘর্ম করেছে। বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় প্রথমবার গণনা করে পেয়েছিলেন ১৫২৬ শক (=১৬০৪-৫ খৃঃ), দ্বিতীয়বারে ১৫৮৬ শক (=১৬৬৪-৬৫ খৃঃ), ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী পেয়েছেন ১৫১২ শক (=১৫৯০ খৃঃ), শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন ১৬৪১ শক (=১৭১৯-২০ খৃঃ), ডঃ সুকুমার সেন পেয়েছেন ১৫৭১ বা ১৫৭২ শক (=১৬৪৯-৫০ খৃঃ বা ১৬৫০-৫১ খৃঃ)। কিন্তু যেভাবে এঁরা এই হেঁয়ালীর ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে আমাদের মন সায় দেয় না। আমাদের বিবেচনায় হেঁয়ালীটির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা

এখন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কল্পনার সাহায্যে এর প্রতিটি চরণের অসংখ্য অর্থ করা যেতে পারে এবং তার ফলে হেঁয়ালীর সমাধানও অসংখ্য রকমের হবে। প্রথম চরণের "শাকে সিমে জড় হৈলে'র অর্থ আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় করেছিলেন, যে যে তিথিতে শাক এবং সীম খেতে নেই। এই মতের সমর্থনে তিনি রাধামাধব ঘোষের 'বৃহৎ সারাবলি'র রচনাকাল নজীরস্বরূপ উদ্ধৃত করেছিলেন। তাতে রাধামাধব ইংরেজী সাল ১৮৪৮ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং শকাব্দ দিয়েছেন হেঁয়ালীতে,

শাকে সিমে জড় করি যত শক হয়।
চারি বেদ ব্রহ্ম বস্তু তাহে যুক্ত রয়॥
রসভাসে রসগুণে তায় যোগ দেও।
এই শকে পুঁথী হলো লেখা করি লও॥

১৮৪৮ খৃঃ = ১৭৭০ শক। যোগেশবাবু 'শাক' অর্থে দশমী তিথি = ১০ এবং 'সীম' অর্থে একাদশী তিথি = ১১ ধরে কোনরকমে উপরে উল্লিখিত হেঁয়ালীর থেকে ১৭৭০ শক পেয়েছিলেন (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, পৃঃ ৩৫১-৩৫২ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তিনি 'ভাস' অর্থে ২ ধরেছেন, যা ঠিক্ মানা যায় না। 'রস' অর্থে তিনি ৯ ধরেছেন, কিন্তু সর্বত্র ৬ অর্থেই 'রস' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর দ্বাদশী তিথিতেও যখন কল্‌মী শাক খেতে নেই, তখন শাক অর্থে শুধু ১০ই ধরব কেন? এই কারণে যোগেশচন্দ্রের সমস্ত গণনা, বিশেষ ভাবে 'শাকে সীমে'র ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'শাকে সীমে'র জায়গায় 'শাকে সনে' পাঠ ধরে যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাও কষ্টকল্পনার ফল। নলিনীবাবুও 'রস' অর্থে ৯ ধরে ভুল করেছেন।

সুতরাং এই হেঁয়ালীর যেসমস্ত "সমাধান" এপর্যন্ত করা হয়েছে, তার কোনটিই আমরা স্বীকার করতে পারি না। সুতরাং এটি বাদ দিয়ে অন্যভাবে আমরা রূপরামের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করব। দেখা যাক্, রূপরামের কাব্যে তাঁর সময় নির্ধারণের কোন স্পষ্ট সূত্র পাওয়া যায় কিনা। সৌভাগ্যক্রমে তাও পাওয়া গেছে। ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, একটি পুঁথিতে আছে,

"রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণে যত আছিল প্রজা॥

সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর।
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর ॥"

যে পুঁথিতে এই অংশটি পাওয়া গিয়েছে, তার আলোকচিত্রও ডঃ সুকুমার সেন প্রকাশ করেছেন।

আচার্য যত্নাথ সরকারের History of Aurangzib ও History of Bengal (Vol. II) থেকে জানা যায় যে, শাহজাহানের ছেলে শুজা ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ অবধি রাজমহলে থেকে বাংলা শাসন করেছিলেন। আত্মকাহিনীতে কবি বলেছেন, অল্প বয়সেই তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দেন, যেহেতু ধর্মঠাকুর তাঁর গান গাইতে তাঁকে আদেশ করেছিলেন। শুজা যখন রাজমহলে ছিলেন, সেই সময় থেকে কবি ধর্মের গান গাইতে সুরু করেন, নিজে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন তার অনেক পরে। তাই কাব্যসমাপ্তির সময় তিনি বলেছেন, "রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা···সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর ॥" 'ছিল'—এই অতীতকালের ক্রিয়াপদ থেকে বোঝা যায়, শুজার শাসন তখন স্মৃতিতে পর্যবসিত। সুতরাং ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজমহল থেকে শুজার বিদায় গ্রহণের পরে কোন এক সময় রূপরাম 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেছিলেন।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

রামদাস আদক

রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল আর রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল প্রায় একই সময়ে লেখা হয়। রামদাসের কাব্যের রচনাকাল সব পুঁথিতে নেই, শু' একটি মাত্র পুঁথিতে রয়েছে,

বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আন্ত পক্ষ আট দিবস তাহার ॥

এর থেকে পাওয়া যায় ১৫৮৪ শক বা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ। এইটিই যে কাব্যের প্রকৃত রচনাকাল, তা বোঝা যায় কাব্যে ভূরশিটের রাজা প্রতাপ-নারায়ণের উল্লেখ থেকে,

ভূরশিটে রাজা নাম প্রতাপনারাণ।
দানে দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান ॥

এই প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। 'রসমঞ্জরী'তে ভারতচন্দ্র লিখেছেন,

ভূরিশিটরাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ।

কুলগ্রন্থ থেকে দেখা যায় প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্দ্রের তিন পুরুষ পূর্ববর্তী। ভারতচন্দ্র যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন, তখন ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ প্রতাপনারায়ণের স্বাভাবিক সময় হয়।

তারপর, ভরত মল্লিক তাঁর চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে লিখেছেন যে তিনি প্রতাপনারায়ণের সভাসদ ছিলেন ("ইতিপ্রজাধীশ্বরধীরবীরপ্রতাপনারায়ণ-সৎসদস্যঃ")। চন্দ্রপ্রভা ১৫৯৭ শকে বা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে এর মাত্র ১৩ বছরের তফাৎ। সুতরাং এদিক দিয়েও রামদাসের পুঁথির তারিখ সমর্থিত হচ্ছে।

॥ আটত্রিশ ॥

যাদুনাথ

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আখ্যানকাব্য, আবার কতকগুলি পুরাণ জাতীয়। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনাগুলিকে ধর্মপুরাণ বলা হয়। এর আগে সহদেব ও লক্ষ্মণের লেখা দুখানি ধর্মপুরাণ পাওয়া গিয়েছে। আরও একখানি ধর্মপুরাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ধর্মপুরাণটির তিনখানি পুঁথি বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় আছে। এর লেখক যাদুনাথ, যদুনাথ ও যাদব পণ্ডিত তিন নামেই ভণিতা দিয়েছেন, তবে যাদুনাথ নামেই বেশীবার দিয়েছেন।

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'পুঁথি-পরিচয়' প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ২২০-২২১) এই ধর্মপুরাণটীর অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ বার হয়েছিল। তার থেকে জানা যায় যে, কবির দামোদর এবং বিনোদনাথ নামে দুই পূর্বপুরুষ ছিলেন। এঁদের নিবাস ছিল 'দোম' গ্রামে,

দামোদর পতি পিতা দোমেতে আলয়।
পুণ্যবান বিনোদনাথ তাহার তনয় ॥
হতমূর্খ যদুনাথ তাহার সন্ততি।
সংখেপে রচিলাম প্রভুব মঙ্গল ভারতী ॥

কবির পিতার নাম ধর্মদাস। একথা আমরা জানতে পারি এই দুটি ভণিতা থেকে,

"কহে ধর্ম্মদাসের নন্দন।"
"ধর্ম্মদাসের সুত ধর্ম্মপদে অনুগত
লইতন (নূতন) মঙ্গল সুরচনে ॥"

সম্ভবতঃ কবির পিতামহের নাম বিনোদনাথ এবং প্রপিতামহের নাম দামোদর।

যাদুনাথ তাঁর রচনাকে "ধর্ম্মের মঙ্গল" ও "ধর্ম্মপুরাণ" দুই না অভিহিত করেছেন। কিন্তু কাব্যের মধ্যে সৃষ্টিপত্তনাদি কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে বলে একে 'ধর্ম্মপুরাণ' নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এবারে এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করছি। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত "পুঁথি পরিচয়ের" প্রথম খণ্ডে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকলেও এর রচনাকাল সম্বন্ধে সেখানে কোন কথা বলা হয়নি। অথচ তাতে যে ভণিতাগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, তাদের একটিতে আছে,

"প্রভুর কৃপায় ফলে মদনা ঋতু ক্ষিতি তলে
যাদব পণ্ডিতে ভনে।"

এখানে 'মদনা ঋতু ক্ষিতিতলে' উক্তি দ্ব্যর্থবোধক বলে মনে হয়। উক্তিটির বাহ্য অর্থে রাণী মদনার প্রসঙ্গই ব্যক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু উক্তিটির অন্য অর্থ শকাব্দের এবং গ্রন্থের রচনাকালের সূচক বলে মনে করি। মদন=১৩, ঋতু=৬, ক্ষিতি=১। সুতরাং ১৬১৩ শকাব্দ বা ১৬৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে এই অংশ লেখা হয়েছিল মনে করা যেতে পারে।

আমাদের এই ধারণার সমর্থন গ্রন্থের আর এক জায়গা থেকেও পাচ্ছি। ১৯৫৫ সালে আমি এই গ্রন্থের পুঁথি পরীক্ষা করি। দেখি তার এক জায়গায় লেখা আছে,

সুন এ ভকত ভাই কর অবধান।
জখন সমাপ্ত এই ধর্ম্ম পুরাণ॥
খেত্রি বংসেতে জর্ম্ম নাম কৃষ্ণরাম।
প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে জার নাম॥
কৃষ্ণরামের নামে পাপতাপবিমচনে।
চিরকাল রাজুতি করেন বর্দ্ধমানে॥
মরিল বলরাম রায় য়রাজক পুরি।
সেইকালে কৃষ্ণরাম নিল বসুন্দরি॥
ভার্য্যা বন্দি দাষ হয়ে করোরি তাহার।
সেইকালে গিত সাঙ্গ হইল আমার॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণরাম্ যখন বর্ধমানের রাজা হন, সেই সময়ে যাদুনাথের ধর্মমঙ্গল বা ধর্মপুরাণ সমাপ্ত হয়। কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে আমরা জানি যে তিনি "১৬৯৪ খৃঃ (১১০৭ হিজরি) ২৪ রবিয়ল আয়ল তারিখে দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বের ৩৮ বর্ষে (জুলুস) তাঁহার নিকট হইতে চাকলে বর্দ্ধমানের জমিদার ও চৌধুরিপদের সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।" [বিশ্বকোষ, সপ্তদশ ভাগ, পৃঃ ৬১৯] ভারত সম্রাটের এই সনদ হচ্ছে কৃষ্ণরামের

অধিকার লাভের চূড়ান্ত স্বীকৃতি, এই স্বীকৃতি তিনি ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে লাভ করলেও তাঁর অধিকার লাভ তার আগেই হয়েছিল সন্দেহ নেই। যাদুনাথও পূর্বোদ্ধৃত ভণিতাটি লেখার কিছুদিন বাদে কাব্য সম্পূর্ণ করেন। সুতরাং ১৬৯২ বা ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম বর্ধমানের রাজা হয়েছিলেন এবং যাদুনাথ তাঁর ধর্মপুরাণ সম্পূর্ণ করেছিলেন বলতে পারি। এর সঙ্গে "মদনা ঋতু ক্ষিতিতলে"র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য হচ্ছে।

উপরে উদ্ধৃত অংশটির "ভার্য্যা বন্দি দাষ হয়ে করোরি তাহার" চরণটির অর্থ দুর্বোধ্য। ডঃ সুকুমার সেন মহোদয়কে আমি এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন 'ভার্য্যা বন্দি দাস' এর প্রকৃত পাঠ সম্ভবতঃ 'ভায়্যা বন্দিদাস'। 'করোরি' শব্দের অর্থ খাজাঞ্চি। সুতরাং চরণটির মানে দাঁড়াচ্ছে—যখন কৃষ্ণরামের ভাই বন্দিদাস তাঁর খাজাঞ্চি হয়। কৃষ্ণরাম রাজা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এই "বন্দিদাস"কে তাঁর কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। অবশ্য "বন্দিদাস" শব্দটি লিপিকর প্রমাদ বলে মনে হয়। কারণ এই নামের অন্য কোন নিদর্শন পাইনি।

যাহোক, এখন পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, ১৬৯১-১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যাদুনাথের ধর্মপুরাণ রচিত হয়। এত পুরোণো ধর্মপুরাণ আর একটিও পাওয়া যায়নি। ধর্মমঙ্গলকাব্য হিসেবে বিচার করলেও শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, রূপরাম চক্রবর্তী ও রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল ছাড়া আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত অন্য সব ধর্মমঙ্গল কাব্য এর তুলনায় অর্বাচীন। সুতরাং ধর্মমঙ্গল নিয়ে যাঁরা আলোচনা করতে চান, তাঁদের কাছে এই বইটির গুরুত্ব যথেষ্ট।

॥ উনচল্লিশ ॥

খেলারাম চক্রবর্তী

অনেকের ধারণা, খেলারাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম কবি। এই ধারণার কারণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দের 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বলেছিলেন যে তিনি খেলারামের ধর্মমঙ্গলের একটি প্রাচীন পুঁথি দেখেছেন; এবং তার থেকে তিনি এর রচনাকাল নির্দেশক এই দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছিলেন,

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ॥

ভুবন=১৪, বায়ু=৪৯। সুতরাং ১৪৪৯ শক=১৫২৭-২৮ খৃঃ খেলারামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু 'ভুবন শকে বায়ু' এ কোন্ ধরণের প্রয়োগ ? খেলারামের ধর্মমঙ্গলের আরও কয়েকটি পুঁথি ৺নগেন্দ্রনাথ বসু দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে রচনাকাল জ্ঞাপক এই ছত্রগুলি ছিল না

প্রকৃতপক্ষে খেলারাম নামক ধর্মমঙ্গলরচয়িতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে ৺হারাধন দত্ত ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু—এই দুজন মাত্র লোকের সাক্ষ্যের উপর। ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা'র ৪র্থ সংস্করণ (পৃঃ ৮৫) থেকে জানা যায় যে, আর একজন অনুসন্ধানকারী খেলারামের বাসভূমি বলে পরিচিত পশ্চিমপাড়া গ্রামে গিয়ে এক বৃদ্ধের মুখে এই দুটি ছত্র শুনেছিলেন,

"খেলারাম চক্রবর্তী শন কাটিছেন বসে।
ধর্ম্ম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠরোগীর বেশে ॥"

এই দুই ছত্র কিন্তু রূপান্তরিত আকারে 'প্রচলিত ছড়ার মধ্যেও পাওয়া যায়,

নিধিরাম চক্রবর্তী শন কাটিছেন বসে।
খেলারাম ভট্টাচার্য্য উত্তরিলা এসে ॥

যাহোক্, ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি খেলারামের রচনার নিদর্শনস্বরূপ য ছত্রগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন, তার ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখলে বোঝা

যাবে, খেলারামের ধর্মমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর রচনা হতে পারে না। তার কয়েকটি ছত্র আমরা উদ্ধৃত করছি,

স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে। সুরম্য সরসী এক তার মাঝে জলে ॥
কমল কুমুদ আদি নানা ফুলদল। বিকাশিয়া ভূষে তার নীল উরঃস্থল ॥
শুন বাছা লাউসেন বলিয়ে তোমায়। এওজাত দিও নেড়া দেউল তলায় ॥

এ ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগেকার হতে পারে না। ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে যেমন খেলারামের ধর্মমঙ্গল এই সময়ের আগে রচিত হয়নি বলা যায়, অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে তেমনি খেলারামকে এর বেশী পরবর্তী বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে স্বরিক্ষার পাটের বন্দীদের তালিকায় প্রচ্ছন্নভাবে যে কজন পূর্ববর্তী কবির নাম করেছেন, তার মধ্যে কৃত্তিবাস, নরোত্তম, নিধিরাম, গোবিন্দ, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, চণ্ডীদাস, নরহরি প্রভৃতির সঙ্গে খেলারামেরও নাম পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কারণে শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় "ভুবন শকে বায়ু মাস" শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই সমীচীন বলে মনে হয়। তিনি বলেন, "গ্রন্থকার সম্ভবতঃ শতাব্দীর উল্লেখ করেন নাই, কেবল মাত্র বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন 'বাহাত্তর সালের বন্যা', ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর' ইত্যাদি। বায়ু মাস শব্দে সপ্তম মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস বুঝাইতে পারে। 'শরের বাহন' বোধ হয়…ঐ কার্ত্তিক মাসেরই দ্যোতক। তাহা হইলে শতাব্দীটি ইহাতে আন্দাজে জুড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি ১৬১৪ শক ধরা যায়, তাহা হইলে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।"

আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক্ ঐ সময়েই ধর্মমঙ্গলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক খেলারামের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া, যাচ্ছে। ১৬৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে রচিত যাদুনাথের ধর্মপুরাণের একটি ভণিতায় পাচ্ছি,

বন্দিয়া পণ্ডিত রাম যাদুনাথ ভনে। খেলারামে ধর্ম্মরাজ রাখিবে কল্যাণে ॥

এর কিছু আগে, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের স্বল্পপরবর্তী সময়ে লেখা রূপরামের ধর্মমঙ্গলের একটি পুঁথিতে রূপরামের গায়ন হিসেবে জনৈক খেলারামের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে,

খেলারাম গাএন করিল বহু হিত। হাতে যন্ত্র দিঞা শিখাইল নাটগীত।
ধর্ম্মের চরণে মাগিঞা নিএ বর। খেলারামের কল্যাণ করিহ মায়াধর॥
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়। হরিধ্বনি বল সভে বন্দনা হল্য সায়॥

(বা. সা. ই. ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৫১২)

আমাদের মনে হয়, যে খেলারাম রূপরামের গায়ন ছিলেন, তাঁরই সঙ্গে 'ধর্মপুরাণ' রচয়িতা যাদুনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাই যাদুনাথ ভণিতায় তাঁর কল্যাণকামনা করেছেন; এই খেলারামই ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। সুতরাং বসন্তবাবুর অনুমিত ১৬১৪ শক বা ১৬৯২ খৃষ্টাব্দই খেলা-রামের ধর্মমঙ্গলের প্রকৃত রচনাকাল বলে আমরা মনে করি।

॥ চল্লিশ ॥

ঘনরাম চক্রবর্তী

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলই সমস্ত ধর্মমঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হবার সুযোগলাভ করে। সাহিত্যরসের দিক দিয়ে এইটিই শ্রেষ্ঠ ধর্মমঙ্গলকাব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। আয়তনের দিক দিয়েও বোধহয় এইটি সমস্ত ধর্মমঙ্গল-কাব্যের মধ্যে বৃহত্তম।

মুদ্রিত গ্রন্থের শেষে এই রচনাকালসূচক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর। মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গববাসর ॥

সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি। যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি ॥

এর প্রথম ছত্র থেকে ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১-১২ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই সময়ের সমর্থক অন্য প্রমাণও আছে। কাব্যের মধ্যে তিনি বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের কল্যাণ কামনা করেছেন।

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।

চিন্তি তার রাজ্যোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥

কীর্তিচন্দ্র ১৭০২ থেকে ১৭৪০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন (বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ৬৩১-৬৩২ দ্রঃ)

'শক লিখে রামগুণ' ইত্যাদি শ্লোকটিকে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের আদ্য অংশে হংস—সূর্য্য ছিলেন (১লা কি ২ রা), শুক্রবার, সুলক্ষণ শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি। পাঁজি গণিয়া দেখিতেছি, ১৬৩৩ শকে ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্ল তৃতীয়া। ১লা হওয়াতে 'আদ্য অংশ'ও বটে। 'যাম সংখ্য দিনে'—যাম অর্থে প্রহর। এক প্রহর বেলার সময় সঙ্গীত সাঙ্গ হয়। (প্রবাসী, ১৩৩৬, পৃঃ ৬৪১) দুটি কারণে এই ব্যাখ্যা মানতে অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, 'যাম সংখ্য দিনে'র এই অর্থ কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয়; 'যাম সংখ্য দিনে'র সহজ অর্থ ৮ নং দিনে। দ্বিতীয়তঃ ১৬৩৩ শকের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে শুক্রবার থাকলেও ঐদিন সূর্যোদয়ের প্রায় দেড় ঘন্টা আগে শুক্লা তৃতীয়া তিথি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এর অন্য অর্থ ভাবতে হবে। আমার মনে

হয় ঘনরাম এখানে হেঁয়ালি করে কাব্যসমাপ্তিকাল জানিয়েছেন ; "সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি" বলেই "যাম সংখ্য দিনে" বলার অর্থ শুক্লা তৃতীয়া তিথির আট দিন পরে অর্থাৎ শুক্লা একাদশী তিথিতে গ্রন্থ শেষ হয়। 'যাম সংখ্য দিনে'র মধ্যে আরও একটি অর্থ আছে ; সেটি হচ্ছে মাসের ৮ তারিখ। Indian Ephemeries, Vol. VI থেকে দেখছি ১৬৩৩ শকের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে শুক্লা একাদশী তিথি ছিল এবং শুক্রবারও ছিল। সুতরাং ঐ তারিখে অর্থাৎ ১৭১১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল সমাপ্ত হয়েছিল বলা চলতে পারে।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ১৭১১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হলেও তার বহু আগেই আরম্ভ হয়েছিল। এত আগে যে, কবি বলেছেন, "সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ"। এইরকম বিরাট একটি কাব্য, যাকে দীনেশচন্দ্র সেন "কবির অধ্যবসায়ের এক বিরাট দৃষ্টান্ত" বলেছেন, তা লিখতে এরকম সুদীর্ঘকাল লাগাই স্বাভাবিক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা সুরু করেছিলেন বলে মনে হয়।

ঘনরাম চক্রবর্তীর আর একখানি বই হচ্ছে 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী।' বা 'সত্যনারায়ণরসসিন্ধু। কেউ কেউ এটিকে কবির প্রথম বয়সের রচনা বলে মনে করেন, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়, কারণ এই বই-এ কবির রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ নামে চারজন পুত্রের নাম পাওয়া যায়। 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'তেও রাজা কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ আছে। সুতরা ; এই বইও ১৭০২ থেকে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।" দীনেশবাবু এই তারিখ পেয়েছেন সম্ভবতঃ কবির বংশধরের কাছ থেকে। এরকম ধারণার কারণ, তিনি ঘনরামের একজন জীবিত বংশধরের উল্লেখ করেছেন। এই তারিখ সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়।

॥ একচল্লিশ ॥

মাণিকরাম গাঙ্গুলী

প্রাচীন কাব্যে রচনাকাল জানানোর অনেকরকম পদ্ধতি ছিল। কোন লেখক রচনাকাল জানাতেন সহজ ভাষায়, কেউ জানাতেন সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে, আবার কেউ বা উৎকট হেঁয়ালিতে। কিন্তু মাণিকরাম গাঙ্গুলীর মত হেঁয়ালির এতখানি বাড়াবাড়ি আর কোন প্রাচীন বাঙালী কবি করেছেন কিনা সন্দেহ। মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের পুঁথির (লিপিকাল ১৭৩১ শকাব্দ) শেষে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

"সাকে রীত্ত সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সির্দ্ধসহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বরি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত॥"

নানা পণ্ডিত এর নানা অর্থ করেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এর থেকে পেয়েছেন ১৪৬৯ শক, বিভূতিভূষণ দত্ত পেয়েছেন ১৫২৯ শক, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য পেয়েছেন ১৪৮৯ শক, ডঃ শহীদুল্লাহ্ ১৪৯১ শক।

কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল অত আগে রচিত হতে পারে না।

প্রথমতঃ, মাণিকরামের ভাষা বর্তমান যুগের ভাষার বড় কাছাকাছি। তাঁর বই থেকে যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে তা দেখাচ্ছি।

"বধে নাই বাঘকে বচনে বুঝা গেছে।"
"জনম লভ গে বাছা ভারত ভিতরে।
"ঘরে যেয়ে জল খেতে নাম্বিলাম জলে॥"
"রাণীদিগে খাব আর অন্য পরে কি।
অবশেষে রাজার মাথার খাব ঘি॥"
"জেতের স্বভাব ধর্ম সঙ্কুচিত গা"।
"দগ্ধ করে তুসের চেলের খাব ভাত।"
"ঐরঙ্গে এলেন গরুড় মহাবল।"

"রাজা কহে বাপুহে এমন বুদ্ধি কেন।"
"বৌ তার বারি হয়ে বাঘটাকে দেখে।"

ঘনরাম চক্রবর্তী, এমনকি ভারতচন্দ্র থেকেও এ ভাষা আধুনিক। সুতরাং ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের আগেকার বলে মনে হয় না। এ ছাড়া এর মধ্যে অজস্র আরবী ফারসী শব্দ পাওয়া যায়।

মোটের উপর, ভাষাতত্ত্বের যদি কণামাত্রও মর্যাদা দেওয়া যায়, তাহলেও মাণিকরামকে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার কবি বলা যায় না।

মাণিকরাম রূপরামকে "আদি রূপরাম" বলে বন্দনা করেছেন। এবং অনেক জায়গায় রূপরামের কাব্যের সঙ্গে আক্ষরিক মিল থেকে বোঝা যায় মাণিকরাম রূপরামকে অনুসরণ করেছেন। ইছাই বধ পালাটি তো তিনি রূপরামের কাব্য থেকে হুবহু নিয়েছেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১৬৬০ থেকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যদি রচিত হয়, মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল তার অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পরে লেখা বলে মনে হয়।

মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলে কর্পূর যেখানে লাউসেনের কাছে সুরিক্ষার পাটে বন্দী নাগরদের তালিকা দিচ্ছে, তার মধ্যে কৃত্তিবাস, নরোত্তম, নিধিরাম, খেলারাম, গোবিন্দ, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, চণ্ডীদাস, নরহরি প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই দিকে সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এতগুলি প্রাচীন বাঙালী কবির নামের একত্র সমাবেশ আকস্মিক ব্যাপার নয়। মাণিকরাম রসিক কবি, তিনি পরিহাসচ্ছলে এই তালিকায় তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ঘনরামই সবচেয়ে অর্বাচীন। "রামগুণ রস সুধাকর" বা ১৬৩৩ শক বা ১৭১১-১২ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। সুতরাং মাণিক-রামের কাব্য তার পর রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "আভ্যন্তরীণ প্রমাণেও (মাণিকরামের) রচনার উর্ধ্বতম সীমা অষ্টাদশ শতাব্দীর ওদিকে যাইতে পারে না। মাণিকরাম বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন; মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ১৬৯৪খ্রীষ্টাব্দে। রাধার কলঙ্কভঞ্জন-কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। রূপরামের উল্লেখ আছে। ঘনরামের কাব্যও যে মাণিক-রামের অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ পাই অনুপ্রাসের ঘটায়। ভাষাতে

অষ্টাদশ শতাব্দীর ছাপ পূর্ণমাত্রায়। 'যেতে'র সঙ্গে 'হতে'র মিল সপ্তদশ শতাব্দীতে অভাবনীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সাহিত্যে যে ধরণের গ্রাম্যতা চলিয়া গিয়াছিল মাণিকরামের কাব্যে তাহার পরিচয় আছে। মাণিকরামের কাব্যের দ্বিতীয় পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ইহাও তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের অর্ব্বাচীনতার একটি প্রমাণ।"

মাণিকরাম তাঁর ধর্মমঙ্গলের দিগ্-বন্দনা পালায় সত্যপীরের বন্দনা করেছেন। সত্যপীরের উল্লেখ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগেকার কোন রচনায় পাওয়া যায় না। সুতরাং এ থেকেও মাণিকরামের কাব্যের অর্বাচীনতা প্রতিপন্ন হয়।

দেখা গেল, মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রচিত নয়। এখন, ঠিক কোন সময় এই কাব্য রচিত হয়েছিল তা স্থির করার প্রয়াস পেতে হবে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মাণিকরামের কাব্যের রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকটির এই পরিবর্তিত পাঠ কল্পনা করেছেন,

> শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
> সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥
> বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃত।
> শর্ব্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত।

আচার্য রায় 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ করেছেন ২৪। উল্লিখিত শ্লোকটির প্রথম ছত্রে অঙ্কের দক্ষিণাগতি ধরে তিনি পেয়েছেন ৬৪৭, দ্বিতীয় ছত্রে বামাগতি ধরে পেয়েছেন ২৪২৪। যোগ করে হল ৩০৭১। একে বামাবর্তন করে পাওয়া গেল ১৭০৩। সুতরাং ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দই মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল বলে আচার্য রায় মনে করেন। এই ব্যাখ্যা অনেকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এতে অনেক অসঙ্গতি আছে। সমস্ত গণনাটাই কষ্টকল্পনা-প্রসূত বলে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, মূল শ্লোকের কয়েক জায়গায় পরিবর্তন করে এই ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে। তৃতীয়তঃ, ২৪ অর্থে 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ বেশী পাওয়া যায় না। চতুর্থতঃ, ১৭০৩ শক যদি কাব্যের রচনাকাল হয়, তাহলে ১৭৩১ শকের পুঁথিতে রচনাকালসূচক শ্লোকটির এত আকাশ-পাতাল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়না; বিশেষতঃ 'যুগ' কি করে 'জোগ' হয়, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য।

আচার্য রায় মনে করেছিলেন, উল্লিখিত শ্লোকটির দ্বিতীয় ছত্রের 'পক্ষ' শব্দে মাস, 'যুগ' শব্দে তারিখ এবং 'সিদ্ধ' শব্দে নক্ষত্র বোঝানো হয়েছে। যোগেশচন্দ্র জ্যোতিষগণনা করে দেখিয়েছেন যে ১৭০৩ শকের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ২৪ নক্ষত্র ছিল। কিন্তু এইভাবে যে কবি মাস-তারিখ-নক্ষত্রের ইঙ্গিত করেছেন, তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। অতএব যোগেশচন্দ্রের জ্যোতিষ-গণনা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। 'অব্যাহৃত তিথি' শব্দের যে অর্থ তিনি করেছেন, তারও মধ্যে কষ্টকল্পনা রয়েছে।

মূল রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি বিচার করে দেখে আমাদের মনে হয়, লিপিকরপ্রমাদের ফলেই শ্লোকটি এত জটিল হয়ে উঠেছে। এর প্রথম ছত্র 'শাকে রীত্ত সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে'র 'রীত্ত' শব্দটিকে সকলেই 'ঋতু' ধরেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এটি মূলে 'কলা' বা ঐ জাতীয় কোন শব্দ ছিল যার মানে হয় ১৬। তাহলে প্রথম ছত্র থেকে ১৬৪৭ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ছত্রের 'সিদ্ধ সহ জোগ দক্ষে যোগ তার সনে'—এখানে 'দক্ষ' মানে দক্ষতার সঙ্গে; জোগ = যোগ; এখানে জ্যোতিষোক্ত যোগের কথা বলা হয়েছে বলে মনে হয়। জ্যোতিষোক্ত যোগের সংখ্যা ২৭—বিষ্কম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য প্রভৃতি (বিশ্বকোষ, ১৬শ ভাগ, পৃঃ ৪০)। কবি যে জ্যোতিষোক্ত যোগের কথা বলেছেন, তার প্রমাণ 'সিদ্ধ সহ যোগ' উক্তি। জ্যোতিষোক্ত যোগগুলির মধ্যে ২১ সংখ্যক যোগের নাম 'সিদ্ধযোগ'। কবি বলছেন, সিদ্ধ সমেত সমস্ত যোগ অর্থাৎ ২৭ দক্ষতার সঙ্গে যোগ কর। তাহলে ১৬৭৪ + ২৭ = ১৬৭৪ শক বা ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দ মাণিকরামের কাব্যের রচনাকাল হয়। কিন্তু এইভাবে অনুমানের সাহায্যে এর সমাধান করা যায় না। অতএব মাণিক-রামের কাব্যে তাঁর সময়নিদেশের অন্য কি সূত্র পাওয়া যায়, তাই দেখতে হবে।

এক্ষেত্রে অগতির গতি মদনমোহনই আমাদের একমাত্র ভরসা। কাব্যের বন্দনা পালায় দেখি মাণিকরাম লিখেছেন,

> বিষ্ণুপুরে বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
> পূর্ব্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে ॥

নিজেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই উল্লেখের বিরোধ দেখে কেউ কেউ এই উল্লেখকে গায়নের প্রক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু নিজের মতের বিরোধী হলেই কোন কিছুকে প্রক্ষিপ্ত মনে করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়, মাণিক-রামের ধর্মমঙ্গলের বিশেষ কোন প্রচার হয়নি। এর একটিমাত্র পুঁথি এপর্যন্ত

পাওয়া গেছে। এইটি অবলম্বনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই কাব্য ছাপিয়েছিলেন এবং এই পুঁথিটিই এখন বর্ধমান সাহিত্যসভার সংগ্রহে আছে। কোন কাব্যের খুব বেশী প্রচার না হলে তাতে প্রক্ষেপের কথা ওঠে না। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত পয়ারটি যে মাণিকরামের স্বরচিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন দুর্জ্জন সিংহদেব। 'মল্লাব্দে ফণিরাজশীর্ষগণিতে' (১০০০) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।" অল্পদিনের মধ্যেই বিষ্ণুপুরের মদনমোহন সারা বাংলায় খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরের দুর্ভাগ্যক্রমে মদনমোহন এখানে চিরদিন থাকেননি। মীরকাশিম যখন বাংলার নবাব, সেই সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্যসিংহ মদনমোহনকে বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে বাঁধা রেখে অর্থসংগ্রহ করেন। ঘটনাচক্রে বিষ্ণুপুররাজ সে টাকা শোধ দিয়ে মদনমোহনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। এখনও পর্যন্ত মদনমোহন বাগবাজারেই আছেন। মীরকাশিম ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪ খৃঃ পর্যন্ত বাংলার নবাব ছিলেন। সুতরাং মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের আগে লেখা বলতে হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বলেছিলেন, মাণিকরাম বোধহয় মদনমোহনের বিষ্ণুপুর ত্যাগের বৃত্তান্ত জানতেন না, অতএব তিনি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের পরেও কাব্য লিখতে পারেন। কিন্তু মাণিকরামের নিবাস ছিল বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বেলডিহা গ্রামে। এখান থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব খুব বেশী নয়। এখানে থেকে মাণিকরাম মদনমোহনের বিষ্ণুপুর ত্যাগের খবর জানতেন না বলে ভাবা যায় না। মদনমোহনের বিষ্ণুপুর থেকে বাগবাজারে আসার কাহিনী যে বাংলা দেশে অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত বিশ্বম্ভরদাসের 'জগন্নাথমঙ্গলে' (প্রথম মুদ্রণ ১২৩৮ বঙ্গাব্দ) মদনমোহনের বন্দনাপ্রসঙ্গে তাঁর কলকাতায় আগমন উল্লিখিত হয়েছে,

বিষ্ণুপুরে বন্দিলাম মদনমোহন।
এবে গঙ্গাতীরে যার করহ দর্শন॥

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৬৩০)

এই সময়েই লেখা আর একটি বই জগন্নাথদাসের ভক্তচরিতামৃতে (পুঁথির লিপিকাল ১২৩১ বঙ্গাব্দ) গোকুল মিত্রের কাছে বিষ্ণুপুররাজের মদনমোহনকে বাঁধা রাখার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে (ঐ, পৃঃ ৯১২)। অতএব মাণিকরাম

যদি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল লিখতেন, তাহলে মদনমোহনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁর স্থানান্তর গমনেরও উল্লেখ করতেন বলে মনে হয়। তা যখন করেননি, তখন মদনমোহন বিষ্ণুপুরে থাকতে থাকতেই তাঁর ধর্মমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়। "পূর্ব্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে"—মদন-মোহনের এই পূর্ব ইতিহাসের উল্লেখ থেকে মনে হয় বিষ্ণুপুরের রাজমন্দিরে মদনমোহনের প্রতিষ্ঠার পরে তখনও বেশীদিন অতিবাহিত হয়নি। যাহোক্ ১৭১১ (ঘনরামের কাব্যরচনার কাল) এবং ১৭৬৪ (মীরকাশিমের শাসনের শেষ বছর) খৃষ্টাব্দের মধ্যেই মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল রচিত হয়েছিল বলে আমরা স্থির করলাম।

মাণিকরাম একটি শীতলামঙ্গল কাব্যও লিখেছিলেন। তার একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়েছে।

॥ বেয়াল্লিশ ॥

রামেশ্বর

রামেশ্বর ভট্টাচার্য বাংলার শ্রেষ্ঠ শিবায়ন কাব্যের রচয়িতা। অবশ্য তিনিই আদি শিবায়ন রচয়িতা নন। তাঁর আগে 'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী রামকৃষ্ণ নামে একজন কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একখানি শিবায়ন রচনা করেছিলেন। এছাড়া 'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী আরও একজন কবি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীরসিংহের রাজত্বকালে (১৬৫২-৮২ খৃঃ) একখানি শিবায়ন কাব্য· রচনা করেছিলেন। রামেশ্বর যে এঁদের পরবর্তী কবি, তা পরবর্তী আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে।

রামেশ্বরের শিবায়নের ১৬৭১ শকাব্দের ৫ই মাঘ বা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থের রচনাকালের এইটিই নিম্নতম সীমা। বহু পুঁথিতে ও ছাপা সংস্করণে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে। বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥

রামেশ্বরের শিবায়নের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে (১৮৭৪) "ঐ শকের স্থলে অঙ্কদ্বারা ১৬৩৪ শক নিবেশিত" ছিল। শ্লোকটি থেকে এই শকাঙ্ক নির্ণয় করা শক্ত। রামগতি ন্যায়রত্ন "অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও" শ্লোকটির অর্থ করতে পারেননি। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় চন্দ্রকলা=১৬, রাম=৩, কর=২ ধরে ১৬৩২ শকাব্দ এই গ্রন্থের রচনাকাল ধরেছিলেন (প্রবাসী; ১৩৩৬, পৃঃ ৩৪৮)।

রামেশ্বর লিখেছেন যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ। পিতা রামসিংহের মৃত্যুর পরে রাজা হয়ে যশোবন্ত সিংহ রামেশ্বরকে শিবায়ন রচনার আদেশ দেন। অম্বিকাচরণ গুপ্ত তাঁর 'হুগলী' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৬-৮৭) কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন এবং ১৭১১ থেকে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন বলে জানিয়েছেন। এই তারিখ ঠিক হলে ১৬৩২ শকাব্দ বা ১৭১০-১১ খৃষ্টাব্দ রামেশ্বরের গ্রন্থের রচনাসমাপ্তিকাল হতে পারে না, কারণ এই কাব্যের রচনা যশোবন্ত সিংহের সিংহাসনে আরোহণের পরে সুরু হয়।

ঠিক্ এই সময়ে ইতিহাসে যশোবন্ত রায় নামে একজন বিখ্যাত লোকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সরকারে মুন্‌শী এবং মুর্শিদকুলির দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর অভিভাবক শিক্ষক ছিলেন। পরে শুজাউদ্দীনের আমলে যখন সরফরাজ খাঁ নায়েব নাজিমের পদ লাভ করেন, তখন যশোবন্ত রায় ঢাকায় দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং চালের দর টাকায় আট মণে নামিয়ে দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন (History of Bengal, D. U., Vol. II, p. 427)। কেউ কেউ মনে করেন, এই যশোবন্ত রায়ই রামেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক যশোবন্ত সিংহ।

এই সব বিষয়গুলি মিলিয়ে দেখলে রামেশ্বর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন বলে মনে হয়। প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে প্রদত্ত ১৬৩৪ শক (১৭১২-১৩ খৃঃ) তাঁর শিবায়নের রচনাকাল হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের বিবেচনায় তাঁর শিবায়নের রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি রূপরাম ও মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকগুলির মত উৎকট দুর্বোধ্য হেঁয়ালী। কোন কোন পুঁথিতে 'রাম করতলে'র জায়গায় 'রাম কল্য কোলে' পাঠ থাকায় হেঁয়ালী জটিলতর হয়েছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় এই হেঁয়ালীর যে সমাধান করেছিলেন, তা নিতান্তই আনুমানিক, উপরন্তু অম্বিকাচরণ গুপ্তের উক্তির সঙ্গে তার বিরোধ হচ্ছে। এইজন্যে তাকে গ্রহণ করা যায় না।

রামেশ্বরের লেখা একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও পাওয়া গিয়েছে।

॥ তেতাল্লিশ ॥

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের লেখা দুখানি বই এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে রামলীলা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৩১ নং পুঁথি)। এতে কবি লিখেছেন,

ফুলিয়া বংশের মণি সুষেণ পণ্ডিত। তাঁহার সন্তান দ্বিজ রচিল সঙ্গীত॥

এর থেকে কেউ কেউ কবিকে সুষেণ পণ্ডিতের পুত্র মনে করেছিলেন। কিন্তু 'সন্তান' শব্দে বংশধরও বোঝায়। কবি যে সুষেণ পণ্ডিতের পুত্র নন, কয়েক পুরুষ পরবর্তী বংশধর, তা জানা যায় তাঁর অপর গ্রন্থ 'ভবানীমঙ্গল' থেকে। এতে কবি নিজের বংশপরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন,

ফুলিয়া কুলের মণি সুষেণ পণ্ডিত গণি ক্রমে কহি সন্ততির নাম।
শিবাচার্য্য গোপেশ্বর বিশ্বেশ্বর তার পর জনার্দ্দন-সুত রামরাম॥
নিবাস ম্যাট্যারী গ্রাম পিতামহ রামরাম তিতুরাম তাহার নন্দন।
তার সুত নাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ উমা-গীত করিল রচন॥

উপরের বিবরণ থেকে এই বংশলতা পাওয়া যাচ্ছে,

সুষেণ পণ্ডিত—শিবাচার্য—গোপেশ্বর—বিশ্বেশ্বর—জনার্দন—রামরাম—তিতুরাম—গঙ্গানারায়ণ।

সুষেণ পণ্ডিত থেকে গঙ্গানারায়ণ অধস্তন অষ্টম পুরুষ। হরিদাস যখন চৈতন্যদেবের আহ্বানে নীলাচলে যান (আঃ ১৫১৬ খৃঃ), তখন সুষেণ পণ্ডিত জীবিত ছিলেন বলে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে জানা যায়। সুতরাং গঙ্গানারায়ণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

শেখ ফয়জুল্লা

শেখ ফয়জুল্লা গোরক্ষবিজয়, গাজীবিজয় ও সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছিলেন। এছাড়া 'মীর ফয়জুল্লা' ভণিতায় কতকগুলি বৈষ্ণবপদ পাওয়া যায়। সেগুলিও এঁর রচনা বলেই মনে হয়। গোরক্ষবিজয় কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট রচনা। কিন্তু এর রচয়িতা কে এবং রচনাকাল কি, সেসম্বন্ধে এক বিরাট সমস্যা ছিল। এর বিভিন্ন পুঁথির ভণিতা একরকম নয়। তাদের মধ্যে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন এবং ভীমসেন রায় নানা লোকের ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু শতকরা ৮০ ভাগ ভণিতা ফয়জুল্লার। তাছাড়া এনামুল হক সাহেব ২৪ পরগণা অঞ্চলে কতকগুলি পুঁথির পাতার মধ্যে এই অংশটুকু পেয়েছিলেন,

"গোর্খবিজএ আছে মুনি সিদ্ধা কত।
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত ॥
খোঁটাদুরের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজি ॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন ॥
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন ॥"

এই সমস্ত কারণে ফয়জুল্লাকেই গোরক্ষবিজয় কাব্যের রচয়িতা বলে আমি স্বীকার করেছিলাম। উদ্ধৃত অংশে ফয়জুল্লার 'সত্যপীর' কথার রচনাকাল পাওয়া যায় ১৪৬৭ শক=১৫৪৫-৪৬ খৃঃ। এই তারিখে কিন্তু এখন আর বিশ্বাস করতে পারছিনা। কারণ ষোড়শ শতাব্দী, এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও কোন সত্যপীরের পাঁচালী তো দূরে থাক্, বাংলা সাহিত্যে সত্যপীরের কোন উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফয়জুল্লা সত্যপীরের পাঁচালী লিখতে পারেন বলে ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, গোরক্ষবিজয়ের ভাষাকে আমি একসময় প্রাচীন ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন বিশদ বিচার করে বুঝতে পারছি, এই ভাষা কিছুতেই ষোড়শ

শতাব্দীর হতে পারেনা। এর কতকগুলি জায়গা উদ্ধার করে দেখাচ্ছি, তাদের নিম্নরেখ অংশগুলিতে আধুনিকতার ছাপ কত স্পষ্ট,

(১) তবে যদি পৃথিবীতে আইল হরগৌরী।
মীননাথ হাড়িফাএ করএ চাকরী॥

(২) নারী লইয়া যত সবে গৃহবাস করে।
রাধাকান্থ বঞ্চিলেক পৃথিবী ভিতরে॥

(৩) দিনে দিনে বেশ হইব সমপতি বাড়িয়া যাইব
তবে যাইব কাথা আর ঝুলি।

এই অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত নয়, কারণ সমস্ত পুঁথিতেই এগুলি পাওয়া যায়।

অতএব ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় বা সত্যপীরের পাঁচালী কোনটিই ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হতে পারে না। সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল "মুনি রস বেদ শশী" পাঠকে ডঃ সুকুমার সেন ভ্রান্ত মনে করেন, তাঁর মতে শুদ্ধ পাঠ ছিল "মুনি বেদ রস শশী" শক (=১৬৪৭ শক=১৭২৫-২৬ খৃঃ)। এই মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সত্যপীরের পাঁচালীর আগে গাজী-বিজয়, এবং তারও আগে গোরক্ষবিজয় রচিত হয়েছিল। অতএব ১৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গোরক্ষবিজয় কাব্য রচিত হয়েছিল বলে আপাততঃ সিদ্ধান্ত করা যায়।

গোরক্ষবিজয় কাব্যের যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তাদের কোনটিই উনবিংশ শতাব্দীর আগেকার নয়। আবদুল করিম সাহেব সংগৃহীত একটি পুঁথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল। করিম সাহেব 'সাল' অর্থে বঙ্গাব্দ ধরেছিলেন, যা ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের সমান। কিন্তু পুঁথিটি চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। সুতরাং এই ১১৮৪ 'সাল' মঘী সন হবারই বেশী সম্ভাবনা। তাহলে পুঁথিটিকে ১৮২২-২৩ খৃষ্টাব্দে লেখা বলতে হয়। পুঁথিগুলি উনবিংশ শতাব্দীর হলেও এদের ভণিতায় যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়, তা ১০০ বছরের আগে হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। এদিক দিয়েও ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে গোরক্ষবিজয়ের রচনাকাল নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত হয়।

'গোরক্ষবিজয়' সংক্রান্ত আর দুই একটি বিষয়ের এই উপলক্ষে আলোচনা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'গোরক্ষবিজয়'কে কেউ কেউ 'গোর্খবিজয়'

লিখে একটা 'নতুন কিছু কর' জাতীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, এই কাব্যের কোনও পুঁথিতে 'গোরক্ষ' নাম পাওয়া যায় না, সর্বত্র 'গোর্খ' নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শব্দটি যদি মুলে 'গোরক্ষ' হয় তাহলে পুঁথিতে কি পাওয়া গেল না গেল সে প্রশ্ন অবান্তর। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের আগে লেখা বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটকেও যখন 'গোরক্ষ' পাই তখন বুঝতে হবে এইটিই মূল শব্দ। বাংলা সাহিত্যেও অন্যত্র 'গোরক্ষ' শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, যেমন গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে,

গোরক্ষনাথ মহাযোগী মীননাথের শিষ্য।
নানা যত্ন করিলেক গুরুর উদ্দেশ্য॥

যিনি 'গোর্খ' নাম প্রচার করেছেন, তিনিই গোরক্ষবিজয়ের কাহিনীকে "খাস বাঙ্গালার গল্পকাহিনী" এবং "বাহিরে আবিষ্কৃত হয় নাই" বলে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেছেন। বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয় নাটকের সংবাদ তার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি সে খবর রাখেননি। গোরক্ষবিজয়ে যাঁদের ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরা কেউ এর লেখক নন, এই জাতীয় চমকপ্রদ মতবাদও ইনি প্রচার করেছেন। এই সব অভিনব মতের খণ্ডন এবং বাংলার নাথসাহিত্য সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় 'সাহিত্য প্রকাশিকা' প্রথম খণ্ডে আমার লেখা 'বাংলার নাথ সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনায় পাওয়া যাবে।

আগেই বলেছি, গোরক্ষবিজয় কাব্যে ফয়জুল্লা ছাড়া কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন এবং ভীমসেন রায়েরও নাম পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ভীমসেন রায় ও ভীমদাস একই ব্যক্তি মনে করা যাইতে পারে। 'কবীন্দ্রদাস' ভীমসেনের অথবা শ্যামদাসের নামান্তর হওয়া বিচিত্র নয়।" আমি এই মত সমর্থন করি। অধিকন্তু আমি মনে করি যে, ভীমদাস বা ভীমসেন রায় এবং শ্যামদাস সেন একই লোক। আবদুল করিম সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়ে'র ভূমিকায় যে সমস্ত ভণিতা উদ্ধৃত হয়েছে, তার থেকে দেখা যায়, কোন কোন পুঁথিতে 'কহে হীন ভীমদাসে' ভণিতা আছে এবং অন্য কোন কোন পুঁথিতে 'কহে সেন শ্যামদাসে' ভণিতা আছে। লিপিকর-প্রমাদে 'হীন ভীমদাস', 'সেন শ্যামদাস'-এ পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। আমার মনে হয়, 'হীন ভীমদাস' থেকে প্রথমে হয়েছিল 'সেন ভীমদাস' এবং

তার থেকে হয়েছিল 'সেন শ্যামদাস' এবং 'ভীমসেন রায়'। সুতরাং কবীন্দ্র-দাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন ও ভীমসেন রায় মূলে একই লোক ছিলেন বলে মনে করা যায়। ইনি সম্ভবতঃ 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের গায়ন ছিলেন। এঁর বিভিন্ন নামের ভণিতাযুক্ত পুঁথি উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় ইনি ফয়জুল্লার সমসাময়িক গায়ন এবং গ্রন্থরচনায় সহযোগী ছিলেন, পরে তাঁর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের নামে এই গীতিকা প্রচার করেন।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

ভারতচন্দ্র

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি নন, তিনি নিজেই যেন একটা সমগ্র যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার নব-জাগ্রত বিদগ্ধ নাগরিক সমাজের তিনি প্রতিনিধি। সেই সমাজে যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আভিজাত্যের অপরূপ সমন্বয় হয়েছিল, তেম্‌নি তাতে সরলতা, অকপটতা ও আদর্শনিষ্ঠার যথেষ্ট অভাব ছিল সন্দেহ নেই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই সমাজের ছাপটি পুরোপুরিভাবে পড়েছে। তাই ভাষার লাবণ্যে, ছন্দের নৈপুণ্যে, শ্লোকের চাতুর্য্যে এই কাব্য তুলনারহিত, কিন্তু তাতে অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতাটুকু প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" এই উক্তির মধ্যে যেমন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের চরম প্রশংসা রয়েছে, তেম্‌নি তার অপূর্ণতাটুকুও এর মধ্য দিয়েই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মণিমালার সৌন্দর্য ও গঠনচাতুর্য যতই অপূর্ব হোক্‌, যতই তা বহুমূল্য হোক্‌ ফুলের মালার অপার্থিব সৌরভ থেকে সে বঞ্চিত। অনুভূতির গভীরতা ও অকপটতাই কাব্যের সৌরভ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তা নেই।

তবুও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তার অপরূপ লাবণ্যে আজ দুশো বছর ধরে বাঙালীকে মুগ্ধ করে রেখেছে। এই কাব্য রচনার পরে শতাধিক বর্ষ পর্যন্ত গুণ বা জনপ্রিয়তা কোন দিকেই এর প্রতিদ্বন্দ্বী কোন কাব্য সৃষ্টি হতে পারেনি। এখন অবশ্য এই কাব্যের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্ব আর অক্ষুন্ন নেই, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে তার জনপ্রিয়তাও সাময়িকভাবে খর্ব হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে সমালোচকদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে ভারতচন্দ্র আবার পূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দ—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তারপর থেকে সকলেই এই জীবনকাহিনীর সব কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে আসছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাহিনীটি শুনেছিলেন ভারতচন্দ্রের পৌত্রের কাছ থেকে। সুতরাং এতে বর্ণিত ঘটনাগুলি মোটামুটিভাবে সত্য হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্য নিখুঁত নয়। তার মধ্যে যথেষ্ট কালবৈষম্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এর একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত জীবনকাহিনীতে পাওয়া যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসার পরে তাঁরই অনুরোধে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তারপরে একদিন মহারাজ কবির প্রার্থনা অনুসারে তাঁকে গঙ্গাতীরের মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন। তারপর যখন বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের মা বর্ধমান ছেড়ে মূলাজোড়ের পাশের গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর বর্ধমানরাজের জননী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে মূলাজোড় গ্রামের ইজারা নেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে অন্যত্র বসবাসের জন্যে জমি দেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র মূলাজোড়বাসীদের অনুরোধে সেখানেই থেকে যান।

তাহলে এই বিবরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হবার পরে দেশে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজে অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে বলেছেন যে, ১৬৬৪ শক বা ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে দেশে বর্গীর হাঙ্গামা হয়, এবং সেই সময় আলীবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে ধরে নিয়ে যান। বন্দীদশায় কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নে দেবী অন্নদার আদেশ পান, যার ফলে তাঁর অনুরোধে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। তারপর, অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৪ শক বা ১৭৫২ খৃঃ। কিন্তু ১৭৫০ খৃষ্টাব্দেই বর্গীর হাঙ্গামা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ঘটনাবলীর পারম্পর্য উল্লেখে এখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভুল করেছেন দেখা যাচ্ছে। অবশ্য তিনি ভুল খবরও পেতে পারেন।

ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, "এই বিশ্ববিখ্যাত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।" কিন্তু তিনি অন্য এক জায়গায় যা লিখেছেন, তাতে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতচন্দ্রের লেখা দুটি সত্যপীরের পাঁচালীর একটিতে তারিখ দেওয়া আছে 'সনে রুদ্র চৌগুণা'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এর অর্থ করেছিলেন ১১৩৪ সন বা ১৭২৭ খৃঃ। তিনি "কতিপয় প্রামাণ্য ব্যক্তির"

কাছে শুনেছিলেন যে, ভারতচন্দ্র মাত্র ১৫ বছর বয়সে ঐ পাঁচালীটি লিখেছিলেন। গুপ্তকবি লিখেছিলেন, "তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।" কিন্তু 'সনে রুদ্র চৌগুণা' = ১১৩৪ সন হতে পারে না। কারণ 'চৌ' শব্দ স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে বাংলায় ব্যবহৃত হয় না এবং কোন কবি একই অঙ্কের অর্ধেক বামা গতিতে এবং অর্ধেক দক্ষিণা গতিতে লেখেন না। 'সনে রুদ্র চৌগুণা'র একমাত্র সঙ্গত অর্থ ১১৪৪ সন বা ১৭৩৭ খৃঃ। তাহলে ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ হয় ১৭২২ খৃঃ এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয় ৩৮ বছর। কিন্তু ভারতচন্দ্র যে অন্ততঃ ৪০ বছর বেঁচেছিলেন, তার প্রমাণ 'নাগাষ্টক' থেকে পাওয়া যায়। ঐ কাব্য রচনার সময় তাঁর বয়স যে ৪০ বছর ছিল, একথা ভারতচন্দ্র নিজেই বলেছেন। সুতরাং ১৫ বছর বয়সে 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচিত হওয়ার কথা সত্য নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যদি সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁর ধারণার উপর নির্ভর করে ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল ঠিক করে থাকেন, তবে তা গ্রহণ করা চলে না। তবে তিনি স্বতন্ত্র কোন সূত্র থেকেও এই সাল পেয়ে থাকতে পারেন। সুতরাং বিষয়টি সাবধানে পরীক্ষা করা দরকার।

ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল ঠিক করতে হলে প্রথম ঠিক করতে হবে নাগাষ্টক কবে রচিত হয়েছিল। নাগাষ্টক ১৭৪৫ থেকে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের পরে স্বীকার করা যায় কিন্তু ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের আগে কেন? অধ্যাপক ভট্টাচার্য সে সম্বন্ধে বলেন, "১৭৫০ খ্রীঃ পরে বর্গীর হাঙ্গামার অবসানে নাগাষ্টক রচিত হওয়ার কথা নহে।" অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এ-কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পারলাম না। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্ধমানের মহারাণী রামদেব নাগের নামে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা নেন। তারপরে রামদেব নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' লেখেন, কিন্তু কত পরে, তা জানা যায় না। 'নাগাষ্টক' রচনার সময় যে দেশে বর্গীর হাঙ্গামা ছিল, একথা কোন সূত্র থেকেই জানা যায় না। সুতরাং ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পরে 'নাগাষ্টক' রচিত হতে কোন বাধা নেই।

ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনীতে পাওয়া যায় যে, মূলাজোড় গ্রাম রামদেব নাগের নামে ইজারা দেবার পরে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে আনারপুর অঞ্চলে

বসতি স্থাপনের জন্যে জমি দান করেন। জমিদানের দলিলটি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। সেটি নীচে উদ্ধৃত হল।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

শ্রীতরঙ্গ

নকল

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
সহৃদার চরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণো
নমস্কারঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ

সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনাওরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরজমাই উজ্জট বাস্ত ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি ২১ একইশ বিঘা এবং বেলায়তি সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ৫১ একাওন্ন বিঘা ও একুনে ৭২/০ বাওত্তর বিঘা বৃত্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজ জোতে ভোগ করহ ইতি সন ১১৫৬ ছাপ্পান্ন—১ আগ্রহায়ণ।

এই দলিলের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিবরণীর দুটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, তিনি লিখেছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে আনারপুরে জমি দিলেও ভারতচন্দ্র সেখানে যাননি, মূলাজোড়েই থেকে যান। কিন্তু উপরের সনদে স্পষ্ট লেখা আছে—"সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনাওরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ।" এর থেকে মনে হয়, তিনি আনারপুরে চলে গিয়েছিলেন, পরে আবার কোন কারণে মূলাজোড়ে ফিরে আসেন। ফিরে যে এসেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ তাঁর বংশধররা বরাবর মূলাজোড়েই বাস করছেন। দ্বিতীয়তঃ, দলিলটিতে ৭২ বিঘা জমি দানের কথা আছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র আনারপুর অঞ্চলের ১০৫ বিঘা জমি তাঁকে দান করেছিলেন।

যাহোক্, ভারতচন্দ্র আনারপুরে জমি পান ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে। পাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' রচনা করেন। 'নাগাষ্টক' জমি পাওয়ার

মাত্র এক বছর পরে অর্থাৎ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল ধরলে ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল হয় ১৭১০ খৃঃ।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, নাগাষ্টকের "তৃতীয় শ্লোকে আছে :

'পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী।'

অর্থাৎ তখন তাঁহার পিতা জীবিত এবং তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে প্রথমটির মাত্র জন্ম হইয়াছে।"

সুতরাং নাগাষ্টক ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর অন্ততঃ পাঁচ বছর আগে রচিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। নাগাষ্টক ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল ধরলেও ভারতচন্দ্রের জন্মসাল হয় ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ।

অতএব ভারতচন্দ্র ১৭১০ থেকে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেওয়া জন্মসাল ১৬৩৪ শক বা ১৭১২-১৩ খৃষ্টাব্দ এরই মধ্যে পড়ে, সুতরাং এই সালকে গ্রহণ করতে এখন আর কোন বাধা নেই।

ভারতচন্দ্রের জন্মসাল নির্ণয় করা হল। এখন দেখা যাক্, কোন্ সময়ে তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্পর্শে প্রথম আসেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্বোল্লিখিত 'সত্যপীরের পাঁচালী'টি রচনা করেন। তারপর সম্ভবতঃ আর একটি সত্যপীরের পাঁচালী লেখেন। তারপর নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করবার পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসেন। এই ঘোরাফেরায় অন্ততঃ বছর তিনেক সময় লেগেছিল বলে ধরতে পারি, তার কম ধরা যায় না। এদিকে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের অল্প পরেই কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে অন্নদামঙ্গল রচনার আদেশ জানান। সুতরাং ১৭৪২ খৃষ্টাব্দেরও অন্ততঃ বছর দুই আগে থেকে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে ছিলেন ধরতে হয়। সুতরাং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মহাকবি ভারতচন্দ্রের প্রথম মিলন হয়।

ভারতচন্দ্রের অনুবাদ কাব্য 'রসমঞ্জরী' বোধ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে লেখা প্রথম রচনা। এই কাব্যে ভারতচন্দ্রের 'রায় গুণাকর' উপাধির উল্লেখ নেই, কিন্তু ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের দলিলে তা আছে। অতএব ১৭৪০ থেকে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'রসমঞ্জরী' রচিত হয়।

॥ ছেচল্লিশ ॥

রামপ্রসাদ সেন

অন্তরের ঐকান্তিক আবেগের সঙ্গে অলোকসামান্য কবিত্বশক্তি যুক্ত হলে কি অপার্থিব কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়, তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত। রামপ্রসাদের পদাবলী সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "ইহার তুল্য বঙ্গভাষা-ভাষিত গীতরত্ন এ পর্য্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের প্রধান দোষ দুটি। এক, অশ্লীলতা; আর এক কৃত্রিমতা। রামপ্রসাদের পদাবলী এই দুই দোষ থেকে মুক্ত বলে রামপ্রসাদকে কেউ কেউ যুগের ব্যতিক্রম বলে মনে করেন। কিন্তু রামপ্রসাদের উপর তাঁর যুগের প্রভাব পড়েনি বলা যায় না। কারণ তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনায় কম অশ্লীল নয়। তাঁর 'কালীকীর্তন' কাব্য, যাতে ভগবতীর গোচারণ ও রাসলীলা বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে নিষ্প্রাণতা ও কৃত্রিমতার কোন অভাব নেই। তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলি যে এই দুই দোষ থেকে মুক্ত, তার কারণ এগুলি সাধক রামপ্রসাদের দান। সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবাসী সাধারণতঃ চিরদিনই একক, বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতি দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রামপ্রসাদও সাধনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ, তাই তাঁর সাধনার উপলব্ধি থেকে যে অমৃতনিঃস্যন্দী পদাবলীর জন্ম হয়েছে, তার উপর তদানীন্তন পরিবেশের প্রভাব তেমন করে পড়তে পারেনি। তাঁর আগমনী বিজয়ার গানও অনুভূতির আন্তরিকতায় ভরপুর, তার কারণ এগুলি তো গান নয়, বাল্যবিবাহ-প্রথার পীড়নে নিষ্পেষিত কন্যাবিরহজর্জর বাঙালী পিতামাতার হৃদয়মথিত হাহাকার!

ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদের জীবনীও সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তারপর অনেকেই এসম্বন্ধে নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের গবেষণার ফলে রামপ্রসাদের জীবন ও কাব্যসাধনার একটা আনুমানিক কালক্রম গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

রামপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যুর কাল সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন, "৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহারপূর্ব্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না।" ঈশ্বরচন্দ্র এই খবর পেয়েছিলেন রামপ্রসাদের পৌত্রের কাছে। এই উক্তি অনুসরণ করে দেখা যায়, রামপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এবং তাঁর মৃত্যুকালের উর্ধ্বসীমা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ। এখন সমসাময়িক প্রমাণ এবং রামপ্রসাদের নিজের লেখা থেকে তাঁর জীবৎকাল সম্বন্ধে কি জানা যায় দেখি।

কয়েকটি দানপত্র থেকে রামপ্রসাদের জীবৎকালের নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিদানপত্র। এর তারিখ ৪ ফাল্গুন ১১৬৫ সন অর্থাৎ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। আর একটি সুভদ্রা দেবী নামে জনৈক মহিলার ভূমিদানপত্র, এর তারিখ ২ বৈশাখ ১১৬৫ সন অর্থাৎ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে যখন ইংরেজ সরকার বাংলার নিষ্কর জমির দলিলপত্র তলব করেন, তখন রামপ্রসাদের ছেলে রামদুলাল সেন "তাঁহার পিতা রামপ্রসাদ সেন নামীয় 'মহাত্রাণ' সম্পত্তির বিবরণ" পেশ করেন ১২০২ সনের ১৯ অগ্রহায়ণ তারিখে অর্থাৎ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। সুতরাং রামপ্রসাদ যে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের আগেই পরলোকগমন করেছিলেন, তা সুনিশ্চিত ভাবে জানা যাচ্ছে।

এবার রামপ্রসাদের লেখা বইগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সকলের ধারণা ছিল যে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরের' আগে লেখা হয়। কিন্তু এখন অনেকটা চূড়ান্তভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' শুধু ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার পরে নয়, ভারতচন্দ্রের মৃত্যুরও পরে রচিত হয়েছিল। কারণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে দানপত্রে রামপ্রসাদকে জমি দান করেছেন, তাতে রামপ্রসাদকে শুধু "শ্রীরামপ্রসাদ সেন" বলে সম্বোধন করেছেন, তাঁর 'কবিরঞ্জন' উপাধির কোন উল্লেখ নেই। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের বহু সনদ পরীক্ষা করিয়াছি—দানভাজন ব্যক্তিদের উপাধি সর্ব্বত্র সাবধানে উল্লিখিত থাকে।" সুতরাং ১১৬৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন বা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের

ফেব্রুয়ারী মাসের পরে রামপ্রসাদ ঐ উপাধি পান। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের বহু ভণিতাতেই তাঁর 'কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ আছে, যেমন,

কালীপাদপদ্ম তলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে আনন্দিত কবিগুণরাশি ॥

শুধু তাই নয়, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের বিশিষ্ট নামই 'কবিরঞ্জন'। সুতরাং ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের পরে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রামপ্রসাদের আর একটি গ্রন্থ 'কালীকীর্ত্তন'। কবি জনৈক রাজকিশোরের আদেশে এই কাব্য রচনা করেছিলেন,

শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের নয়ন অঞ্জন ॥

এই রাজকিশোর কে, তা সঠিক্‌ভাবে জানা যায় না। বিশেষজ্ঞেরা এ সম্বন্ধে একমত নন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "ইঁহার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়। ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পিসা শ্যামাসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন।...ভারতচন্দ্রও এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণ-জ্ঞাপক এক পংক্তি কবিতা লিখিয়াছেন,—'মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধার।' (অন্নদামঙ্গল)"। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন বলেন "মনে হয় এই রাজকিশোর ছিলেন হুগলীর দেওয়ান। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল যখন তীর্থযাত্রা করেন তখন হুগলীতে ইঁহার বাড়ীতে মধ্যাহ্নে আহার করিয়াছিলেন, এই কথা তীর্থমঙ্গলে বিজয়রাম ব.লয়াছেন।" তীর্থমঙ্গল রচিত হয় ১১৭৭ সনের ভাদ্রমাসে বা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে। যাহোক্, এই দুজন রাজকিশোরই ১৭৫০ থেকে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং কালীকীর্তনের রচনা-কালকেও এই সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে পারি। কালীকীর্ত্তনের ভণিতাতেও রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ আছে, অতএব এই কাব্যও ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের পরে রচিত হয়েছিল।

রামপ্রসাদের 'কৃষ্ণকীর্তনে'র খুব অল্প অংশই আমরা পেয়েছি, তার থেকে তার রচনাকাল বোঝা যায় না। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতগুলির রচনাকাল কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না, সারা জীবন ধরেই তিনি এগুলি লিখেছিলেন।

মোটামুটিভাবে রামপ্রসাদের যে সমস্ত রচনার রচনাকাল অনুমান করা যাচ্ছে এবং তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত দলিলপত্র পাওয়া যাচ্ছে, তাতে অষ্টাদশ

শতাব্দীর তৃতীয় পাদের আগে বা পরে তাঁর কোন কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। এর একমাত্র কারণ মনে হয়, ঐ পাদের আগে তিনি অল্প-বয়স্ক ছিলেন এবং ঐ পাদের পরে তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের বেশী আগে রামপ্রসাদ জন্মাননি এবং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের বেশী পরে পরলোক গমন করেননি, এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

সম্প্রতি অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রামপ্রসাদ ১৭২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন', পৃঃ ৯-১২ এবং সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৩, পৃঃ ৪-৬ দ্রষ্টব্য)। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের যুক্তিধারা ও প্রমাণপ্রয়োগ বিচার করে দেখে আমাদের কাছে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করবার আগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসকে ঘিরে যেমন উৎকট 'চণ্ডীদাস সমস্যা' আছে, শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদকে ঘিরেও তেম্‌নি একটি ছোটখাট 'রামপ্রসাদ-সমস্যা' রয়েছে। রামপ্রসাদ-নামাঙ্কিত শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে একাধিক কবির রচনা মিশে গিয়ে এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। রামপ্রসাদ-নামাঙ্কিত অনেক পদে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতা দেখা যায়। আর অনেকগুলি পদে 'আপীল,' 'ডিক্রি,' 'ডিস্‌মিস' প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, উপরন্তু, তাঁর 'কালীকীর্তন,' 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি কাব্যে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতা নেই, বরং 'দাস রামপ্রসাদ' ভণিতা রয়েছে। সুতরাং 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতার পদগুলি তাঁর লেখা হতে পারে না। আর রামপ্রসাদের সময়ে পূর্বোক্ত ইংরেজী শব্দগুলি বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত হয়েছিল বলে কিছুতেই মনে করা যায় না। সুতরাং এই পদগুলিও তাঁর লেখা নয়। এই দুই শ্রেণীর পদ কার লেখা সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আরও কয়েকজন রামপ্রসাদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নীচে তাঁদের পরিচয় দিলাম।

(১) পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ। পূর্ববঙ্গে যে রামপ্রসাদ নামে একজন শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন, এই ইঙ্গিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম দেন। পরে তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন দয়ালপ্রসাদ ঘোষ। 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদে পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষার ছাপ সুস্পষ্টভাবে ধরা যায়। সুতরাং

এগুলি পূর্ববঙ্গনিবাসী কোন কবির লেখা বলে স্বীকার করতে বাধা নেই। ঢাকা জেলার চিনিশপুর গ্রামে এক পুরাতন কালীবাড়ী আছে, এর প্রতিষ্ঠা করেন রামপ্রসাদ নামে একজন ব্রাহ্মণ শক্তিসাধক। ইনিই এই গানগুলির রচয়িতা বলে অনুমান করা হয়। ইনি সম্ভবতঃ রামপ্রসাদ সেনের সমসাময়িক।

(২) কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তী। এঁর জীবৎকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত কিছু পদ এঁরই লেখা বলে মনে হয়। তবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেসব পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্যে এঁর পদ একটিও নেই, যেহেতু ইনি গুপ্তকবির সমসাময়িক ছিলেন। অনেকে বলেন, কবিওয়ালা রামপ্রসাদের সাধক হিসেবে কোন প্রসিদ্ধি নেই, অতএব তিনি শ্যামাসঙ্গীত লিখতে পারেন না। কিন্তু এই যুক্তি খুবই দুর্বল। দাশরথি রায়ও সাধক ছিলেন না, কিন্তু তিনি বহু ভাবগভীর ও অনবদ্য শ্যামাসঙ্গীত লিখেছিলেন, সেগুলি আজও জনপ্রিয়।

(৩) প্রণয়ী দ্বিজ রামপ্রসাদ। ডঃ সুকুমার সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে লেখা একটি পুঁথিতে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতায় একটি গান পেয়েছেন, তাতে ব্যর্থ প্রণয়ীর খেদ প্রকাশিত হয়েছে। ইনি কোন শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ মেলে না।

(৪) 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচয়িতা দ্বিজ রামপ্রসাদ। বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত একটি 'সত্যপীরের পাঁচালী'র দুখানি পুঁথি আছে। একটির লিপিকাল ১৭১১ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ বা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ। একখানি পুঁথিতে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায়,

সাক চন্দনের পিষ্টে সমুদ্রে অমর। নিরপন তাহার পিষ্টেতে রাখী সর ॥

(পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯২)

চন্দন = চন্দ্র = ১, সমুদ্র = ৭, সর = শর = ৫।

অমর শব্দের পারিভাষিক অর্থ অজ্ঞাত। কিন্তু অমর শব্দের অর্থ '০' না ধরে অন্য কিছু ধরলে গ্রন্থের রচনাকাল পুঁথির লিপিকালের পরবর্তী হয়ে পড়ে, যা অসম্ভব। সুতরাং ১৭০৫ শকাব্দ বা ১৭৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দই দ্বিজ রামপ্রসাদের সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল। এই দ্বিজ রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না।

(৫) বন্দ্যঘটীয় বংশের রামপ্রসাদ রায়। ইনি তাঁর পিতা জগৎরাম রায়ের সঙ্গে মিলে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' ও 'অদ্ভুত-আশ্চর্য রামায়ণ' লিখেছিলেন।

এই দুই কাব্যের রচনাসমাপ্তিকাল যথাক্রমে ১৭৭০ খৃঃ ও ১৭৯১ খৃঃ। ইনিও জাতিতে 'দ্বিজ' ছিলেন, সুতরাং রামপ্রসাদ ভণিতা যুক্ত পদাবলীর মধ্যে এঁর পদ থাকাও অসম্ভব নয়। তবে এঁর শ্যামাসঙ্গীত রচনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৬) পেস্কার রামপ্রসাদ। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "চিনীশপুরের রামপ্রসাদের অনুকরণে যাঁহারা শাক্তসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন চিনীশপুরের সংলগ্ন জিনার্দ্দীগ্রাম নিবাসী রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।...তিনিও 'তান্ত্রিক' ছিলেন, অর্থাৎ বীরাচারী শাক্ত ছিলেন এবং কর্ম্মজীবনে ঢাকা কালেক্টরীর 'পেস্কার' ছিলেন। তাঁহার জামাতা ঢাকা জিলার মহেশ্বরদির অন্তর্গত পারলীয়ানিবাসী মদনমোহন চক্রবর্ত্তী প্রায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫ বৎসর বয়সে স্বর্গত হন—এতদ্দ্বারা তাঁহার অভ্যুদয়কাল মোটামুটি জানা যায়।" সুতরাং যেসব গানে ডিক্রী, ডিস্‌মিস্‌, ইষ্টাম্বরি, সদর প্রভৃতি আইন আদালত ঘটিত ইংরেজী শব্দ আছে, তাদের সবগুলি নাহোক্‌ কতকগুলি এই 'পেস্কার' রামপ্রসাদের রচনা বলে মনে হয়।

সুতরাং 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত পদগুলি এবং রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত কোন কোন পদ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের লেখা নয়, উপরে উল্লিখিত কবিদের মধ্যে এক বা একাধিক জনের লেখা, এই সিদ্ধান্ত অনস্বীকার্য। এছাড়া পরবর্তী কোন কোন কবি নিজে পদ লিখে রামপ্রসাদের নামে চালিয়েছেন। সুতরাং রামপ্রসাদ ভণিতা যুক্ত কোন পদকে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বলে গ্রহণ করার আগে সাবধানে পরীক্ষা করে নিঃসংশয় হয়ে নেওয়া কর্তব্য। কোথায় ঐ পদ পাওয়া গেছে এবং সে সূত্র কতখানি নির্ভরযোগ্য, তা ভাল করে দেখা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণ লোক তো দূরের কথা, বহু গবেষকও এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেননি।

পরিশিষ্ট

॥ ক ॥

মুকুন্দরাম-প্রসঙ্গের পুনরালোচনা

বিতর্কমূলক বিষয় সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। মুকুন্দরামের কালনিরূপণের প্রশ্নের মীমাংসা করা তাই সহজসাধ্য নয়। এ সম্বন্ধে আলোচনার উপকরণ বড় কম নয়। বর্তমান গ্রন্থের 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' শীর্ষক আলোচনায় (পৃঃ ১৯৯-২০৮) আমরা সমস্ত উপকরণ একত্র সংগ্রহ করে এই প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা করেছি। কোন উপকরণকেই আমরা জাল বা প্রক্ষিপ্ত বলিনি, সবগুলিকেই স্বীকার করে নিয়ে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু তার ফলে আমাদের একটি বিশেষ মতের দিকে ঝুঁকতে হয়েছে। যেখানে একটি সূত্রের বিভিন্ন পাঠান্তর পাওয়া যায়, সেখানে একটি বিশেষ পাঠকেই আমরা গ্রহণ করেছি ও তার অনুকূলে যুক্তি দেখিয়েছি। তেমনি যেখানে একই সূত্রের নানারকম ব্যাখ্যা সম্ভব, সেখানে আমাদের মনোমত ব্যাখ্যা দিয়েছি। কিন্তু পাঠান্তর ও মতান্তর গ্রহণ করলে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের রূপান্তর ঘটা সম্ভব। এছাড়া ঐ আলোচনা ছাপা হবার পরে কোন কোন স্বতন্ত্র বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং কিছু নতুন চিন্তাও মনে জেগেছে। তাই এখানে কয়েকটি বিষয়ের পুনরালোচনা করা দরকার মনে করছি।

প্রথমে মুকুন্দরামের দেশত্যাগকালের প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাক্। আমরা আগে স্থির করেছি মুকুন্দরাম ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে দেশত্যাগ করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আত্মকাহিনীর দ্বিতীয় শ্লোকে 'অধর্ম্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে' ইত্যাদি পাঠকেই মূল পাঠ বলে ধরেছি। 'অধর্ম্মী রাজার কালে'র জায়গায় 'সে মানসিংহের কালে' বা 'রাজা মানসিংহের কালে' পাঠ গ্রহণ করলে মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পড়ে। ইতিপূর্বে (পৃঃ ২০০-২০১এ) এই দুই পাঠ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আমরা যুক্তি দেখিয়েছি। কিন্তু ঐ অংশ ছাপা হবার পর এখন মনে হচ্ছে, এ যুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হলেও অলঙ্ঘনীয় নয়। কারণ, মানসিংহের শাসনকালে আঞ্চলিক শাসনকর্তার অত্যাচার ভোগ করা সত্ত্বেও মুকুন্দরাম হয়তো অন্য সূত্রে মানসিংহের মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে "ধন্য রাজা

মানসিংহ" বলেছেন। কিংবা হয়তো মুকুন্দরামের দেশত্যাগ ও কাব্যরচনা দুইই মানসিংহের শাসনকালে ঘটেছিল—প্রথমটি ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের অল্প পরে এবং দ্বিতীয়টি ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে। তাই তিনি মানসিংহের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন এবং তাঁর সময়ে আঞ্চলিক শাসনকর্তার অত্যাচার প্রজার পাপের ফলে ঘটেছিল বলেছেন।

'সে মানসিংহের কালে' অথবা 'রাজা মানসিংহের কালে' পাঠ গ্রহণের পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, যে সমস্ত পুঁথিতে আত্মকাহিনী পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে দুখানি ভিন্ন অন্য সমস্ত পুঁথিতেই এই পাঠ আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুঁথিতে (লিপিকাল ১৭১৭ শক বা ১৭৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ) "রাজা মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে' ইত্যাদি পাঠ পাওয়া গেছে। এই পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে, বাংলাদেশ থেকে মানসিংহ বিদায় গ্রহণ করবার পরে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেন। এই হিসাবে মুকুন্দরামের দেশত্যাগকালের উর্ধ্বতম সীমা হয় ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ।

এখন, 'সে মানসিংহের কালে' বা 'রাজা মানসিংহের কালে' অথবা 'রাজা মানসিংহ গেলে' পাঠ গ্রহণ করলে আমাদের মূল প্রবন্ধে ব্যবহৃত কতকগুলি উপকরণের পুনর্বিচার করা দরকার হয়ে পড়ে। এখন আমরা তাই করব।

(ক) 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' ইত্যাদি শ্লোকটিকে আমরা ইতিপূর্বে মুকুন্দরামের দেশত্যাগকালের সূচক বলে গ্রহণ করেছি। মুকুন্দরাম ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অথবা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের পরে দেশত্যাগ করেছিলেন ধরলে শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলতে হয়। শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলার অনুকূলে প্রথম যুক্তি এই যে, শ্লোকটি কেবলমাত্র ছাপা বইতে এবং একটিমাত্র পুঁথিতে পাওয়া গিয়েছে, পুঁথিটির লিপিকাল আবার ছাপা বইএর প্রকাশের পরবর্তী। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, মুকুন্দ কবিচন্দ্র নামে জনৈক কবির লেখা একখানি বাশুলীমঙ্গল কাব্যে (পুঁথির লিপিকাল ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ—সা. প. প., ১৩৬২, পৃঃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য) এই শ্লোকগুলি পাওয়া গিয়েছে,

> শাকে রস রথ (রস) বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
> বাসুলীমঙ্গল গীত হইল সেই হইতে॥
> চণ্ডীর চরণে মতি পূর্ব্বজন্মতপে।
> পয়ার রচিয়া কথা কথিব সংক্ষেপে॥

অনুমান করা যেতে পারে 'শাকে রস' ইত্যাদি চরণটি মূলে 'বাশুলীমঙ্গল' কাব্যেরই, পরবর্তিকালে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কোন কোন পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। 'শাকে রস' ইত্যাদি চরণটি 'বাশুলীমঙ্গলে'র রচনাকাল নির্দেশক বলে মনে হয় না। কারণ 'বাশুলীমঙ্গলে'র ভাষা নিতান্ত আধুনিক। এতে ছন্দের বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং ৮ অক্ষরের চরণবিশিষ্ট পদের নিদর্শন পাওয়া যায়, যা ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কারণে মনে হয় এই বইটির রচনাকাল পুঁথির লিপিকালের অর্থাৎ ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রায় সমসাময়িক। উদ্ধৃত শ্লোকগুলি দিয়ে কবি ১৪৬৬ শকাব্দে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল বলতে চাইছেন, এরকম মনে হয় না, ১৪৬৬ শকাব্দে সর্বপ্রথম বাশুলীমঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয়েছিল বলাই তাঁর অভিপ্রেত বলে মনে হয়। হয়তো মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকেই আলোচ্য কবি আদি চণ্ডীমঙ্গল বা বাশুলীমঙ্গল বলে মনে করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে 'শাকে রস' ইত্যাদি চরণটি মুকুন্দরামের রচনা বলে মনে করা যায়। গ্রহণ না করলে বিপরীত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি প্রবল হয়ে ওঠে।

(খ) রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক "রাজা রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ শক [১৫৭৩ খৃঃ অঃ] হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শক [১৬০৩ খৃঃ অঃ] পর্যন্ত ৩০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন।" অম্বিকাচরণ গুপ্তও রামগতি ন্যায়রত্নের মত সমর্থন করেছিলেন এবং আমরাও আমাদের মূল প্রবন্ধে (পৃঃ ২০৬) এই মত কার্যতঃ গ্রহণ করেছি। রঘুনাথ রায়ের রাজত্ব-কাল ১৫৭৩-১৬০৩ খৃঃ হলে তাঁর পিতা বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুকাল ১৫৭৩ খৃঃ র পূর্ববর্তী হয় এবং ১৫৯৪-১৬০৬ খৃঃর মধ্যে অথবা ১৬০৬ খৃঃর পরে মুকুন্দরামের দেশত্যাগ অসম্ভব হয়। কিন্তু রামগতি ও অম্বিকাচরণ তাঁদের মতের স্বপক্ষে কোন দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত করেননি। সুতরাং রঘুনাথের প্রকৃত রাজত্বকাল যে ১৫৭৩-১৬০৩ খৃষ্টাব্দই, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

(গ) চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত 'কবিকঙ্কণের চৌতিশা'র রচনাকাল 'চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত' থেকে ১৫৯৪ খৃঃর অল্প পরে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সম্পূর্ণ হয়েছিল বলবার যুক্তি পাওয়া যায় (পৃঃ ২০২-২০৩ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই চৌতিশার সঙ্গে যখন ছাপা বইয়ের পাঠের মিল নেই এবং এতে যখন মুকুন্দরামের ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন চৌতিশাটি মুকুন্দরামের রচনা

নাও হতে পারে। তাছাড়া চৌতিশাটির রচনাকালনির্দেশক শ্লোকটির পাঠ বিকৃত। সুতরাং এর থেকে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছোনো যায় না।

(ঘ) মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী গ্রামে 'রঘুনাথ শর্মা'র নামাঙ্কিত ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪-০৫ খৃষ্টাব্দের শিলালিপিটির উল্লেখ করে আমরা লিখেছি, "১৬০৩ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের রাজত্বের অবসান ঘটেছিল, এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।" (পৃঃ ২০৪) কিন্তু এই 'রঘুনাথ শর্মা' যে মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক 'রঘুনাথ রায়', তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আড়রা থেকে কেশিয়াড়ীর দূরত্ব তখনকার হিসাবে খুব কম নয়। রঘুনাথ রায় 'ব্রাহ্মণভূমের রাজা' বলেই পরিচিত ছিলেন, কেশিয়াড়ী ব্রাহ্মণভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাছাড়া "রঘুনাথ শর্মা'র শিলালিপি উড়িয়া ভাষায় লেখা, সুতরাং 'রঘুনাথ শর্মা'কে বাঙালী রঘুনাথ রায়ের সঙ্গে অভিন্ন না ধরে স্বতন্ত্র কোন উড়িয়া রাজা বলেও মনে করা যায়। অতএব এই শিলালিপি থেকে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ রায়ের রাজত্বের অবসান সমর্থিত হয় না।

অথবা, 'সে মানসিংহের কালে' বা 'রাজা মানসিংহের কালে' পাঠ গ্রহণ করলে বলা যেতে পারে, এ শিলালিপি যদি রঘুনাথ রায়েরই হয়, তাহলেও ১৫২৬ শকের আগে রঘুনাথের রাজত্বের অবসান প্রমাণিত হয় না। কারণ, শিলালিপির ভাষা (পৃঃ ২০৩ দ্রষ্টব্য) থেকে এও মনে করা যেতে পারে যে ভূমিপ রঘুনাথ শর্মার জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র চক্রধর শর্মা এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। তাহলে রঘুনাথ রায় ১৬০৪-০৫ খৃষ্টাব্দেও রাজত্ব করতেন বলা চলে এবং তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে রামগতি ও অম্বিকাচরণের উক্তি অমূলক বলতে হয়। কিন্তু 'রাজা মানসিংহ গেলে' পাঠ গ্রহণ করলে আর একথা বলা চলবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দেরও পরে রঘুনাথের পিতা বাঁকুড়া রায় রাজত্ব করতেন বলতে হবে এবং আলোচ্য শিলালিপিটি অন্য এক রঘুনাথের বলেই স্বীকার করতে হবে।

(ঙ) "সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায় শিশুপাঠে কৈলা নিয়োজিত" ইত্যাদি উক্তি থেকে মুকুন্দরামের আরড়ায় আগমনের সময় রঘুনাথ "শিশু" ছিলেন এবং কবির দেশত্যাগ ও কাব্যরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ কালব্যবধান ছিল বলে সিদ্ধান্ত করেছি (পৃঃ ২০৬)। কিন্তু ডঃ মনোমোহন ঘোষ এই উক্তিটির অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং, তাঁর ব্যাখ্যাও অযৌক্তিক বলা যায় না। তিনি লিখেছেন, "উল্লিখিত অংশটির সারার্থ এই দাঁড়ায় যে, বাঁকুড়া রায়

মুকুন্দরামকে শিশুদের পাঠে অর্থাৎ গুরু মহাশয়ের কাজে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র রঘুনাথ (মুকুন্দরামকে দেবানুগৃহীত ব্যক্তি জানিয়া) তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।" (বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৪৬)

'শিশু পাঠে'র জায়গায় 'সুত পাঠে' এবং 'সুত পাছে' পাঠও পাওয়া যায়। 'সুত পাঠে' পাঠ ঠিক হলে তার থেকে কবির আরড়ায় আগমন ও কাব্যরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ কালব্যবধান প্রমাণিত হয় না। কারণ, রঘুনাথ প্রথম যৌবনে মুকুন্দরামের কাছে পড়তে পারেন এবং তার অল্প পরে রাজা হয়ে কবিকে চণ্ডীমঙ্গল রচনায় উৎসাহ দিতে পারেন। 'সুত পাছে' পাঠ গ্রহণ করলে রঘুনাথ মুকুন্দরামের কাছে পড়েননি, তাঁর সান্নিধ্য মাত্র লাভ করেছিলেন, এমন কথা বলা যায়।

এইভাবে উপকরণগুলির ব্যাখ্যা করলে 'সে মানসিংহের কালে' বা 'রাজা মানসিংহের কালে' অথবা 'রাজা মানসিংহ গেলে' পাঠ সমর্থন করা যায় এবং ১৫৯৪-১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের পরে মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল নির্দেশ করতে বাধা থাকে না।

মূল প্রবন্ধে (পৃঃ ২০৭) আমরা শিবরাম চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত ১৬১৯, ১৬৪০ ও ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের দলিলের উল্লেখ করেছি। প্রথম দুটি দলিলের তারিখ যদি অকৃত্রিম হয় এবং শেষ দলিলের শিবরাম চক্রবর্তী যদি মুকুন্দরামের পুত্র হন, তাহলে ১৫৭০ খৃঃর কাছাকাছি সময়ে শিবরামের জন্ম ধরে আমাদের মূল প্রবন্ধের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। কিন্তু তাহলে মুকুন্দরামের আনুমানিক জন্মাব্দের (১৫২০ খৃঃ) সঙ্গে শিবরামের জীবৎকালের একটি বৎসরের (১৬৫৩ খৃঃ) ব্যবধান হয় ১৩৩ বছর। এ ব্যাপার একেবারে অসম্ভব নয়। কবি রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে শিবরামের বয়স ৮৩ বছর না ধরে ৫০।৫৫ বছর ধরলে তাঁর জন্মাব্দ হয় ১৬০০ খৃঃর কাছাকাছি সময় এবং মুকুন্দরামের দেশত্যাগ যদি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঘটে থাকে, তাহলে শিবরামের পক্ষে "ওদনের তরে" ক্রন্দনরত "শিশু"র সঙ্গে অভিন্ন হওয়াও সম্ভব হয়। এদিক দিয়ে 'সে মানসিংহের কালে', 'রাজা মানসিংহের কালে,' 'রাজা মানসিংহ গেলে' ইত্যাদি পাঠই সমর্থিত হয়।

বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও তিনটি বিষয়ের এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) অম্বিকাচরণ গুপ্ত ১৩১২ বঙ্গাব্দের 'প্রদীপে' লিখেছিলেন, মুকুন্দরাম বৃদ্ধবয়সে দামিন্যায় ফিরে এসেছিলেন। ঐ সময়ের আঞ্চলিক শাসনকর্তা তাঁকে সম্মান দেখান এবং তাঁর পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীর নামে "ষোল বিঘা বাস্তু বাগাত ইত্যাদি নিষ্কর করিয়া" সনদ লিখে দেন। এই সনদটিরই তারিখ ১০২৫ সনের ফাল্গুন মাস বা ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ। অম্বিকাচরণের কথা সত্য হলে বলতে হবে মুকুন্দরাম ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে জীবিত ছিলেন। তবে অম্বিকাচরণের উক্তি কিংবদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা চলে না।

(২) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে চৈতন্যদেবের বন্দনা আছে। বহু পুঁথি ও ছাপা বইএ চৈতন্য-বন্দনার মধ্যে এই অংশটি পাওয়া যায়,

অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা হরি পদছায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারিকা।
ত্রিগর্ত্ত লাহোর দিল্লী ভ্রমিলা অনেক পল্লী
করি প্রভু মুক্তির সাধিকা॥
কয়াড় অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
বিনয়ে মাগিলা বর জপি মন্ত্র দশাক্ষর
মীনমাংস ত্যজি বহুকাল॥

এই মহামিশ্র জগন্নাথ মুকুন্দরামের পিতা। কিন্তু তিনি কার কাছে বর মেগেছিলেন? শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে কি? চৈতন্য-বন্দনার মধ্যে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকায় তাই মনে হয়। তাহলে কি উদ্ধৃত অংশের অর্থ এই যে— মহাপ্রভু যখন ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময়ে মুকুন্দরামের পিতা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বর প্রার্থনা করেছিলেন? ১৫১০ থেকে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ অবধি মহাপ্রভু তীর্থভ্রমণ করেছিলেন। এই সময় মুকুন্দরামের পিতা যদি বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় জীবিত থাকেন, তাহলে মুকুন্দরামের জীবৎকাল মোটামুটিভাবে স্থির করা যায়। কিন্তু 'কয়াড় অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ' ইত্যাদি শ্লোকটি সব পুঁথিতে চৈতন্য বন্দনার মধ্যে পাওয়া যায় না এবং 'বিনয়ে

মাগিলা বর' এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও বোধহয় সকলে একমত হবেন না। কাজেই আপাততঃ এ থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাচ্ছে না।

(৩) জনৈক গবেষক লিখেছেন, "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে পাওয়া যায় যে সহর সেলেমাবাজের ভূস্বামী গোপীনাথ নেউগীর তালুক দামিন্যায় কবির পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। এই সেলিমাবাজ—সেলিমাবাদ সহর বর্ত্তমান রায়না—রায়নগর গ্রামে পরিণত হইয়াছে। সেলিমাবাদ সুলেমানাবাদের অপভ্রংশ। সুলেমানাবাদ সরকার বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অংশবিশেষ ছিল এবং সুলেমানাবাদ ঐ নামে অভিহিত সরকারের শাসন ও রাজস্বের প্রধান কেন্দ্র ও প্রধান সহর ছিল।...Hunter সাহেবের গ্রন্থ (Statistical Account of Bengal) হইতে পাওয়া যায় যে বঙ্গের পাঠান রাজা সুলেমান ১৫৬৩ হইতে ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে ঐ সরকারের নামকরণ হইয়াছিল 'সুলেমানাবাদ'।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী, শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৭-৮)। Hunter বা উল্লিখিত গবেষক, কেউই তাঁদের উক্তির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করেননি। সুতরাং উদ্ধৃত উক্তির মূল্য আপাততঃ নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে হতে পারে না। কারণ তাহলে বলতে হবে, ১৫৬৩ থেকে ১৫৭৩ খৃঃ র মধ্যে 'সুলেমানাবাদ' সরকারের নামকরণ হয়, তাই থেকে পরে তার 'সেলিমাবাদ' এবং আরও পরে 'সেলিমাবাজ' নাম দাঁড়ায়। এত পরিবর্তন ত্রিশ বছরের কম সময়ে হয় না। এদিক দিয়ে ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিংবা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের পরে মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল নির্ধারণ সমীচীন হয় এবং 'সে মানসিংহের কালে' বা 'রাজা মানসিংহের কালে' অথবা 'রাজা মানসিংহ গেলে' পাঠ সমর্থিত হয়।

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়ল, কিন্তু মুকুন্দরামের সময় সংক্রান্ত প্রশ্নের সুনিশ্চিত মীমাংসা করা গেল না। প্রশ্নটি যে কত জটিল, তা আশা করি এখন সকলেই বুঝতে পারছেন।

আমাদের মূল প্রবন্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এই পুনরালোচনার মধ্য দিয়ে তাদের গুরুত্ব খর্ব করা হয়নি। মূল প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত উপকরণকেই স্বীকার করে নিয়ে তাদের সমন্বয় করার চেষ্টা হয়েছে। এই চেষ্টা করলে সেখানে আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছি, তাদের কোন পরিবর্তন হয় না। অন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে কোন না কোন উপকরণকে বাদ দিতে হয়। অবশ্য বাদ দেওয়ার অনুকূলেও যে কোন যুক্তি নেই, তাও নয়।

এরকম অবস্থায় মুকুন্দরামের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার সঠিক কাল নির্ধারণ করবার আশা দুরাশা মাত্র। মাত্র দুটি বিষয় সম্বন্ধে সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সে দুটি বিষয় নীচে উল্লেখ করা হল।

(১) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যখন গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের শাসনকর্তা হিসাবে মানসিংহের উল্লেখ আছে, তখন তা ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের আগে রচিত হতে পারে না। চণ্ডীমঙ্গল রচনার নিম্নতম সীমা নির্ধারণ করা যায় জয়পুর গ্রামে 'দ্বিজাবনীশ' শ্রীধরের শিলালিপি থেকে (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২০৪ দ্রষ্টব্য)। ১৫৪৫ শক বা ১৬২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীধর ব্রাহ্মণভূমির রাজা, সুতরাং মুকুন্দ-রামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের রাজত্ব তার আগেই শেষ হয়েছে। সুতরাং ১৫৯৪ থেকে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

(২) মানসিংহের গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার আগে অর্থাৎ ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের আগেই যদি মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করে থাকেন, এবং মানসিংহ আসার অব্যবহিত পরেই কাব্য রচনা করে যদি তিনি দেহত্যাগ করে থাকেন, তাহলেও তিনি ১৫৯৪ খৃঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মুকুন্দরাম যদি মানসিংহের শাসনকালে (১৫৯৪-১৬০৬ খৃঃ) বা তার কিছু পরে দেশত্যাগ করে থাকেন, তাহলেও তিনি ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের আগেই যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সংশয় নেই। অতএব যে দিক থেকেই দেখা যাক্ না কেন, মুকুন্দরাম ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

॥ থ ॥

কয়েকটি অধ্যায় সম্বন্ধে বক্তব্য

চর্যাগীতি

পৃঃ ৩, পংক্তি ১৬-২৪ :—

"এই ৫০টি চর্যাগীতির ভণিতায় এঁদের নাম পাওয়া যায়" বলে যে নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেই নামগুলি যে ঐভাবেই ভণিতায় পাওয়া যায়, তা নয়। ভণিতায় হয়তো কোন নাম সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে গানের শীর্ষক বা অন্যান্য সূত্র থেকে পূর্ণ নামটি উদ্ধার করা গিয়েছে।

বিদ্যাপতি

পৃঃ ৪৬, পংক্তি ১৮-২১ :—

এখানে আমরা নরসিংহের যে শিলালিপিটির উল্লেখ করেছি, সেটি ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারও একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি "শরাশ্বমদনঃ" শক না লিখে সর্বত্র "শরসবমদন" লিখেছেন (বিদ্যাপতি, ভূমিকা, পৃঃ ২৸৵০ এবং সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৩, পৃঃ ১৪৪) এবং এক জায়গায় লিখেছেন, শর = ৫, সব = ৭, মদন = ১৩। অথচ শিলালিপিটির যে প্রকাশিত বিবরণ থেকে তিনি এটির সন্ধান পেয়েছেন, তাতে স্পষ্টভাবেই 'শরাশ্বমদনঃ' লেখা আছে (J. B. O. R. S., 1934, pp. 15-19 দ্রঃ)। বিমানবিহারী বাবু কাব্যপ্রকাশবিবেকের পুঁথির পুষ্পিকায় উল্লিখিত 'সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায়' উপাধিটিকে সর্বত্র 'সপ্রতিষ্ঠ সদুপাধ্যায়' লিখেছেন। বিমানবিহারী বাবুর লেখা 'বিদ্যাপতি'র ভূমিকায় আরও অনেক তথ্যের ভুল আছে।

চণ্ডীদাস

পৃঃ ৫০, পংক্তি ১৭-২৬ :—

গোবিন্দদাসের ভণিতায় একটি চণ্ডীদাস বন্দনার পদ পাওয়া গিয়েছে (গৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সংস্করণ পৃঃ ৩৬৯)। পদটি যদি সত্যই ষোড়শ শতাব্দীর গোবিন্দদাস কবিরাজের লেখা হয়, তাহলে চণ্ডীদাসের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

পৃঃ ৫৭, পংক্তি ২৮-২৯ :—

"চৈতন্যপরবর্তী যুগের অসংখ্য বৈষ্ণবগ্রন্থের কোথাও এই লীলার কোন

সন্ধান পাওয়া যায় না" বাক্যটি বর্জিত হবে, কারণ কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গলে ভারখণ্ড পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস মাধব-আচার্যের শিষ্য এবং ষোড়শ শতাব্দীর লোক। সুতরাং আমরা যে কৃষ্ণের ভারবহন লীলার বর্ণনা থাকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে প্রাচীন বলেছি, তা এই আবিষ্কারের দ্বারা খণ্ডিত হচ্ছে না। চৈতন্যপরবর্তী যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে ভারখণ্ড লীলার বিরলতা সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র রায় প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (ভবানন্দের হরিবংশ, ভূমিকা, পৃঃ ৩৮৶০ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ৭৫, পংক্তি ৩ :—

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে লিখেছেন যে চৈতন্যদেবের জন্মের আগে নবদ্বীপে "বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।"

পৃঃ ৮৩, পংক্তি ১৩ :—

এখানে "গুরু" শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রায়শেখর—এই পাঁচজন কবির নামে প্রচলিত সহজ-সাধনের কাহিনী স্মরণ করে সহজিয়ারা অনুপ্রেরণা লাভ করেন, তাই আমরা এই পাঁচজনকে তাঁদের "গুরু" বলেছি। সহজিয়ারা এঁদের "রসিক" আখ্যায় অভিহিত করে থাকেন।

বিপ্রদাস পিপিলাই

পৃঃ ১১৯, পংক্তি ১৯-২০ :—

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ইংরেজরা প্রথম সুতানুটি গ্রামে আশ্রয় নেয়, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তারা পাকাপাকিভাবে সুতানুটি দখল করে এবং তার কিছুকাল পরে 'কলিকাতা' নামক গ্রামটি নিজেদের অধিকার-ভুক্ত করে। শেষোক্ত ঘটনার সময়কেই আমরা আনুমানিকভাবে ১৬৯৪ খৃঃ ধরেছি। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা বাংলার সুবেদার শাহজাদা আজিমের কাছ থেকে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি সরকারীভাবে কিনে নেয়।

পৃঃ ১২০, পংক্তি ১৪-৩০ : —

'নারদপুরাণের' কোন কোন পুঁথিতে "দশ দশ শত নিরেনব্বই সালে"র পরিবর্তে "সন এগার শও নিরানব্বই সালে" পাঠ পাওয়া যায় (বা. সা. ই. ১।২, পৃ: ৬২৬)। এই পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে 'নারদপুরাণ' রচিত হয়েছিল এবং আলোচ্য বিষয়ে তার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নেই। কিন্তু

দীনেশবাবুর ব্যবহৃত পুঁথিটির লিপিকাল ১১০৮ সাল, আর একটি পুঁথির লিপিকাল ১১৩৪ সাল। এই দুই সাল যদি বঙ্গাব্দ হয়, তবে 'নারদপুরাণের' রচনাকাল ১১৯৯ বঙ্গাব্দ হতে পারে না। তবে ঐ দুই সাল মল্লাব্দও হতে পারে। যাহোক্ নারদপুরাণের রচনাকাল সুনিশ্চিতভাবে স্থির না হওয়া পর্যন্ত তার সাক্ষ্য আমাদের বিশেষ কোন কাজে লাগবে না।

পৃঃ ১২১, পংক্তি ২-৫ :—

"ষোলশ ষোড়শ শাকে তৈষ শেষ হৈতে" অর্থ ১৬১৬ শকাব্দের পৌষ মাসের অবসানে। ১৬১৬ শকাব্দের অধিকাংশ এবং পৌষ মাসের আরম্ভ ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে পড়লেও পৌষ মাসের শেষাংশ ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পড়েছিল।

পৃঃ ১২২, পংক্তি ১৪-১৮ :—

১৬৪৯ শকাব্দের আষাঢ় মাসে অর্থাৎ ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে লেখা একটি পুঁথিতেও এই ছত্রগুলি পাচ্ছি। সেখানে পাঠ এই,

কালীঘাটা মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান দুই কুলে বসাইল হাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দুই কূলে যাত্রী ঠাট কিঙ্করে বেসায় নানা বাট॥

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের আর এক জায়গায় 'কলিকাতা'র উল্লেখ রয়েছে। সেই অংশটিও নীচে উদ্ধৃত করছি,

কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা। বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে। ধনস্ত গ্রাম খানা সাধু এড়াইল বামে॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

পৃঃ ১২৫, পংক্তি ১-১২ :—

"কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত" এর সম্পাদক গৌরীনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, কামতা-রাজ নরনারায়ণের কবীন্দ্র পাত্র নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন, তিনিই মহাভারত রচয়িতা কবীন্দ্র বলে কুচবিহার অঞ্চলে প্রবাদ প্রচলিত আছে। আসামের বুরঞ্জী, দরঙ্গরাজবংশাবলী, কুচবেহাররাজবংশাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে এই কবীন্দ্র পাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর মহাভারত রচনার উল্লেখ কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। কুচবিহার থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব বিবেচনা করলেও দুই কবীন্দ্রের অভিন্নতা সম্ভাব্য বলে মনে হয় না। নর-নারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৫৫-১৫৮৮ খৃঃ। কবীন্দ্রের মহাভারত রচনার সময়ের

সঙ্গে এর বহু বছরের ব্যবধান। এদিক দিয়ে বিচার করলেও একই সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

পৃঃ ১২৬, পংক্তি ৪-৬ :

কেউ কেউ বলেছেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর ভণিতায় দুটি পৃথক অশ্বমেধ পর্বের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, অতএব এঁরা পৃথক লোক। কিন্তু এই যুক্তি বিচারসহ নয়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রথমে পরাগল খানের আজ্ঞায় সমস্ত মহাভারতই সংক্ষেপে অনুবাদ করেছিলেন, তাতে অন্যান্য পর্বের মত অশ্বমেধ পর্বও ছিল। পরে তিনি যখন ছুটি খানের আজ্ঞায় জৈমিনি-ভারত অবলম্বনে বিস্তৃত আকারে অশ্বমেধপর্ব রচনা করলেন, তখন তাঁকে আবার নতুন করে লিখতে হল এবং স্বভাবতঃই আগেকার সংক্ষিপ্ত অশ্বমেধপর্বের সঙ্গে তার বিশেষ কোন মিল থাকল না।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী অভিন্ন বলে সিদ্ধান্ত করলেও এই দুটি নামের মধ্যে কোন্‌টি কবির প্রকৃত নাম আর কোন্‌টি উপাধি, অথবা দুটিই উপাধি কিনা, সে সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত।

শ্রীচৈতন্যদেব

পৃঃ ১৩৫, পংক্তি ২২-২৫ :—

সন্ন্যাসগ্রহণের পরে শ্রীচৈতন্যদেব কেন নীলাচলে বাস করেছিলেন, তার কারণ এখানে অনুমান করা হয়েছে। এখন আমার মনে হচ্ছে, আরও একটি কারণ হয়তো এর পিছনে ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায় একদিকে বাংলায়, অপরদিকে বৃন্দাবনে কাজ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ সেখানেও তাঁর অনুগামী সম্প্রদায় গড়ে তোলা এবং তা যে গড়ে উঠেছিল, বর্তমান গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তাম্রশাসনটি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। এই তিন জায়গার শিষ্য-ভক্ত-অনুগামীদের সঙ্গে সমান যোগাযোগ রাখতে হলে শ্রীচৈতন্যদেবের এমন জায়গায় অবস্থান করা দরকার, যা এই তিন জায়গা থেকেই সমদূরবর্তী। নীলাচল বাংলা, বৃন্দাবন ও দক্ষিণভারতের প্রায় কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত। এইজন্যেও হয়তো শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দ

পৃঃ ১৫৮, পংক্তি ৬-৯ :—

রূপগোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে গোপালভট্টের 'হরিভক্তিবিলাসের' নাম উল্লেখ এবং শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ১৪৬৩ শকাব্দ বা ১৫৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। সুতরাং 'হরিভক্তিবিলাস' তারও আগেকার রচনা। কিন্তু এতে আমাদের অনুমিত গোপালভট্টের জন্মসময়ের পরিবর্তন করার দরকার হচ্ছে না। গোপালভট্ট যদি ১৫০০ থেকে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি স্বচ্ছন্দেই 'হরিভক্তিবিলাস' রচনা করতে পারেন। এর থেকে অবশ্য প্রমাণ হয় যে, গোপাল ভট্ট ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।

দ্বিজ মাধব

পৃঃ ১৯৮, পংক্তি ৭-৯ :—

এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের একটি পুরোণো পুঁথিতে (নং A 40) এই কটি ছত্র পাওয়া যায়,

পরাশর নামে দ্বিজ কুলে অবতার
নানা গুণে পরিপূর্ণ তাহার কুমার॥
মাধব তাহার নাম বিদিত সংসারে।
শ্রীকবিবল্লভাচার্য্য করি খ্যাতি তারে॥

গোবিন্দদাস

(কালিকামঙ্গল-রচয়িতা)

এই প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদ স্বরূপে নিম্নলিখিত অংশটি পঠনীয়।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন "এইদেশ বিশেষভাবে কালীমাতার অধিকারভুক্ত" বলেছেন। কিন্তু কালীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্যগুলি সময়ের দিক দিয়ে ততটা প্রাচীন নয়।

দৌলত কাজী ও আলাওল

পৃঃ ২৩০, পংক্তি ২০-২১ :—

তোহ্ফার রচনাসমাপ্তিকালবাচক শ্লোকটি উদ্ধৃত করছি;

পুস্তক সমাপ্ত সর্ব্ব সন মুছলমানি।
রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমানি॥
পক্ষ সাবানের চতুর্দ্দশ দিন সোমবার।
সমুখে বরাত নিশি শুভযোগ সার॥
তরুণ অরুণ সমে বেলা দুই যাম।
তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম॥
মগদের সন সর্ব্ব বুঝহ নির্ণএ।
রিতু জোগ অভ্র এক বসন্ত সময়॥

(আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৫১-৫২)

এই শ্লোকের শেষ দুই ছত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে "রিতু জোগ অভ্র এক" বা ১০২৬ মঘী সনে 'তোহ্ফা'র রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। প্রথম দুই ছত্রে মুসলমানী সন অর্থাৎ হিজিরা জানানো হয়েছে, কিন্তু লিপিকর প্রমাদের জন্যে এর অর্থোদ্ধার করা যাচ্ছে না। যাহোক্ এতে রচনা সমাপ্তির তারিখ পাওয়া যাচ্ছে "পক্ষ সাবানের চতুর্দ্দশ দিন সোমবার।" ১০২৬ মঘী সন=১০৭৫ হিজিরা। ১০৭৫ হিজিরার ১৪ই সাবান তারিখ সোমবারেই পড়েছিল এবং ঐদিন ইংরেজী তারিখ ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং তোহ্ফা গ্রন্থের সমাপ্তির শুধু বছর নয়, তারিখটিও আমরা সুনিশ্চিত ভাবে জানতে পারছি।

পৃঃ ২৩৩, পংক্তি ৬-৭ :—

এই দুই পংক্তিতে '১৬৬২'র জায়গায় '১৬৬৫' হবে। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আলাওল 'সতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করেন এবং ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'তোহ্ফা' রচনা সমাপ্ত করেন। এই দুই বইই তিনি আরাকানরাজের মহাপাত্র সোলেমানের আজ্ঞায় রচনা করেন। তোহ্ফাতে আলাওল সোলেমান সম্বন্ধে বলেছেন;

হইলে মহৎ আজ্ঞা না আইসে কার শঙ্কা অন্নদাতা সমান পিতার।
তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি হৃদয় সাহস ধরি রচিতে করিনু অঙ্গীকার॥

অতএব অন্ততঃ ১৬৫৯ খৃঃ থেকে ১৬৬৫ খৃঃ পর্যন্ত যে সোলেমান আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং 'হপ্তপয়করে'র রচনা ১৬৬৫ খৃঃর আগে আরম্ভ হয়নি।

সনাতন চক্রবর্তী ও সনাতন ঘোষাল

পৃঃ ২৩৮, পংক্তি ১-২ :—

শুজার সঙ্গে ঔরংজেবের যুদ্ধ ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে হয়েছিল। দীনেশবাবু ভুল করে ১৬৫৮ খৃঃ অঃ লিখেছেন। সুতরাং সনাতন চক্রবর্তী যদি এই যুদ্ধের উল্লেখ করে গ্রন্থসমাপ্তিকাল জানিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর গ্রন্থ ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়েছিল, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে নয়।

পৃঃ ২৩৯, পংক্তি ১-২০ :—

সনাতন ঘোষালের 'ভাষাভাগবতে'র তৃতীয় স্কন্ধের রচনাসমাপ্তিকাল ১৬১৬ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি অর্থাৎ ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ,

ঋতু চন্দ্র কাল শশী শাক পরিমিতে।
পঙ্কজ নৃপতি বৈসে রুদ্রবাহনেতে॥
শুক্ল পক্ষ তিথিতে দ্বাদশী নিরূপণ।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। কবি প্রথম স্কন্ধের রচনাসমাপ্তিকাল জানাবার সময় "কাল" শব্দ ৩ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এখানে ৬ অর্থে ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়তঃ কবি প্রথমে তৃতীয় স্কন্ধের অনুবাদ শেষ করেন এবং তার সাত মাস পরে স্বল্পায়তন দ্বিতীয় স্কন্ধের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন।

'ভাষাভাগবতে'র পঞ্চম স্কন্ধের রচনাসমাপ্তিকাল ১৬১৮ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি অর্থাৎ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ,

গজ শশী রস চন্দ্র শাক পরিমিতে।
কমলিনীপতি বৈসে বৃশ্চিক রাশেতে॥
কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথি উসনাবাসরে।

বাসুনাথ

পৃঃ ২৪৬, পংক্তি ২৭ :—

১১০৭ হিজরির ২৪ রবিয়ল আয়ল তারিখ ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে পড়েছিল। বিশ্বকোষে ভুলবশতঃ "১৬৯৪ খৃঃ" লেখা হয়েছে। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে যখন কৃষ্ণরাম ঔরংজেবের কাছে সমস্ত

পেয়েছিলেন. তখন তিনি যে ঐ বছরের গোড়ার দিকে বা মাঝামাঝি সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দেই যাদুনাথের ধর্মপুরাণ রচনা সমাপ্ত হয়। এর সঙ্গেও "মদনা ঋতু ক্ষিতিতলে"র কোন বিরোধ হচ্ছে না। অতএব আমরা এখন বলতে পারি যাদুনাথের ধর্মপুরাণের রচনাকাল ১৬৯১-৯৫ খৃষ্টাব্দ।

ভারতচন্দ্র

পৃঃ ২৬৭, পংক্তি ১-২৪ :—

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিবরণীর আরও দুটি ভুল সম্প্রতি আমাদের নজরে পড়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, ভারতচন্দ্র "এই চারু গ্রন্থের (অন্নদামঙ্গলের) পর 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন", কিন্তু 'রসমঞ্জরী' ভারতচন্দ্রের রায় গুণাকর উপাধি প্রাপ্তির আগে (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৮৩৭ দ্রঃ) এবং 'অন্নদামঙ্গল' রায় গুণাকর উপাধি প্রাপ্তির পরে রচিত হয়। তিনি আরও লিখেছেন যে ভারতচন্দ্র "৪০ বৎসর বয়সের সময়ে নবদ্বীপেশ্বরের অধীন হইলেন, এবং সেই বর্ষেই 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিলেন।" একথা সম্পূর্ণ ভুল। ৪০ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নাগাষ্টক রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণী থেকেই দেখা যায় ভারতচন্দ্র "নবদ্বীপেশ্বরের অধীন" হবার অনেক পরে নাগাষ্টক রচনা করেছিলেন। নাগাষ্টক পড়লেও সেকথা বোঝা যায়। গুপ্ত কবির বিবরণী অনুসারে নাগাষ্টক বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের (১৭৪৪-৭০ খৃঃ) রাজত্বকালে লেখা, কিন্তু ভারতচন্দ্র অন্ততঃ ১৭৪২ খৃঃ থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। "শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে" অর্থাৎ ১৬৬৪ শক বা ১৭৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দী করেন। বন্দিশালাতে দেবী অন্নপূর্ণা কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন,

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥

এর থেকে বোঝা যায়, এই ঘটনার আগে থাকতেই ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন এবং এর পরে তিনি মহারাজের কাছে রায় গুণাকর উপাধি পান। অর্থাৎ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের আগে তিনি ঐ উপাধি পাননি। যা হোক্

ভারতচন্দ্র যে "৪০ বৎসর বয়সের" অনেক আগেই "নবদ্বীপেশ্বরের অধীন" হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।, "সেই বর্ষেই 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা" করার কথাও ভুল। অন্নদামঙ্গল ঐ ঘটনার ১০ বছর পরে—১৬৭৪ শকে বা ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং ভারতচন্দ্রের "নবদ্বীপেশ্বরের অধীন" হওয়া ও অন্নদামঙ্গল রচনা করার মধ্যে ১০ বছরেরও বেশী ব্যবধান ছিল।

রামপ্রসাদ সেন

পৃঃ ২৭৩, পংক্তি ১৬-১৯ :—

রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তনে' উল্লিখিত রাজকিশোর যে বিজয়রামের তীর্থমঙ্গলে উল্লিখিত রাজকিশোরের সঙ্গে অভিন্ন, একথা ডঃ সুকুমার সেনের আগে অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থে (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) বলেন (পৃঃ ৩৫৬-৩৫৮)।

পৃঃ ২৭৪, পংক্তি ৬-১১ :—

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রামপ্রসাদ সেনের পুত্র রামদুলাল সেন তাঁর পিতার নামীয় মহাত্রাণ সম্পত্তির যে বিবরণ পেশ করেন, তার থেকে জানা যায় যে ১১৬০ সনের ১৭ই চৈত্র তারিখে অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে হালিসহরের দর্পনারায়ণ রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় রামপ্রসাদকে ৮/০ বিঘা জমি দান করেন (সা. প প., ১৩৫২, পৃঃ ৪)। ঐ সময়ে রামপ্রসাদের বয়স অন্ততঃ ২০ বছর ছিল নিশ্চয়ই। এদিকে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের পরে রামপ্রসাদ 'কবিরঞ্জন' উপাধি পান এবং অন্ততঃ দুটি গ্রন্থ—কালীকীর্তন ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। সুতরাং রামপ্রসাদ সেন অন্ততপক্ষে ১৭৩৪ থেকে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে জীবিত ছিলেন। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য উনবিংশ শতাব্দীর একটি খাতায় রামপ্রসাদের মুহুরিগিরি ত্যাগের তারিখ পেয়েছেন ১১৪৭ সাল বা ১৭৪০-৪১ খৃঃ (সা প. প., ১৩৬৩, পৃঃ ৬)।

পৃঃ ২৭৫, পংক্তি ২-৪ :—

৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য চিনিশপুরের রামপ্রসাদকে রামপ্রসাদ সেনের সমসাময়িক ও সমশ্রেণীভুক্ত সাধক-কবি বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চিনিশপুরের রামপ্রসাদের পরিচয় সম্বন্ধে কয়েকটি আধুনিক কিংবদন্তীর বেশী তিনি কিছু সংগ্রহ করতে পারেননি। রামপ্রসাদ সেনের

মত চিনিশপুরের রামপ্রসাদেরও কন্যার নাম ছিল 'জগদীশ্বরী' এবং রামপ্রসাদ সেনেরই রীতিতে তাঁর মত 'প্রসাদ বলে' প্রভৃতি ভণিতা দিয়ে তিনি একই সময়ে পদ রচনা করেছিলেন—ইত্যাদি কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। দীনেশবাবু বিক্রমপুরের সাধনসঙ্গীত রচয়িতা রাজমোহন আম্বলী তর্কালঙ্কারের "রামপ্রসাদের রা পেয়েছি রাজমোহন কয় ঐ জোড়ে ভাই" ইত্যাদি উক্তি চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলে মনে করেন, কারণ "রাজমোহন কস্মিন্‌কালেও হালিশহরে আসেন নাই এবং কবিরঞ্জনের 'রা' পাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল।" কিন্তু আমাদের মনে হয় "রামপ্রসাদের 'রা' পেয়েছি" অর্থে রাজমোহন বলেছেন যে দৈবক্রমে তিনি তাঁর নামের যে আদ্যাক্ষর (রা) পেয়েছেন, তা রামপ্রসাদের নামের আদ্যাক্ষরের সঙ্গে অভিন্ন। এই রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সঙ্গে অভিন্ন হতে কোনই বাধা নেই। দীনেশবাবু ১৮২৫ শকে (১৯০৩-০৪ খৃঃ) রচিত "আদিবৃত্ত" গ্রন্থে প্রদত্ত সিদ্ধপুরুষদের নামমালায় যে "রামপ্রসাদ ঠাকুরের" উল্লেখ পেয়েছেন (সা. প. প., ১৩৫২, পৃঃ ১১), তাঁকে রামপ্রসাদ সেন না ধরে চিনিশপুরের রামপ্রসাদ কেন ধরলেন, তাও বুঝতে পারলাম না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রামপ্রসাদ সেনের সাধক-খ্যাতি সারা বাংলাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল, পক্ষান্তরে চিনিশপুরের রামপ্রসাদের স্মৃতি ঐ সময়ে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মোটের উপর চিনিশপুরের রামপ্রসাদের পরিচয় নিতান্তই অস্পষ্ট এবং রামপ্রসাদ সেনের সমগোত্রীয় কবি হওয়া দূরের কথা, তিনি যে শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তারও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

॥ গ ॥

কয়েকটি অধ্যায়ের সম্পূরণ

জয়দেব

জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সে সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' লক্ষ্মণসেনের একটি ও তাঁর পুত্র কেশবসেনের একটি শ্লোক সংকলিত আছে (রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে দুটি শ্লোকই লক্ষ্মণসেনের নামে পাওয়া যায়)। এই শ্লোক দুটির ভাষা ও ভাব গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের অনুরূপ। এই তিনটি শ্লোকের শেষ চরণ প্রায় অভিন্ন। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের শেষ চরণ—"রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।" লক্ষ্মণসেন-রচিত শ্লোকের শেষ চরণ—"রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি বলিত স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ" আর কেশবসেন-রচিত শ্লোকের শেষ চরণ—"রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি মধুর স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ"।

কেশবসেনের শ্লোকটি যেন গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের প্রত্যুত্তরেই রচিত। 'গীতগোবিন্দে'র শ্লোকে দেখি নন্দ রাধাকে বলছেন রাত্রিতে কৃষ্ণকে গৃহে পৌঁছে দিতে আর কেশবসেনের শ্লোকে দেখি যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন রাধাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "হয়তো জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া অথবা শুনিয়া প্রীত হইয়া রাজা ও রাজকুমার উভয়েই এই ভাবের কবিতা রচনা করিয়া কবিকে সম্মানিত করিয়া থাকিবেন।" মোটের উপর, তিনটি শ্লোকের এই সাদৃশ্য থেকে জয়দেবের সঙ্গে রাজা ও যুবরাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূচিত হয়। এছাড়া শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত জয়দেবের পদের সঙ্গে লক্ষ্মণ-সেনের সান্ধিবিগ্রহিক উমাপতিধরের পদের ঐক্য দেখিয়েছেন। জয়দেবের গোবর্ধনোদ্ধারঃ ১।৬০।৫ শ্লোকের অন্তিম চরণ "রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ" আর উমাপতিধরের হরিক্রীড়াঃ ১।৫৫।৩ শ্লোকের শেষ চরণ —"সাতঙ্কাম্বুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ।"

কোন কোন উড়িয়া পণ্ডিত জয়দেবকে উড়িষ্যাবাসী প্রমাণ করবার জন্য লিখেছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে বাংলাদেশে 'গীতগোবিন্দে'র

কোন প্রচার ছিল না। একথা মোটেই সত্য নয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে বাংলাদেশে 'গীতগোবিন্দে'র অন্ততঃ তিনটি টীকা রচিত হয়েছিল। প্রথম টীকাটির রচয়িতা বৃহস্পতি মিশ্র। সুলতান জালালুদ্দীন মহম্মদ সাহের (১৪১৫-১৪৩১ খৃঃ) সেনাপতি রায় রাজ্যধর তাঁর শিষ্য ও প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষক। টীকাটি বৃহস্পতি মিশ্রের গোড়ার দিককার রচনা, সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে এটি রচিত হয়েছিল বলা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টীকাটি যথাক্রমে ধৃতিদাস বৈদ্য ও নারায়ণদাস রচনা করেছিলেন। নারায়ণদাসের আবির্ভাবকালের নিম্নতম সীমা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ, কারণ মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিত রমানাথ শর্মা ১৪৫৮ শকাব্দ বা ১৫৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁর "মনোরমা" গ্রন্থে নারায়ণ দাসের গীতগোবিন্দ-টীকার উল্লেখ করেছেন। নারায়ণদাসের টীকায় আবার ধৃতিদাস বৈদ্যের টীকা থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত হয়েছে। অতএব ধৃতিদাস বৈদ্যের আবির্ভাবকালের নিম্নতম সীমা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। সুতরাং পূর্বোক্ত উড়িয়া পণ্ডিতদের ঐ উক্তির কোন ভিত্তি নেই।

কৃত্তিবাস

৯৪ পৃষ্ঠার তৃতীয় ছত্রে বিশ্বভারতীর যে পুঁথিটির উল্লেখ করেছি, সেটি বিশ্বভারতীর ৯১৮ নং পুঁথি। তাতে কৃত্তিবাসের বড় গঙ্গা পার হয়ে পড়তে যাওয়ার কথা এইভাবে লেখা আছে,

ছোট বারিন্দ্র বড় বারিন্দ্র বড় গঙ্গা পার।
তথা গিয়া কৈল ওঝা বিদ্যার সঞ্চার॥

এর সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির "ছোটর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গা পার। যথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার॥" এবং সাহিত্য পরিষদের পুঁথির "ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার। যথা তথা কর্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার॥" এর প্রায় হুবহু মিল আছে। এই তিনটি পাঠই মূলে এক ছিল এবং এদের উৎস আত্মকাহিনীর এই দুই ছত্র,

বারান্তর উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গা পার॥
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার।

আত্মকাহিনীতে 'ফুলিয়া' গ্রামের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখা আছে,

মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চেতে থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥

'ফুলিয়া'র পাশেই 'মালঞ্চা' নামে একটি গ্রাম আছে। এটিও আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতার অন্যতম প্রমাণ।

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয় এইখানে সংক্ষেপে উল্লেখ ও আলোচনা করা যেতে পারে।

আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস লিখেছেন যে তাঁর পিতামহ মুরারির সাতটি ছেলে ছিল। কিন্তু আত্মকাহিনীর বর্তমান-প্রচলিত সংস্করণে মুরারির পুত্রদের নাম-নির্দেশ লিপিকরপ্রমাদের জন্য অস্পষ্ট হয়ে গেছে। হারাধন দত্তের পুঁথিতে মাত্র দুটি নাম পাই—ভৈরব ও বনমালী। ডঃ ভট্টশালীর পুঁথিতে নামের তালিকা এইরকম,

জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ঠাকুরাল ধর্ম্মচরিত্র গুণে মহাগুণী ॥
মদন আলাপে ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস আছেন শাস্ত্রে অবগতি ॥
সুস্থির ভাগ্যবান তথি বনমালী ॥

এখানে চারটি নাম পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়—ভৈরব, মার্কণ্ড, ব্যাস ও বনমালী। কুলগ্রন্থের সাহায্য নিলে বাকী তিনটি নামও উদ্ধার করা যায়। একটি কুলগ্রন্থে (সা. প. প, ১৩৪৮, পৃঃ ১১৫ দ্রঃ) লেখা আছে মুরারির সাতটি পুত্র—"ভৈরবশৌরি বনমালি অনিরুদ্ধ মদন মার্কণ্ডব্যাসকাঃ"। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে এই সাতটি নামের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত নাম আছে—'নিবাস'। এখানে ধ্রুবানন্দ ভুলবশতঃ একটি নাম যোগ করেছেন। যাহোক্, মুরারির অবশিষ্ট তিন পুত্রের নাম শৌরি, মদন ও অনিরুদ্ধ ছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আত্মকাহিনীতে এঁদের নাম লিপিকরপ্রমাদে বিকৃত হয়ে গেছে। উপরে উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় ছত্রে 'মুরারি'র উল্লেখ প্রামাদিক। মুরারির পুত্রদের নামের তালিকার মধ্যে মুরারির নাম আসবে কেন? সুতরাং যতদূর মনে হয়, এখানে 'মুরারি'র জায়গায় 'শৌরি' মূল পাঠ ছিল। তারপর

"মদন আলাপে ওঝা সুন্দর মুরতি" অর্থহীন, এখানে সম্ভবতঃ মূল পাঠ ছিল "মদন আনায়ি ওঝা সুন্দর মুরতি।" মুরারির ছেলে অনিরুদ্ধ যে "আনায়ি" নামেও পরিচিত ছিলেন, তা ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী থেকে জানা যায়। সেখানে অনিরুদ্ধের ছেলে লক্ষীধরকে বলা হয়েছে "ফুং মুং আনায়িজ লক্ষীধর" (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃঃ ৯০)। অনিরুদ্ধের বংশধররা এখনও ফুলিয়া গ্রামে বাস করেন।

কৃত্তিবাসের ভায়েদের নামের যে তালিকা আত্মকাহিনীতে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে অন্যান্য সূত্রে প্রদত্ত তালিকার পুরোপুরি মিল নেই। আত্মকাহিনীতে লেখা আছে,

সংসার আনন্দ লয়্যা আইল কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় বড়রাত্রি উপবাস ॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর (পাঠান্তর শ্রীকর) ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিনী হইল সতাই উদর ॥

সাহিত্যপরিষদের আদিকাণ্ডের পুঁথিতে লেখা আছে,

বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর ॥

ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীর মতে কৃত্তিবাসেরা সাত ভাই—কৃত্তিবাস, শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বল, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ। আর একটি কুলগ্রন্থে নামের সংখ্যা অনেক বেশী—"মাধব শান্তি বলভদ্র মৃত্যুঞ্জয় জগো ভাসো কৃত্তিবাসপণ্ডিত শ্রীনাথ শ্রীকান্তাঃ" (সা. প. প., ১৩৪৮, পৃঃ ১১৬)।

আত্মকাহিনীর মতে কৃত্তিবাসের এক ভায়ের নাম শান্তিমাধব, কিন্তু কুলগ্রন্থের মতে শান্তি ও মাধব দুজন পৃথক লোক। তেমনি আত্মকাহিনীর মতে চতুর্ভুজেরই নামান্তর ভাস্কর, কিন্তু সাহিত্যপরিষদের আদিকাণ্ডের পুঁথির মতে চতুর্ভুজ ও ভাস্কর দুজন পৃথক লোক। চতুর্ভুজ ও ভাস্কর যে একই লোক, সে সম্বন্ধে আত্মকাহিনীর উক্তি ছাড়াও অন্য প্রমাণ আছে। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে চতুর্ভুজের নাম আছে, কিন্তু ভাস্করের নাম নেই। এদিকে উপরে উল্লিখিত অপর কুলগ্রন্থটিতে ভাস্করের সংক্ষিপ্ত রূপ 'ভাসো' আছে, কিন্তু চতুর্ভুজের নাম নেই। সুতরাং প্রামাণিকতম সূত্র আত্মকাহিনী থেকে আমরা স্থির করতে

পারি কৃত্তিবাসেরা ছয় ভাই—কৃত্তিবাস, মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর বা শ্রীকর ('মহাবংশাবলী'তে 'শ্রীকণ্ঠ'), বলভদ্র ('মহাবংশাবলী'তে 'বল') এবং চতুর্ভুজ (নামান্তর 'ভাস্কর')।

৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেছিলেন, আত্মকাহিনীর উপরে উদ্ধৃত অংশে কৃত্তিবাস 'সহোদর' ও 'ভাই' শব্দ পৃথক অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং 'ভাই' অর্থে বৈমাত্রেয় ভাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু এর একটু বাদেই কৃত্তিবাস বলেছেন "ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী"। এর থেকে বোঝা যায় তিনি একই অর্থে 'সহোদর' ও 'ভাই' শব্দের ব্যবহার করেছেন।

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র কৃত্তিবাসের বংশের লোক। ভারতচন্দ্র নিজে 'মানসিংহ' কাব্যে তাঁর বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বলেছেন, "ফুলের মুখটি নৃসিংহের অংশ তায়"। এই ফুলের (ফুলিয়ার) নৃসিংহ মুখটি কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ নারসিংহ ওঝা। কুলগ্রন্থে দেখা যায়, ভারতচন্দ্র কৃত্তিবাসের পিতৃব্য মদনের বংশধর।

কৃত্তিবাস তাঁর আত্মকাহিনীতে জন্মের তিথিটি উল্লেখ করেছেন— "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস", কিন্তু জন্মের সালটি বলেন নি। আবার তিনি গৌড়েশ্বরের সভাসদ্‌দের নাম বলেছেন; কিন্তু গৌড়েশ্বরের নামটি কি, তা জানান নি। এতে অনেক গবেষক বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। বাংলার কোন প্রাচীন কবিই আত্মকাহিনীতে নিজের জন্মের সাল জানান নি, সে রেওয়াজ তখন ছিল না। জন্মতিথিটি পুণ্যতিথি বলে প্রসঙ্গক্রমে কৃত্তিবাস তার উল্লেখ করেছেন। আর গৌড়েশ্বরের নাম না জানানো সম্বন্ধে বলা যায়, সমসাময়িক রাজাদের উল্লেখের সময় লোকে সাধারণতঃ তাঁদের নাম বলে না। আমরা আজও পর্যন্ত 'বর্ধমানের মহারাজা', 'কুচবিহারের মহারাজা' প্রভৃতির উল্লেখের সময় তাঁদের নিজস্ব নাম উল্লেখ করি না। মালাধর বসু প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবি গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গৌড়েশ্বরের নাম বলেননি। অতএব এজন্যে কৃত্তিবাসের উপর দোষারোপ করে কোন লাভ নেই।

কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের পরিচয় সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অনেকে অনেক মত ব্যক্ত করেছেন। একদল বলেছেন ইনি সত্যিকারের কোন গৌড়েশ্বর নন, ইনি তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। কিন্তু কৃত্তিবাস সাধারণ একজন জমিদারকে তোষামোদ করে গৌড়েশ্বর বলতে পারেন বলে বিনা প্রমাণে

সিদ্ধান্ত করা যায় না। তাছাড়া সময়ের দিক্ দিয়েও বাধা আছে। কংস-নারায়ণের পুত্র (মতান্তরে পৌত্র) ইন্দ্রজিৎনারায়ণ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে সাহায্য করেছিলেন, এটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায়। সুতরাং কংসনারায়ণ ষোড়শ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কৃত্তিবাস যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন, তা আমরা এই বইএর ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখে এসেছি।

ঐ মতের স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, কুলগ্রন্থে কংসনারায়ণের মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে তিনজন আত্মীয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় আর কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের ওই তিন নামের তিন জন সভাসদের উল্লেখ করেছেন। কুলগ্রন্থের মতে কংসনারায়ণের ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পিতার নাম মুকুন্দ, পুত্রের নাম জগদানন্দ এবং পৌত্রীর স্বামীর নাম নারায়ণ। মুকুন্দ ও নারায়ণের মধ্যে চার পুরুষের তফাৎ, সুতরাং তাঁদের পক্ষে এক সভায় বসা প্রায় অসম্ভব। এখানে মুকুন্দ জগদানন্দের পিতামহ। কিন্তু কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের সভাসদ্ মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র ("মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর। জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥") সুতরাং এই মত একেবারেই অচল।

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী ও আবির্ভাবকাল নিয়ে আজ পর্যন্ত অজস্র আলোচনা হয়েছে। এই সমস্ত আলোচনার ফলে কোন কোন সময় কিছু কিছু কৌতুককর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্র এই,

দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥

(হারাধন দত্তের পুঁথি)

দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগ (রঙ্গভোগ ?) ভুঞ্জিলেক সংসারের সার॥

(ডঃ ভট্টশালীর পুঁথি)

দীনেশচন্দ্র সেন যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী প্রথম প্রকাশ করেন, তখন এই দুটি ছত্র যথাযথভাবে আত্ম-কাহিনীর তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্র রূপেই ছিল। কিন্তু ঐ বইএর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ছাপার গোলমালে ছত্র দুটি অনেক পরে গিয়ে পড়ে—নারসিংহের ফুলিয়ায় আগমন, গর্ভেশ্বরের জন্ম, মুরারির প্রসঙ্গ, তাঁর পুত্রদের

কথা, কনিষ্ঠপুত্র বনমালীর কথা—"প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি" —তারও পরে। কিন্তু এই ভুল কেউই ধরতে পারলেন না। বরং এই বিশেষস্থানে এই দুটি ছত্রের কি মানে হবে, গবেষকরা তারই ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। স্টেপলটন বললেন, "Presumably বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার means on the eastern (Bengal) bank of the river Hughli."

তারপর, দীনেশ চন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র তৃতীয় সংস্করণে (১৯০৮) লেখেন, "১৪৪০ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ফুলিয়া গ্রামে, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার তিনি (কৃত্তিবাস) জন্মগ্রহণ করেন।" এর কয়েক বছর পরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের একটি স্মৃতিফলক বসানো হয়—তাতে লিখে দেওয়া হয়—"আবির্ভাব—১৪৪০ খৃষ্টাব্দ, মাঘমাস, শ্রীপঞ্চমী, রবিবার।" ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমী তিথি যে রবিবারে পড়েনি, তাও স্মৃতিফলকের প্রতিষ্ঠাতারা জানতেন না। যা হোক্, এর পরে দীনেশচন্দ্র কৃত্তিবাসের জন্মতারিখ সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করেছেন, অন্যান্য গবেষকরাও এ সম্বন্ধে নানা মত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু স্মৃতিফলকের তারিখ আজ পর্য্যন্ত অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে।

একদিকে যেমন ফুলিয়া গ্রামে এই জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ বসানো হয়েছে, অপরদিকে তেম্‌নি দেশবাসীর মধ্যে ফুলিয়ার ঐতিহ্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দিন দিন বাড়ছে। ১৯৫১ সালের লোকগণনার পরে সরকারী ব্যয়ে নদীয়া জেলার যে District Hand-book প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ফুলিয়ার উদ্বাস্তু উপনিবেশের কথা লেখা হয়েছে, কিন্তু ফুলিয়ায় যে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও সাধক হরিদাস বাস করেছিলেন, সে কথার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নেই।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সংক্রান্ত আলোচনায় এ পর্যন্ত অনেক "প্রমাণ" দেখানো হয়েছে। কিন্তু এইসব "প্রমাণ"-এর প্রামাণিকতা অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহের বিষয়। যেমন, ৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রচার করেছিলেন যে ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৫-৮৬ খৃঃ) ধ্রুবানন্দ 'মহাবংশাবলী' রচনা করেছিলেন এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০-৮১ খৃঃ) দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করেছিলেন। এই দুই তারিখের উপর নির্ভর করে অনেকে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই দুই তারিখ যে ঠিক, তাই যখন এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি, তখন এদের উপর নির্ভর করার কোন অর্থ হয় না।

চণ্ডীদাস

এই বইএর ৬৭ এবং ৭৫ পৃষ্ঠায় আমরা বলেছি "আগো রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা" পদটি চৈতন্যপূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা নয়। কারণ পদটির প্রথমাংশ উজ্জ্বলনীলমণির "আহারে বিরতিঃ সমস্ত বিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা" শ্লোকের (পৃঃ ৬৭ দ্রষ্টব্য) "ভাবানুবাদ বলে মনে হয়"। কিন্তু ঐ শ্লোকটি উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হলেও এটি তার বহুশত বছর আগেই রচিত হয়েছিল। বহু পদসঙ্কলনগ্রন্থে এটি রাজশেখরের রচনা বলে উল্লিখিত ও সঙ্কলিত হয়েছে। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'ও (সঙ্কলনকালের নিম্নতম সীমা ১২০০ খৃঃ) পদটি সঙ্কলিত আছে। সুতরাং "আগো রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা" পদের প্রথমাংশ যদি এই শ্লোকের ভাবানুবাদ হয়ও, তার থেকে তার চৈতন্য-পরবর্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।। অতএব পদটি যে বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা নয়, তা জোর করে বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দ

নিত্যানন্দের বিবাহ সম্বন্ধে জনৈক বৈষ্ণব পণ্ডিত আমাকে বলেছেন, নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত। একশ্রেণীর অবধূত সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনের প্রথম ৪৮ বছর সন্ন্যাস ধর্ম পালন করে তারপর বিবাহাদি করার বিধি আছে। নিত্যানন্দ হয়তো এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন; সুতরাং তিনি বিবাহ করে কোন অসঙ্গত বা অপ্রত্যাশিত কাজ করেন নি। কিন্তু জয়ানন্দ নিত্যানন্দের বিবাহ প্রসঙ্গে নিত্যানন্দকে "স্বচ্ছন্দ কৌতুকী" বলেছেন। সুতরাং এ ব্যাপার যে খাপছাড়া, সেই ধারণাই হয়। এ বিষয়ে বৃন্দাবন দাসের নীরবতা এই ধারণাকেই দৃঢ় করে।

চূড়ামণিদাস

এই বইএর 'কুড়ি' সংখ্যক অধ্যায় ছাপা হবার সময়ে চূড়ামণিদাসের লেখা চৈতন্যচরিতগ্রন্থ অপ্রকাশিত ছিল (পৃঃ ১৮৪ দ্রষ্টব্য), কিন্তু তার পরে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ডক্টর সুকুমার সেনের সম্পাদনায় চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' প্রকাশিত হয়েছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয় দ্রষ্টব্য)। আত্মকাহিনীতে ক্ষেমানন্দ বলেছেন তাঁর নিবাস ছিল

কাঁথড়া গ্রামে, সে স্থান ত্যাগ করে তিনি জগন্নাথপুরে গিয়ে বসতি করেন, রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্ল বা ভরামল (বিশ্বভারতীর একটি পুঁথিতে লেখা আছে "রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাহারে ভেটিতে যাই নাম তার রায় ভরামল") তাঁকে তিনখানি গ্রাম দান করেন। পঞ্চানন বাবু দেখিয়েছেন "আধুনিক হুগলী জেলার তারকেশ্বর থানায় দামোদরের পূর্বতীরে এখনও 'কেতেরা' 'জগন্নাথপুর' 'ভরামলপুর', গ্রাম বিদ্যমান।" সুতরাং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ যে এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।. এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে ডঃ সুকুমার সেন প্রকাশিত ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীর (বা. সা. ই., ১।২, পৃঃ ৪৭৭-৪৮১) পাঠের অনেক ভুল ধরা পড়েছে, যেমন ক্ষেমানন্দের বাড়ী 'সোমনগরে' ছিল না এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নাম 'রামতারণ মণ্ডল' নয়। রাজা বিষ্ণুদাস ও তাঁর ভাই ভরামল তারকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে Bengal District Gazetteer-এ লেখা আছে। সেখানে কোন রকম প্রমাণ না দেখিয়ে তাঁদের অযোধ্যা অঞ্চলের অধিবাসী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক বলা হয়েছে। সহদেবের 'তারকেশ্বর-বন্দনা'য় ভারামল্লের তারকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ণনা আছে। এঁরা আদি মন্দির তৈরী করেছিলেন। বর্তমান মন্দির বর্ধমানের মহারাজার তৈরী।

ক্ষেমানন্দের দেশত্যাগের সময় তাঁদের অঞ্চলের তালুকদার ছিলেন আস্কর্ণ রায়। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল বলেন, ইনি "সাহ সুজার সময়ের বালিগড়ি পরগণার পাঠান পকেটের অবাঙ্গালী তালুকদার।" এই কথা সত্য হলে ক্ষেমানন্দের জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই স্থির হয়, কারণ শাহ শুজা ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ অবধি বাংলার সুবেদার ছিলেন।

॥ ঘ ॥

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের দুজন প্রাচীনতম কবির কাল-নির্ণয়

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খান রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের খণ্ডিত পুঁথি ও কবিদের পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে। তা থেকে এই দুই কবির আবির্ভাবকালও মোটামুটিভাবে জানা যাচ্ছে। দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ সুলতান নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২ খৃঃ) তাঁর পুত্র যুবরাজ ফিরোজ শাহের আজ্ঞায় কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের কয়েক জায়গায় ফিরোজ শাহকে "রাজা" বলা হয়েছে, কিন্তু তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে "ফিরোজ শাহ পিতার রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২ খৃঃ) দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকে দিয়ে কালিকামঙ্গল রচনা শুরু করিয়েছিলেন এবং তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পর কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়।" কারণ শ্রীধরের কাব্যে অধিকাংশ জায়গায়ই ফিরোজকে "যুবরাজ" বলা হয়েছে, এক জায়গায় "রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিদিত সুজান" বলে অব্যবহিত পরেই "ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ" বলা হয়েছে। "রাজা" উপাধির প্রয়োগ করা হয়েছে শুধু স্তুতি করার উদ্দেশ্যে। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছিলেন শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর "কালিকামঙ্গলের ফেমে আঁটা হয় নাই।" এ অনুমান ঠিক নয়। শ্রীধর লিখেছেন সুন্দরের পিতামাতা কালিকার উপাসনা করে সুন্দরকে পেয়েছিলেন। শ্রীধর এক জায়গায় 'কালিকা'কে "কালিকা গোসাঞি" বলেছেন—"প্রত্যক্ষ হইআ বোলে কালিকা গোসাঞি"।

সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরের ভাষার প্রাচীনতা থেকে তাঁকে ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলে মনে হয়। এক সাবিরিদ খানের লেখা চট্টগ্রামের কুলীন বংশাবলীর একটি 'পদবন্ধ' পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন পরোক্ষ প্রমাণ থেকে মনে হয় এই সাবিরিদ খানই বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা। জনাব আহম্মদ সরীফ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে "১৫১৭ খৃষ্টাব্দের পরে এবং ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনও সময়ে এই ছড়া রচিত হয়েছিল" ও "১৪৮০ থেকে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের

মধ্যেই সাবিরিদ খান বর্তমান ছিলেন।" (সাহিত্য পত্রিকা, পৃঃ ৮৪-৯১) মোটামুটিভাবে, সাবিরিদ খান যে ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। সাবিরিদ খানের লেখা 'রসুলবিজয়' এবং 'মোহাম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী' (আব্দুল করিম প্রদত্ত নাম) কাব্যেরও খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে।

॥ ৬ ॥

কয়েকজন কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেনের মতের বিচার

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় ডক্টর সুকুমার সেনের দান পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অসামান্য। এক সময়ে বাঙ্গালী মনীষীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন ও অনুসন্ধানের প্রেরণা জেগেছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, যোগেশচন্দ্র রায়, বসন্তরঞ্জন রায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন প্রভৃতি গবেষকেরা অক্লান্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বহু লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করে তার হারানো ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিকে পুনর্গঠিত করেছেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই এখন গত হয়েছেন; যে ক'জন জীবিত আছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই লেখনী অবসর গ্রহণ করেছে। কেবল ডক্টর সুকুমার সেন এখনও অশ্রান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। তাঁর আন্তরিকতা ও অধ্যবসায় প্রশস্তি লাভের যোগ্য। তিনি মূলতঃ ভাষাতত্ত্ববিদ্ হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অনুপ্রেরিত করেছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য—দুয়েরই গবেষণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় তিনি নতুন বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু দান করতে পারেননি। তাঁর প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত বইগুলিই—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), A History of Brajabuli Literature, বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী, ইস্লামি বাংলা সাহিত্য, বিচিত্র সাহিত্য প্রভৃতি—তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং এইগুলিই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।

এই বইগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠ। বইখানিতে বাংলা সাহিত্যের প্রাক্-ইতিহাস থেকে সুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে যেমন বিখ্যাত কবিদের কাব্যের পরিচিতি এবং তাঁদের

সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, তেমনি অসংখ্য অল্পখ্যাত বা অখ্যাত কবি ও কাব্যের বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে। এর ভিতরে উল্লিখিত অধিকাংশ রচনাই এখনও ছাপা হয়নি, পুঁথিতে আবদ্ধ রয়েছে। এ বইখানিকে কালানুক্রমে সজ্জিত একটি অতিকায় পুঁথি-বিবরণী বলা যায় এবং এদিক দিয়ে এর মূল্য অনস্বীকার্য। আদর্শ এবং পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে শুধুমাত্র বিভিন্ন যুগের রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে না, সেই সঙ্গে থাকে সাহিত্যের রসগ্রাহী আলোচনা; তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ যুগের সাহিত্যের গঠনে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রভাব সূক্ষ্মভাবে নিরূপিত হয়; তার ভাষা ও পরিবেশনকৌশলেও পারিপাট্য থাকা চাই, সাহিত্যের ইতিহাস নীরস তালিকা মাত্র হলে চলবে না, তাকে সাহিত্যপদবাচ্যও হতে হবে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের আদর্শ ও সার্থক ইতিহাস এখনও পর্যন্ত লেখা হয়নি।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' কবিদের আবির্ভাবকাল ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা আশানুরূপ নয়। তার মধ্যে স্থানে স্থানে সুসংবদ্ধ চিন্তা এবং সুষ্ঠু প্রমাণ-প্রয়োগের অভাব দেখা যায়, তার ফলে সিদ্ধান্তগুলি অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট বা সন্তোষজনক হতে পারেনি। লেখকের ব্যস্ততাই এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়। এই বই পড়লে মনে হয়, ডঃ সুকুমার সেন অন্য গবেষকদের গবেষণা সম্বন্ধে ততটা শ্রদ্ধা পোষণ করেন না এবং সেগুলি মন দিয়ে পড়েন না। এরকম দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে অন্য গবেষক ডঃ সেনের কোন ভুল দেখিয়ে দেবার পরেও ডঃ সেন সেটি সংশোধন করেন নি। যেমন ডঃ সেন হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গলকে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত একখানি প্রামাণিক অদ্বৈতচরিতগ্রন্থ বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বইখানিকে জাল এবং পরবর্তীকালে রচিত বলে প্রমাণ করেছেন (শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃঃ ৪৬৮-৪৭৩)। তা সত্ত্বেও ডঃ সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত পূর্বমতের কোন পরিবর্তন করেন নি। তিনি ডঃ মজুমদারের যুক্তি ও প্রমাণগুলির কোন বিচারই করেন নি। অপরের গবেষণার প্রতি ডঃ সেনের এই ঔদাসীন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নিজের গবেষণার অপূর্ণতার কারণ হয়েছে।

২১

এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর বই ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য। ফলে ছাত্রছাত্রীরা (এবং অনেক অধ্যাপকও) তাঁর মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। সুতরাং তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্তে কোন ত্রুটি থাকলে স্পষ্টভাবে তা দেখিয়ে দেওয়া কর্তব্য। এই কর্তব্যের অনুরোধেই আমরা আপাততঃ কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, চূড়ামণিদাস, জয়ানন্দ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, আলাওল ও রামপ্রসাদ সেনের সময় সম্বন্ধে ডঃ সেনের আলোচনার বিচার করছি।

প্রথমে কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের ৮৫-১০৬ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার অধিকাংশই কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে। আলোচনার সুরুতে ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে হারাধন দত্তের যে পুঁথিটি থেকে দীনেশচন্দ্র সেন প্রথমে আত্মকাহিনীটি পেয়েছিলেন এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে পুঁথিটি সংগ্রহ করেছিলেন, তা দুটি বিভিন্ন পুঁথি। এই মত অনস্বীকার্য। কিন্তু ডক্টর সেনের আলোচনার অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে আমাদের কিছু আপত্তি আছে। সেই অংশগুলি এক এক করে উপস্থাপিত করে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করছি।

(১) ডঃ সেন লিখেছেন, "কৃত্তিবাসের জীবৎকাল একটি সুবৃহৎ অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। এই অনুমান হইতেছে যে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে যে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ আছে তিনি হিন্দু সুলতান রাজা গণেশ (কংস)।"

সুতরাং ডঃ সেন নিজে অনুমানকে সম্পূর্ণ বর্জন করে অকাট্য তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে কৃত্তিবাসের জীবৎকাল নির্ধারণ করবেন, এই আশাই আমরা করতে পারি। কিন্তু কৃত্তিবাসের জীবৎকাল সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের সিদ্ধান্তও একটি "সুবৃহৎ অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে।" অনুমানটি এই, "কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারসিংহ ওঝা যে 'বেদানুজ মহারাজা'র পাত্র ছিলেন তিনি দনুজমর্দ্দন ছাড়া আর কেহ নহেন।"

(প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বলা দরকার। এই বইএর ৬৭ পৃষ্ঠায় ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষে যখন রাজা কংস (অর্থাৎ রাজা গণেশ) গৌড় সিংহাসন অধিকার করিলেন" ইত্যাদি। কিন্তু রাজা গণেশ পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে নয়।)

(২) এর অব্যবহিত পরেই ডঃ সেন লিখেছেন, "এই অনুমানের পিছনে আরো একটি অনুমান আছে। তাহা হইতেছে আত্মকাহিনীর সর্ব্বাংশে অকৃত্রিমত্ব স্বীকার।"

আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যে সমস্ত অকাট্য প্রমাণ আছে (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৯২-৯৭ দ্রষ্টব্য), সেগুলি ডঃ সেন খুঁটিয়ে দেখেন নি। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি "আত্মকাহিনীর সর্ব্বাংশে অকৃত্রিমত্বে সন্দিহান" থাকলেও কৃত্তিবাসের জীবৎকাল সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি একান্তভাবে আত্মকাহিনীর উপরেই নির্ভর করেছেন (পৃঃ ৯৭-৯৮)। "কৃত্তিবাস সভাসদ্দের নাম খুঁটিয়া দিযাছেন," "তাহার প্রমাণ আত্মবিবরণীর মধ্যেই আছে", এই জাতীয় উক্তিও তিনি করেছেন। সুতরাং তিনি কার্যতঃ আত্মকাহিনীর সর্বাংশে অকৃত্রিমত্ব স্বীকার করেই নিয়েছেন বলতে হবে।

(৩) অতঃপর ডঃ সেন লিখেছেন, "কৃত্তিবাসেব আত্মকাহিনী সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন—অবশ্য অংশত, প্রথম নয় ছত্র মাত্র—নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩০৫ সালে তাঁহার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে। তাহার পর দীনেশচন্দ্র সেন ইহা সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে। নগেন্দ্রবাবু ও দীনেশবাবুর উক্তি অনুসারে এটুকু পাইয়াছিলেন হারাধন দত্ত ১৪৩২ শকাব্দে অনুলিখিত বলিয়া কথিত এক পুথিতে।"

এই উক্তি আগাগোড়াই ভুল। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী সর্বপ্রথম দীনেশচন্দ্র সেনই প্রকাশ করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণে (পৃঃ ৬৭-৭১)—সমগ্রভাবে। ঐ সময়ে হারাধন দত্ত জীবিত ছিলেন (প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। তিনি তাঁর পুঁথিটি ১৪২৩ শকাব্দে অনুলিখিত বলে দাবী করেছিলেন, "১৪৩২ শকাব্দে" নয়। (আমাদের মনে হয় পুঁথির আসল লিপিকাল ১৭২৩ শকাব্দ, হারাধন দত্ত '৭' কে '৪'

পড়েছিলেন।) নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণের পরে প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রবাবুর "উক্তি"তে হারাধন দত্ত সম্বন্ধে কিছু ছিল না।

(৪) তারপরে ডঃ সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র পাঠ এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রকাশিত পুঁথির পাঠ মিলিয়ে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর একটি "আদর্শ পাঠ" প্রস্তুতের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর পাঠ নির্দেশ ত্রুটিহীন হয়নি। অনেক জায়গায় উৎকৃষ্টতর পাঠের বদলে নিকৃষ্ট পাঠ গৃহীত হয়েছে। বহু জায়গায় কোন একটি পাঠ গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তার পাঠান্তরটি পাদটীকায় উল্লিখিত হয়নি। কোন কোন জায়গায় পুঁথির পাঠ ত্যাগ করে কাল্পনিক পাঠ দেওয়া হয়েছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর ব্যবহৃত পুঁথিটি শুধু ছাপিয়ে দেন নি, তার ফটোও প্রকাশ করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন কিন্তু ছাপা বিবরণী থেকেই পাঠ নিয়েছেন, ফটো থেকে নেননি। ফলে নলিনীবাবুর বিবরণীর দু' একটি ছাপার ভুলকে তিনি বিশুদ্ধ পাঠ মনে করে গ্রহণ করেছেন। এর কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

প্রথমে যে সমস্ত ছত্রে ডঃ সেন পাঠান্তর উল্লেখ করেন নি, তার কতকগুলি আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি। আমরা [ ] বন্ধনীর মধ্যে পাঠান্তর দিলাম।

তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥

[তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥—খ-পাঠ]

বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির।

[বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির—ক

বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির—খ]

সুখ-ভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।

[শুভ-ভোগ কর‍্যা বিহরয় গঙ্গাকূলে।—খ]

আচম্বিতে শুনিলেন কুক্কুরের ধ্বনি।

[ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কুক্কুরের ধ্বনি—খ]

মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চেতে থানা।

[মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথানা।—ক]

গর্ব্বেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।

[গর্ব্বেশ্বর নামে পুত্র হইল তাহার আলয়।—খ]

মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি।

[মার্কণ্ড ব্যাস আছেন শাস্ত্রে অবগতি।—খ]

আপনার জন্ম-রস কহিব যে পাছে।

[আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে।—ক]

সর্ব্বত্র জিনিঞা পণ্ডিত বাপের দোসর।

[সর্ব্বত্র জিনিঞা পণ্ডিত বাপের সোসর।—খ]

কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।

[কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মম্বজ্য (ব্রহ্মৈশ্বর্য্য) গুণে।—খ]

দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।

[দক্ষিণ যাইতে নাম রাখিল কৃত্তিবাস।—খ]

তাহার পাশে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ।

[তাহার পাছে বস্যা আছেন ব্রাহ্মণ সুনন্দ।—খ]

রাজার সভাখান যেন দেব-অবতার।

[রাজা সভাখান যেন দেব অবতার।—খ]

দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥

[তখন আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥—খ]

যথাযথা যাই আমি গৌরব সে চাহী॥

[যথা যথা যাই আমি গৌরব যে চাহী॥—খ]

আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥

[আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে।—খ]

সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।

[লোক বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।—খ]

লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

[লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।—খ]

কয়েক জায়গায় ডঃ সেন পুঁথির পাঠকে ত্যাগ করে কাল্পনিক পাঠ দিয়েছেন, যেমন "বারান্তর উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গা পার" কে তিনি করেছেন, "বারেন্দ্র উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গা পার।" "সপ্ত ঘটি বেলা যখন দিয়ানে পড়ে কাটি" কে তিনি করেছেন "সপ্ত ঘটি বেলা যখন দগড়ে পড়ে কাটি।" প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনার একটি মৌলিক নীতি এই, যে পাঠ কোন পুঁথিতেই নেই—তা মূল পাঠ হিসাবে দেওয়া চলবে না, পুঁথির পাঠ যতই অস্পষ্ট হোক্ তাই রাখতে

হবে। এখানে প্রদত্ত দুটি উদাহরণের প্রথমটির পুঁথির পাঠ সম্পূর্ণ অর্থযুক্ত, দ্বিতীয়টিরও মানে বোঝা যায়—"দেওয়ানে পড়ে কাটি" অর্থ 'যখন রাজসভার ঘণ্টায় কাঠি পড়ে'। তবুও ডঃ সেন এগুলির পরিবর্তন করলেন কেন জানি না। কল্পিত পাঠকে তিনি পাদটীকায় দিতে পারতেন।

তৃতীয় ধরণের ভুল আরও মারাত্মক। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মূল পুঁথিতে আত্মকাহিনীর একটি চরণ—"ঠাকুরাল ধর্ম্মচরিত্র গুণে মহাগুণী।" আর একটি চরণ "পাত্র মিত্র সভে বলে সুন দ্বিজরাজে।" (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯, পৃঃ ৫৪৭-৪৮-এ পুঁথির ফটো দ্রষ্টব্য)। পুঁথির ছাপা বিবরণীতে ছাপার ভুলে 'গুণে'র জায়গায় 'শুণে' এবং 'সুন'র জায়গায় 'পুন' হয়েছে (ঐ, পৃঃ ৫৫১-৫৫৬ দ্রঃ)। ডঃ সেন তাঁর প্রদত্ত আত্মকাহিনীর পাঠে "ঠাকুরাল ধর্মচরিত্র শুনে মহাগুণী" এবং "পাত্র মিত্র সবে বলে পুন দ্বিজরাজে" নিয়েছেন (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৮৭ ও ৯১)। পুঁথির ফটো থেকে পাঠ নিলে এ বিভ্রাট ঘটত না।

ডঃ সেন প্রদত্ত আত্মকাহিনীর পাঠে অনুরূপ আরও অনেক ত্রুটি আছে, স্থানাভাবে আর দৃষ্টান্ত দেব না।

(৫) আত্মকাহিনীটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করবার পরে ডঃ সুকুমার সেন আরও যে "কয়েকটি পুথিতে কৃত্তিবাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়," তা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। এগুলি ইতিপূর্বে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের ভূমিকায় (পৃঃ ।৵০-॥০) একত্র সংগ্রহ করেছিলেন। ডঃ সেন স্পষ্টতঃ সেখান থেকেই এগুলি নিয়েছেন, কিন্তু ডঃ ভট্টশালীর নাম করেননি। এই "সংক্ষিপ্ত পরিচয়"গুলি উদ্ধৃত করবার সময় ডঃ সেন কয়েক ক্ষেত্রে পুঁথির পাঠকে পরিবর্তিত করেছেন।

(৬) এরপরে ডঃ সেন কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণীর সাক্ষ্যের সমন্বয় করবার চেষ্টা করছেন। তাঁর মতে আত্মকাহিনীতে "ওঝা-ভ্রাতৃবর্গের নামের তালিকায় অত্যন্ত গোঁজামিল আছে।" কিন্তু আত্মকাহিনীতে তো স্পষ্টভাবে কৃত্তিবাসের পাঁচটি ভাইয়েরই নাম আছে—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর (বা শ্রীকর), বলভদ্র এবং চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজেরই আর এক নাম ভাস্কর ("চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর")। ডঃ সেন আত্মকাহিনীর দুই ছত্রকে প্রক্ষিপ্ত ধরে "বিবাদভঞ্জন" করতে গিয়ে (পৃঃ ৯৫) বরং বিবাদ বাধিয়ে তুলেছেন। এখানে তিনি প্রবানন্দের মহাবংশের যেভাবে উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে

অশ্রদ্ধা মেশানো আছে। কিন্তু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা অবধি ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীকে একখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক কুলগ্রন্থ বলেই মনে করেন।

(৭) ডঃ সেন "রাড়া মধৈ বন্দিনু আচার্য্যচূড়ামণি"র "রাড়া মধৈ" কে আচার্যচূড়ামণির নামের পাঠবিকৃতি বলে মনে করেন। কিন্তু রাঢ় অর্থে "রাড়া" শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বহু জায়গায় পাই। সুতরাং 'রাড়া মধৈ' যে "রাড়া মধ্যে'র (অর্থাৎ রাঢ়ের মধ্যে) বিকৃত রূপ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৮) অতঃপর ডঃ সেন "কৃত্তিবাসের রাজদর্শন-ব্যাপার"কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতেও আমাদের মন সায় দেয় না। তাঁর মতে সভাভঙ্গের পরে রাজা যখন উঠানে আসর জমিয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন, সেই সময়ে কৃত্তিবাস তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মতে কৃত্তিবাস রাজার সভা ভঙ্গের কিছুক্ষণ আগেই সভায় প্রবেশ করেছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১০১ দ্রঃ)। কৃত্তিবাস যে রাজার "সভা"তেই গিয়েছিলেন, সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন, "রাজা সভাথান যেন দেব অবতার। তখন আমার চিত্তে লাগে চমৎকার।"

(৯) এর পরে ডঃ সেন লিখেছেন, "রাজসভার বর্ণনায় গৌড়-দরবারের মুসলমানি আদবকায়দার ইশারামাত্র নাই। সভাসদ্গণ সকলেই হিন্দু এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ।" "অধিকাংশ ব্রাহ্মণ"—একথা ডঃ সেন কোথায় পেলেন? কৃত্তিবাস এক সুনন্দ ছাড়া আর কোন সভাসদ্‌কে স্পষ্টভাবে ব্রাহ্মণ বলেন নি। ডঃ সেন লিখেছেন, "আশ্চর্যের বিষয়, কৃত্তিবাস সভাসদ্দের নাম খুঁটিয়া দিয়াছেন অথচ গৌড়েশ্বরের নাম একবারও উল্লেখ করিলেন না।" এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৯৯ দ্রষ্টব্য)।

(১০) অতঃপর ডঃ সেন লিখেছেন "শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় একাধিকবার গণনা করিয়া কৃত্তিবাসের যে সম্ভাব্য জন্মতারিখগুলি পাইয়াছিলেন (১৪৩৩, ১৩৯৮) তাহার আত্যন্তিক মূল্য কিছু নাই, কেন না এই গণনা একটি বৃহৎ অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। কৃত্তিবাসের 'রাজা গৌড়েশ্বর' হইতেছে হিন্দু-সুলতান রাজা 'গণেশ' (কংস)—এই অনুমান না করিলে 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (পূর্ণ) মাঘ মাস'-এর কোন অর্থই থাকে না।" একথাও ঠিক নয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় গণনা (১৩৯৯—১৩৯৮ নয়) এই বৃহৎ অনুমানের উপর নির্ভর করছে ঠিকই, কিন্তু প্রথম গণনার (১৪৩৩) সঙ্গে রাজা গণেশের কোন সম্পর্ক নেই।

(১১) ডঃ সেন তারপরে মত প্রকাশ করেছেন, "কৃত্তিবাসের 'রাজা গৌড়েশ্বর' যদি দনুজমর্দ্দন-কংস ('গণেশ')······হইতেন তবে দরবারের বর্ণনায় মুসলমানি পদ্ধতির কিছু না কিছু ছাপ থাকিত।" একথারও তাৎপর্য বুঝলাম না। প্রথমতঃ, কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সভার এমন কিছু বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি, যাতে "মুসলমানি পদ্ধতির ছাপ" অপরিহার্যভাবে ফুটে উঠতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ডঃ সুকুমার সেনেরই মতে কৃত্তিবাস রাজা গণেশের কয়েক পুরুষ পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই মুসলমান। হিন্দু রাজার সভার বর্ণনায় মুসলমানি পদ্ধতির ছাপ না থাকা যদি অস্বাভাবিক হয়, তাহলে মুসলমান রাজার সভার বর্ণনায় তা না থাকা স্বাভাবিক হবে কেমন করে? এ প্রশ্নের উত্তর ডঃ সেন দেন নি।

(১২) এরপরে ডঃ সেন কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছেন। প্রথমেই তিনি আত্মকাহিনীর প্রথম ছত্রে উল্লিখিত 'বেদানুজ' মহারাজাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর দনুজমর্দনদেবের সঙ্গে অভিন্ন ধরেছেন। তাঁর এই অনুমানের পিছনে বিন্দুমাত্রও তথ্য নেই। ডঃ সেন আর একটি বিষয় লক্ষ্য করেননি যে ডঃ ভট্টশালীর পুঁথির মতে নারসিংহ ওঝা বেদানুজ মহারাজার পাত্র নন, পুত্র।

(১৩) তারপর ডঃ সেন লিখেছেন, "এই দনুজমর্দ্দনের অনুগ্রহেই নারসিংহ ওঝা গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বসতি করেন।" এরকম অনুমান করার হেতু কি জানি না, তবে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে নারসিংহের ফুলিয়ায় বসতি স্থাপনের কথা এই লেখা আছে,

শুভ ভোগ কর‍্যা বিহরয় গঙ্গাকূলে।
বসত করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজ্যা বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাণ্ডায়্যা ব্রাহ্মণ চতুর্দ্দিগে চাই।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথাই॥
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুক্কুরের ধ্বনি॥
কুক্কুরের ধ্বনি শুনি ওঝা চারিদিগে চাহে।
আকাশবাণী হয়্যা তথা গোসাঞি যে রহে॥

এর মধ্যে দনুজমর্দনের অনুগ্রহের বিন্দুমাত্রও আভাস নেই।

(১৪) তারপর ডঃ সেন যা লিখেছেন তা আরও বিস্ময়কর। তিনি লিখেছেন, "নারসিংহ দনুজমর্দ্দনের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না, কেননা বয়স্ক ব্রাহ্মণপণ্ডিত না হইলে রাজা তাঁহাকে গঙ্গাতীরে বাস করাইতেন না।.. নারসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বরও নিশ্চয়ই দনুজমর্দ্দনের সমসাময়িক ছিলেন।" এখানে আকাশকুসুমের মালা গাঁথা হয়েছে। প্রথমতঃ, দনুজমর্দন নারসিংহকে গঙ্গাতীরে বাস করাননি, কাজেই তার থেকে নারসিংহের বয়স হিসাব করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সূত্রের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় রাজা গণেশ বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে দনুজমর্দনদেব নামে মুদ্রা প্রকাশ করেন, সুতরাং নারসিংহকে তাঁর চেয়ে বয়সে বড় বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। তৃতীয়তঃ, দনুজমর্দনদেব মাত্র দুবছর (১৪১৭ ও ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন। ঐ সময়ে যদি নারসিংহ ফুলিয়ায় বসতিস্থাপন কবে থাকেন, তাহলে গর্ভেশ্বর দনুজমর্দনের সমসাময়িক হতে পারেন না, যেহেতু নারসিংহের ফুলিয়ায় বসতি স্থাপনের পবে গর্ভেশ্বরের জন্ম হয়েছিল। আত্মকাহিনীতে লেখা আছে,

ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি,
ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হইল তাহার আলয়।

(১৫) অতঃপর ডঃ সুকুমার সেন কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে স্থাপন করে লিখেছেন, "কৃত্তিবাসের এই যে আনুমানিক জীবৎকাল নির্দ্ধারণ করিলাম তাহার পরোক্ষ সমর্থন পাইতেছি সনাতন-রূপ-জীবের বংশলতিকায়। সনাতন-রূপের প্রপিতামহ পদ্মনাভ শিখরভূমি হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন নৈহাটিতে, দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হইয়া।" কিন্তু কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ যে দনুজমদনের সমসাময়িক ছিলেন, একথা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সনাতন রূপের বংশলতিকা থেকে এবিষয়ে কোনবকম সমর্থনই পাওয়া যাবে না। তবুও ডঃ সেন তার উপরে জোর দিয়েছেন এবং এই মন্তব্য করেছেন, "যাহা হউক সনাতন-রূপের প্রপিতামহ পদ্মনাভ তাহা হইলে কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ গর্ভেশ্বরের সমসাময়িক হইলেন।" এই মন্তব্য আমাদের শুধু বিস্মিত করে না, হতবাক্ করে দেয়। ডঃ সেন বলছেন নারসিংহ ওঝা ও পদ্মনাভ দুজনেই দনুজমর্দনের অনুগ্রহে গঙ্গাতীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ঐ সময়ে নারসিংহের যদি বেশী বয়স হয়ে থাকে, পদ্মনাভেরও তাই হবে। তাহলে পদ্মনাভ নারসিংহেরই সমসাময়িক হবেন, তাঁর পুত্র গর্ভেশ্বরের সমসাময়িক হন কেমন করে?

(১৬) আরও পরে ডঃ সেন লিখেছেন, "পর্য্যায়ক্রমে সমান হইলেও বয়সে সনাতন-রূপ কৃত্তিবাসের এক পুরুষ পরের লোক হইলেন।" সনাতন-রূপের পিতামহ তাঁদের প্রপিতামহের ত্রয়োবিংশ সন্তান বলে ডঃ সেন এইরকম হিসাব করেছেন। কিন্তু ঐ সময়ে পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলে পিতার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ত্রয়োবিংশ সন্তানের জন্ম হওয়া সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সনাতন-রূপ পদ্মনাভের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ আর কৃত্তিবাস নারসিংহের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। সুতরাং নারসিংহ ও পদ্মনাভ সমসাময়িক হলে সনাতন-রূপ পর্যায়ক্রমে কৃত্তিবাসের সমানও হন না, এক পুরুষ পরের লোকও হন না, এক পুরুষ আগের লোক হন।

(১৭) এই সমস্ত কাল্পনিক হিসাব নিকাশ করে ডঃ সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন, "অতএব কৃত্তিবাস যে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন 'তাহা প্রতিপন্ন হয়।" এই সিদ্ধান্তটিই সবচেয়ে চমকপ্রদ। ডঃ সেনের মতে কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারসিংহ রাজা দনুজমর্দনের পাত্র ছিলেন। দনুজমর্দন ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন, সুতরাং নারসিংহও ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। তাহলে কৃত্তিবাস ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকেন কেমন করে? পাঁচ পুরুষের ব্যবধান মাত্র ৫৭-৫৮ বছর হয় কোন্ হিসাবে? সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডঃ সেনের এই সিদ্ধান্ত তাঁরই প্রথম অনুমানের (অর্থাৎ নারসিংহ দনুজমর্দনের সমসাময়িক ছিলেন) সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেনি। সুতরাং তাঁরই ভাষায় "তাহার আত্যন্তিক মূল্য কিছু নাই।" কৃত্তিবাস যে ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে জীবিত থাকতে পারেন না, সে কথা আমরা বলছি না। আমাদের বক্তব্য এই, ডঃ সুকুমার সেনের এই আলোচনা থেকে কৃত্তিবাসের ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জীবিত থাকা প্রমাণিত হয় না।

(১৮) ডঃ সেন আরও লিখেছেন, "তবে কৃত্তিবাস যে সনাতন-রূপের সমসাময়িক ছিলেন না এমন কথাও খুব জোর করিয়া বলা যায় না।" কারণ (ক) "কোন কোন প্রাচীন পুথিতে ব্রজবুলিতে লেখা 'রাম-রাস' অংশ পাওয়া যায়। ব্রজবুলির চলন হয় ষোড়শ শতকে।" কিন্তু ব্রজবুলি যে পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ছিল না তা যেমন জোর করে বলা যায় না, তেমনি ঐ 'রাম-রাস' অংশ কৃত্তিবাসের লেখা নাও হতে পারে। (খ) "জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে কৃত্তিবাসের উল্লেখ নাই।" কিন্তু জয়ানন্দের আগে বাংলা সাহিত্যের আর কোন কবি পূর্ববর্তী কবিদের উল্লেখই করেননি।

বৃন্দাবনদাস যে কৃত্তিবাসের উল্লেখ করেননি, তা কৃত্তিবাসের প্রাচীনত্বের প্রমাণ স্বরূপে গণ্য হতে পারে। কারণ কৃত্তিবাস যদি সনাতন-রূপের তথা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক হতেন, তাহলে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের ফুলিয়া ভ্রমণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিশ্চয় কৃত্তিবাসেরও নাম করতেন।

যাহোক আমরা দেখলাম, কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেনের আলোচনার অনেকখানি অংশই নিছক্ কল্পনা এবং আলোচনার এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের সামঞ্জস্য নেই। এই কারণে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।

তারপর চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন দুই জায়গায় আলোচনা করেছেন—'বিচিত্র সাহিত্য' প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত ''চণ্ডীদাস-সমস্যা' প্রবন্ধে এবং 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের (২য় সং), দশম পরিচ্ছেদে। 'বিচিত্র সাহিত্যে'র অন্তর্গত প্রবন্ধটি তথ্য-সংগ্রহের দিক দিয়ে মূল্যবান। তবে এর এক জায়গায় ডঃ সেন লিখেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চণ্ডীদাস ও তাঁহার পদ সাধারণ অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত পাঠকের অজ্ঞাত ছিল।" এই উক্তি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। সুতরাং ঐ সময়ের সাধারণ পাঠক বলতে ইংরেজী শিক্ষিত পাঠক সম্প্রদায়কে বোঝাতে পারে না। ইংরেজী না জানা পাঠকসমাজে যদি চণ্ডীদাসের পদ জ্ঞাত থেকে থাকে, তাহলে ইংরেজী জানা মুষ্টিমেয় কজন পাঠকের কাছে তা অজ্ঞাত থাকবার কোন কারণ নেই। সেসময় প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা সুরু হয়নি, কাজেই তখনকার পত্রপত্রিকায় চণ্ডীদাসের অনুল্লেখ থেকে কিছু প্রমাণ হয় না।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' ডক্টর সেনের চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় আলোচনা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার আছে। এই বইএ ডঃ সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাসকেই আদি এবং অকৃত্রিম চণ্ডীদাস বলে ধরেছেন। অর্বাচীন এক চণ্ডীদাসের নগণ্য রচনা সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত বিখ্যাত পদগুলি সম্বন্ধে তিনি কোনরকম আলোচনা করেন নি। কেন তিনি সেগুলিকে আলোচনার অযোগ্য বলে মনে করলেন, তার কোন কারণও দেখান নি। এই পদগুলির কথা বাদ দিয়ে কিভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হতে পারে, তা আমাদের ধারণার অগম্য।

ডক্টর সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা চণ্ডীদাসকে যতদূর সম্ভব অর্বাচীন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক হইতে পারেন স্বচ্ছন্দে।" এই মতের সমর্থনে তিনি লিখেছেন, "শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক, অর্থাৎ ষোড়শ শতকের প্রথমে অংশে বর্ত্তমান, ভক্ত কবি এক চণ্ডীদাসের সন্ধান বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহিরে মিলিতেছে। এক 'শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দমধুব্রতশ্রীচণ্ডীদাস' ভাবচন্দ্রিকা নামে একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইহাতে রাগমার্গ অবধি ভক্তিতত্ত্ব এবং মাধুর্য্যলীলার উৎকর্ষনিরূপণ আছে।" কিন্তু 'ভাবচন্দ্রিকা'র রচয়িতা চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, তার প্রমাণ কি ?

ডঃ সেন 'ভাবচন্দ্রিকা'-কার চণ্ডীদাসকে কাব্য-প্রকাশের ধ্বনিপ্রকরণের 'দীপিকা' নামক টীকার রচয়িতা চণ্ডীদাস এবং 'গণমার্তণ্ড'-রচয়িতা নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের পূর্বপুরুষ চণ্ডীদাসের সঙ্গে অভিন্ন ধরতে চান। কিন্তু 'দীপিকা'র রচয়িতা চণ্ডীদাস ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫৬, পৃঃ ৩০৬দ্রঃ)। গণমার্তণ্ড-রচযিতা চণ্ডীদাসকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বলবার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। কুলগ্রন্থের মতে এই চণ্ডীদাস কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৭১ দ্রষ্টব্য)। মহাকবি চণ্ডীদাস যে মহাকবি কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, এমন কথা কোন সূত্র থেকে জানা যায় না। সুতরাং দুই চণ্ডীদাসকে অভিন্ন বলার বাধা বিস্তর।

'গণমার্তণ্ড'-কার নৃসিংহের পূর্ব্বপুরুষ চণ্ডীদাসকেই বা ডঃ সুকুমার সেন কেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ধরলেন, তা বুঝতে পারলাম না। নৃসিংহের জীবৎকালই অনিশ্চিত, লোকের মুখে শোনা কথা "নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন ছিলেন প্রায় দেড়শত-দুইশত বৎসর আগে" থেকে তাঁর উর্ধ্বতন দশম পুরুষ চণ্ডীদাসের জীবৎকালকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। কুলগ্রন্থের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, এই চণ্ডীদাস কৃত্তিবাসের সমসময়ে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

যাহোক, ডক্টর সুকুমার সেনের এই আলোচনা থেকে মহাকবি চণ্ডীদাসের পরিচয় বা আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন আলোকই পাওয়া যায় না।

এরপর চূড়ামণিদাস। চূড়ামণিদাস সম্বন্ধে ডঃ সেন বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ২৬২-২৬৮তে সংক্ষেপে এবং বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৭-৮১তে

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি চূড়ামণিদাসের গ্রন্থকে "একটি অশ্রুতপূর্ব অজ্ঞাত অভিনব চৈতন্যচরিতকাব্য" কেন বলেছেন জানি না। নগেন্দ্রনাথ বসু তো বহু আগেই 'বিশ্বকোষে' এর পরিচয় দিয়ে গেছেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৪ দ্রঃ)। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৮৯৬) ভূমিকায় লেখেন, "পুস্তক আকারে বৃহৎ হইল, এইজন্য তিনশত বৎসর পূর্ব্বের কবি অনন্তরাম মৈত্রের পুত্র জীবন মৈত্র রচিত পদ্মাপুরাণ, বিপ্রদাস কবি কৃত মনসামঙ্গল, চূড়ামণি দাস কৃত চৈতন্যচরিত্র এবং দ্বিজ দুর্গাদাস প্রণীত মুক্তালতাবলী প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিতে পারিলাম না।" 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর পরবর্তী সংস্করণ-গুলিতে দীনেশবাবু এক জায়গায় চূড়ামণিদাসের গ্রন্থের নাম করেছেন (৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৬ দ্রঃ)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে বলেন, "চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লইয়া যে সকল বই লেখা হয়, তাহাতে বৌদ্ধদের বাঙ্গালায় থাকার কথা নাই।...কেবল চূড়ামণিদাস বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করায় বৌদ্ধেরা খুব আনন্দিত হইয়াছিল।" (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩৩৬, পৃঃ ২০ দ্রঃ) এঁদের লেখা না পড়েই ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "চূড়ামণিদাসের কোনো চৈতন্যচরিতের নামও কখনো শুনিনি।"

ডঃ সেন চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়ে'র রচনাকালকে আন্দাজে "ষোড়শ শতাব্দীর মাঝের দিকে" ফেলেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই বই ঐ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা হয় (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৫ দ্রঃ)।

অতঃপর জয়ানন্দ। জয়ানন্দের জীবৎকাল ও তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের রচনা-কাল সম্বন্ধে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (১ম খণ্ড, ২য় সং) পরস্পর-বিরোধী উক্তি পাওয়া যায়। ঐ বইএর ২৬৯ পৃষ্ঠায় ডঃ সেন লিখেছেন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল "ষোড়শ শতকের সপ্তম দশক হওয়া সম্ভব", আবার ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "জয়ানন্দের জীবৎকাল ষোড়শ শতকের শেষ পাদ।"

জয়ানন্দের আবির্ভাবকাল ও গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধে আমরা এই বইএর সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু একটি কথা বলা দরকার। জয়ানন্দ লিখেছেন যে তাঁর শৈশবাবস্থায় চৈতন্যদেব একদিন তাঁর বাড়ীতে পদার্পণ করেছিলেন। ডঃ সেন এই উক্তির যাথার্থ্যে সন্দেহ প্রকাশ

করেছেন। এই সন্দেহের যে কোন ভিত্তি নেই, তা আমরা এই বইএর ১৮৬-১৮২ পৃষ্ঠায় দেখিয়েছি। কিন্তু ডঃ সেনের একটি উক্তি আমাদের বিস্মিত করেছে। তিনি লিখেছেন, "আমার মনে হয় যে এখানে জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গদাধর-পণ্ডিতের কিংবা গদাধর-দাসের গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।" তাহলে কি ডঃ সেন বলতে চান চৈতন্যমঙ্গল লেখবার সময় জয়ানন্দ উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়েছিলেন? চৈতন্যদেবের সঙ্গে অন্য কোন লোকের গোলমাল করে ফেলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে কি কেউ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোন পার্শ্বচরের গোলমাল করে ফেলতে পারে? জয়ানন্দ লিখেছেন, তাঁর পিতা চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন—"তাহে সে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য"। ডঃ সেন লিখেছেন "এখানে মনে হয় শুদ্ধ পাঠ ছিল 'পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য'।" এই অনুমানের পিছনেও কোন যুক্তি নেই।

তারপর মুকুন্দরাম। মুকুন্দরামের সময় সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের আধুনিকতম অভিমত পাওয়া যায় বিশ্বভারতী পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩, পৃঃ ২৪৮-২৫৫) প্রকাশিত তাঁর 'মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে ডঃ সেন "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা" ইত্যাদি শ্লোকটিকে মুকুন্দরামের স্বরচিত এবং দেশত্যাগকালনির্দেশক বলে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন।

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে (পৃঃ ২৪৮) ডঃ সেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় "মানসিংহের কাল" এর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়েছেন। এই ইতিবৃত্তের সবটাই তিনি আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal, Vol. II থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এই ঋণ স্বীকার করতে তিনি ভুলে গেছেন।

অতঃপর ডঃ সেন মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীর "ধন্য রাজা মানসিংহ" ইত্যাদি শ্লোকটির বিভিন্ন পাঠ ও পাঠান্তরের বিচার করেছেন। তিনি "গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ"এর বদলে 'গৌড়াধিপ উৎকল মহিম' পাঠ গ্রহণ করতে চান। তিনি বলেন এই শ্লোকের তৃতীয় ছত্রে 'অধর্মী রাজার কালে' "পাঠ স্বীকার করলে দ্বিতীয় ছত্রের এই পাঠ অবশ্যস্বীকার্য।" কেন? "গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ" পাঠ নিলে কি মুকুন্দরামের কোন পূর্ববর্তী শাসক "অধর্মী" হতে পারে না?"

ডঃ সেন "গৌড়াধিপ উৎকল মহিম" এর অর্থ করেছেন—"যিনি 'গৌড়াধিপ' হয়ে উৎকলে অভিযান করেছিলেন।" কিন্তু এই পাঠ কোন পুঁথিতেই পাওয়া যায়নি। "গৌড়বঙ্গ উৎকল মহিম" এবং "গৌড়ধিব সকল মোহিত", এই দুই পাঠের সমন্বয় করে ডঃ সেন এই পাঠ কল্পনা করেছেন। এই পাঠ নিলে শ্লোকটির চতুর্থ ছত্রের "মামুদ (বা মহম্মদ) সরিফ" এর সঙ্গে "মহিম" এর মিল হয় না। সুতরাং এই পাঠ গ্রহণ করা যায় না। "গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ" বা "গৌড়বঙ্গ উৎকল মহীপ" পাঠই সঙ্গত ও শুদ্ধ। যখন মানসিংহ এক সময়ে বাংলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা হয়েছিলেন বলেই ইতিহাসে লেখা আছে, তখন এই পাঠের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কেশিয়াড়ীতে মানসিংহের শাসনকালে উৎকীর্ণ ১৫২৬ শকাব্দের শিলা-লিপিতে যে "শ্রীল রঘুনাথ শর্মা ভূমিপ" এর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁকে ডঃ সেন মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের সঙ্গে অভিন্ন ধরেছেন। কিন্তু এঁরা যে অভিন্ন, তা নিশ্চিত করে বলবার মত কোন প্রমাণই নেই। রঘুনাথ শর্মার পুত্র চক্রধর শর্মা এই শিলালিপিটি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে ডঃ সেন বলেন, "১৬০৪ সালে রঘুনাথের পুত্র রাজা হয়েছিলেন।" কেন? পিতার জীবদ্দশায়ও তো চক্রধর শিলালিপি উৎকীর্ণ করাতে পারেন। বিশেষ করে যখন শিলালিপির রঘুনাথকে 'শ্রীল রঘুনাথ' বলা হয়েছে। ডঃ সেন আরও বলেন, "চণ্ডীমঙ্গল-রচনার সময়ে রঘুনাথের পুত্র জন্মায়নি। তাহলে ভনিতায় তার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকত।" কিন্তু কোন কিছুর অনুল্লেখ থেকে কিছু নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ হয় কি? অতঃপর ডঃ সেন বলেন, "বরং ছেলে যে তখনো হয় নি তারই ইঙ্গিত আছে। কাব্যের শেষের দিকে ভনিতায় রঘুনাথের প্রসঙ্গে বারবার বলা হয়েছে 'অভয়া পুর তার কাম'। এ কামনা পুত্রের জন্য বলেই মনে করি।" এখানে ডঃ সেন কল্পনাকে বড় বেশী প্রশ্রয় দিয়েছেন।

ডঃ সুকুমার সেন অতঃপর এই মত প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের পুত্র চক্রধর রাজা হয়েছিলেন, অতএব ঐ সময়ে তাঁর বয়স বারো তেরোর কম ছিল না, সুতরাং ১৫৯১-৯২ খৃঃ মুকুন্দরামের কাব্যরচনা-কালের শেষ সীমা। যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে শিলালিপির রঘুনাথ শর্মা ও মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায় অভিন্ন এবং চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময় রঘুনাথের পুত্র হয়নি, ততক্ষণ এই সিদ্ধান্তকে কোন মূল্যই দেওয়া যায় না।

এরপরে ডঃ সেন দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, ১৪৬৬ শকাব্দেই মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন। তিনি বলেন, "রঘুনাথের রাজ্যকাল ১৫৭৩ থেকে ১৬০৩ সাল। সুতরাং মুকুন্দরামের আরড়ায় আগমন ১৫৭৩ সালের বেশ কিছু আগে।" কিন্তু রঘুনাথের রাজত্বকাল যে ১৫৭৩-১৬০৩ খৃঃ, সে সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন ও অম্বিকাচরণ গুপ্তের মুখের কথা ভিন্ন আর কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং তার উপর কতটুকু নির্ভর করা যায়?

ডঃ সেন "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা" ইত্যাদি শ্লোককে মুকুন্দরামের স্বরচিত বলেই মনে করেন। তিনি বলেন, শ্লোকটিকে "প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যত সহজ মেনে নেওয়া তত সহজ নয়। প্রশ্ন উঠবে, কে প্রক্ষেপ করলে? কেন প্রক্ষেপ করলে? কোথা থেকে নিয়ে প্রক্ষেপ করলে? কবে প্রক্ষেপ করলে? প্রথম তিন প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, না সদুত্তর না কদুত্তর। শেষ প্রশ্নের জবাবে বলতে পারি, প্রক্ষেপ যদি হয়েই থাকে তো অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের পরে নয়। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিশাল-লোচনীর গীত' এ ছত্র দুটি উদ্ধৃত আছে।" সর্বশেষ উক্তিটি আমাদের বিস্মিত করেছে। প্রথমতঃ ডঃ সেন কেন বলছেন দুটি ছত্রই উদ্ধৃত হয়েছে, কেবলমাত্র প্রথম ছত্রটি ("শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা") 'বিশাল-লোচনীর গীত' এ পাওয়া যায়—সেখানে 'গণিতা'র জায়গায় 'গণিতে' পাঠ দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ ডঃ সেন কেন ধরে নিয়েছেন ছত্র দুটি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকেই 'বিশাললোচনীর গীত'-এ উদ্ধৃত হয়েছে? তার বিপরীতও তো হতে পারে? ঐ ছত্র দুটি বা প্রথম ছত্রটি হয়তো মূলে 'বিশাললোচনীর গীতে'ই ছিল; 'বিশাললোচনীর গীত'-এর রচয়িতার নামও মুকুন্দ, গায়েন বা লিপিকর হয়তো দুই কবির নামসাদৃশ্যে ভুল করে তা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে প্রক্ষেপ করেছে। এর থেকে ডঃ সেনের প্রথম তিন প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যায়।

অতঃপর ডঃ সুকুমার সেন আর এক ধাপ্ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "মুকুন্দ-রামের আত্মকাহিনীতে 'হৈল রাজা মামুদ শরিফ' এই পাঠ সার্থক হলে রাজা মামুদ নিশ্চয়ই গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ।" কিন্তু গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন এবং পরলোকগমন করেন (History of Bengal, D. U., Vol. II, p. 164)। সুতরাং মুকুন্দরাম যদি ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে দেশত্যাগ করে থাকেন, তাহলে মামুদ সে সময় রাজা থাকেন কি করে?

হামুনের রাজ্যাবসানের ছয় সাত বছর পরেও (ইতিমধ্যে শেরশাহের আবির্ভাব ও হয়তো তিরোভাবও ঘটে গেছে) কি মুকুন্দরাম তার খবর পান নি?

ডঃ সেন লিখেছেন, "তিনি (মুকুন্দরাম) ভুল করেছিলেন যে, মানসিংহের শাসন এদেশে চিরকাল ছিল না। তাঁর দেশত্যাগকালে (অর্থাৎ ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে) যিনি রাজা ছিলেন ভ্রমক্রমে তাঁর বদলে মানসিংহের নাম করে ফেলেছেন।" ডঃ সেনের এই কথা সত্য হলে আমাদের বুঝতে হবে মহাকবি মুকুন্দরামের সামান্যতম কাণ্ডজ্ঞানও ছিল না, যার ফলে তিনি মানসিংহের শাসনকালের পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তখনকার রাজা হিসাবে মানসিংহের "নাম করে ফেলেছেন"!

মুকুন্দরাম যে ১৪৬৬ শকাব্দে দেশত্যাগ করতে পারেন না সে কথা আমরা বলছি না। কতকগুলি তথ্য থেকে এ রকম সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিন্তু আরও কতকগুলি তথ্য ও যুক্তি আছে, যার থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তেও আসা সম্ভব। এ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট 'ক'-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শেষোক্ত তথ্য ও যুক্তিগুলি ডঃ সুকুমার সেন বাদ দিয়ে গেছেন।

অতঃপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ অগণিত রসজ্ঞ পাঠককে মুগ্ধ করেছে। ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থের প্রতি উচ্ছ্বসিত ভাষায় শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে লিখেছেন, "চৈতন্যচরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিকত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ববিচার সব দিক্ দিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।" রসজ্ঞতা ও দার্শনিক তত্ত্ববিচারে চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই, কিন্তু ঐতিহাসিকতার দিক্ দিয়ে এই গ্রন্থ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। এর মধ্যে ভক্তজনোচিত অতিভাষণ ও কালবৈষম্য দোষ খুব বেশী। ৺সতীশচন্দ্র রায় ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্যচরিতামৃতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে রাশি রাশি ভুল আবিষ্কার করেছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল গ্রন্থশেষে স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করা আছে "শাকে সিদ্ধাগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্যেহহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥" এর থেকে ১৫৩৪ বা ১৫৩৭ শকাব্দ পাওয়া যায়। প্রায় সকলেই চৈতন্যচরিতামৃতের এই রচনাকাল স্বীকার করেছেন। কিন্তু ডঃ সেন

এই তারিখ গ্রহণে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর মতে এই শ্লোকটি কোন আদর্শ পুঁথির লিপিসমাপ্তির তারিখ। তিনি বলেন, "কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে আসিয়া সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহাদেরই ইঙ্গিতে রঘুনাথদাসের পরিচর্য্যাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতন ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিরোধান করেন, তাহা হইলে কবিরাজ অন্তত ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বৃন্দাবনে আসেন। কবিরাজ যে প্রৌঢ়াবস্থায় বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন, ইহা একরকম সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল ধরিলে কবির বয়স যুক্তিসঙ্গত বার্দ্ধক্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়।" কিন্তু সনাতন গোস্বামী যে ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পরলোকগমন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে যেমন কোন প্রমাণ নেই, তেমনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে বৃন্দাবনে আসবার আগেই প্রৌঢ়বয়সে পদার্পণ করেছিলেন, একথা কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। এই বইএর অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে আমরা দেখবার চেষ্টা করেছি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, ২৪।২৫ বছর বয়সে বৃন্দাবনে এসেছিলেন এবং ৮০ বছরের কিছু বেশী বয়সে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেছিলেন (পৃঃ ২১৮)। যতদূর জানি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই।

কৃষ্ণদাস যে বৃদ্ধাবস্থায় চৈতন্যচরিতামৃত লিখেছিলেন, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন সে কথা স্বীকার করতে নারাজ। তিনি লিখেছেন, "অবশ্য কবি বলিয়াছেন, 'বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির'। কিন্তু একথা যে কবির বিনয়োক্তি তাহা গ্রন্থের রচনাই প্রমাণ করিতেছে। চৈতন্যচরিতামৃত বৃদ্ধ অন্ধ বধিরের লেখা হইতে পারে না, জরাতুরের তো নয়ই।" একথাও তাৎপর্য বোঝা গেল না। মানুষের বিনয় প্রকাশের নানারকম ভঙ্গী আছে, কিন্তু নিজেকে অহেতুক বৃদ্ধ বলা বিনয়ের পর্য্যায়ে পড়ে না এবং এই ভাবে কেউ বিনয় করেও না। আসল কথা ডঃ সুকুমার সেনের বদ্ধমূল সংস্কার এই যে, চৈতন্যচরিতামৃত বৃদ্ধের রচনা হতে পারে না। এই সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি কারও কথা শুনবেন না, স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথাও নয়।

ডঃ সেন লিখেছেন, "চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কালে রঘুনাথদাস জীবিত ছিলেন, বৃন্দাবনদাসও জীবিত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত লিখিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনদাসের অনুমতি লইয়াছিলেন। বৃন্দাবনবাসী যে সকল মহান্তের

অনুরোধ কৃষ্ণদাসকে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাদের দুইজন—ভূগর্ভ গোসাঞি ও শিবানন্দ চক্রবর্তী—ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, এবং একজন—যাদবাচার্য্য গোসাঞি—ছিলেন 'শ্রীরূপের সঙ্গী'। ইঁহারা যে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে জীবিত থাকিবেন তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।" কিন্তু কৃষ্ণদাস যেভাবে রঘুনাথদাস, বৃন্দাবনদাস ও ভূগর্ভ গোস্বামীর উল্লেখ করেছেন, তার থেকে প্রমাণ হয় না যে তাঁরা ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২১৬–২১৭ দ্রষ্টব্য)। বৃন্দাবনদাস ঐ সময়ে জীবিত থাকলে বৃন্দাবনের মহান্তেরা তাঁকেই তো চৈতন্যচরিত সম্পূর্ণ করতে অনুরোধ জানাতেন। শিবানন্দ চক্রবর্তী ও যাদবাচার্য গোসাঞির ঐ সময়ে বেঁচে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যে কয়েক জায়গায় জীব গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ'র উল্লেখ আছে। গোপালচম্পূর পূর্বচম্পূ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ও উত্তরচম্পূ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। তবুও ডঃ সেন চৈতন্যচরিতামৃত তার পরে রচিত হয়েছিল বলে স্বীকার করেন না। তিনি গোপালচম্পূর রচনাকাল-নির্দেশক শ্লোককেও "আদর্শ পুথির লিপিসমাপ্তির তারিখ" বলতে চান। তাঁর মতে "গোস্বামি-গ্রন্থের অধিকাংশ পুঁথির শেষে কালজ্ঞাপক পুষ্পিকা-শ্লোক প্রায়ই মূলরচনার নয়, প্রতিলিপির বা আদর্শ পুথির লিপিসমাপ্তির তারিখ। একটি উদাহরণ দিতেছি। রূপ গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' ভাণিকার অনেক পুথির শেষে যে শ্লোক আছে তাহা হইতে রচনাকাল পাওয়া যায় ১৪৭১ শকাব্দ (১৫৪৯)। অথচ এই ভাণিকা হইতে শ্লোক 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-তে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। এদিকে ভক্তিরামৃতসিন্ধুর রচনাকাল হইতেছে ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ।" কিন্তু রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র আগে 'দানকেলিকৌমুদী'র রচনা সুরু করে পরে শেষ করতে পারেন এবং তাঁর পক্ষে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে অসমাপ্ত 'দানকেলিকৌমুদী'র শ্লোক উদ্ধৃত করতেও কোন বাধা নেই।" ডঃ সেন বলেন যে এমনও হতে পারে যে গোপালচম্পূ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দেই সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু তার অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছিল এবং "গ্রন্থরচনার আরম্ভের কথা কৃষ্ণদাসের জানা থাকায় তিনি তাহা জীব গোস্বামীর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।" কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেভাবে 'গোপালচম্পূ'র উল্লেখ করেছেন তার থেকে বোঝা যায় ঐ গ্রন্থ তার আগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল,

গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥ (২।১।৩৯)

গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেমলীলারস সব দেখাইল॥ (৩।৪।২২১)।

ডঃ সেন চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল সম্বন্ধে নিজের বদ্ধমূল সংস্কারের পোষকতা করতে গিয়ে সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ উপেক্ষা করে দুর্বল অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ভূদেব চৌধুরী ঠিকই বলেছেন, "এক সংগে অতগুলি অনুমান স্বীকার করে নেবার যৌক্তিকতা আছে বলে এখনও মনে হয় না।"

ডঃ সেন লিখেছেন, "জীব-গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যের মারফৎ গৌড়ে যে-সকল বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতও ছিল। পুথি লুটের সংবাদ পাইয়া কাতরহৃদয় বৃদ্ধ কবিরাজ প্রাণ-ত্যাগ করেন। এই কথা প্রেমবিলাস-কর্ণানন্দ-ভক্তিরত্নাকরে আছে।" এই কথা প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে আছে সত্য, কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে নেই। ভক্তিরত্নাকরে লেখা আছে শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবন থেকে বাংলায় বৈষ্ণবগ্রন্থ নিয়ে যাবার পরে তা লুট হয় এবং তার অনেকদিন পরে তিনি বৃন্দাবনে আবার এলে জীব গোস্বামী তাঁকে "শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা।" চৈতন্যচরিতামৃতে গোপালচম্পূর উল্লেখ আছে। সুতরাং ভক্তিরত্নাকর এই সাক্ষ্যই দেয় যে, চৈতন্যচরিতামৃত শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে বৃন্দাবন থেকে বাংলায় যায়নি।

তারপর আলাওল। আলাওলের গ্রন্থাবলীর রচনাকাল নির্দেশে ডঃ সুকুমার সেন পদে পদে ভুল করেছেন। 'পদ্মাবতী'র রচনাকাল-প্রসঙ্গে ডঃ সেন লিখেছেন, "থদো-মিন্‌তারের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য যৌথভাবে শাসিত হইতে থাকে কন্যা ও পুত্র কর্তৃক। কন্যা বড় বয়সে বলিয়া তিনি 'মুখ্য পাটেশ্বরী' গণ্য হইয়াছিলেন। মাগন ঠাকুর ছিলেন এই 'মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন'।····· একদিন সভায় জায়সীর কাব্যের প্রসঙ্গ উঠিলে মাগন খুশি হইয়া বলিলেন···মাগনের আদেশ অঙ্গীকার করিয়া আলাওল কাব্যকরণে প্রবৃত্ত হইলেন···।" (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৫৭৫) কিন্তু থদো-মিন্‌তারের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ও কন্যা কর্তৃক যৌথভাবে রাজ্য শাসিত হয়নি, নরপদিগিগ্যির মৃত্যুর পরে নরপদিগিগ্যির কন্যা 'জশাশিনী' এবং পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র থদো-মিন্‌তার যৌথভাবে রাজ্যশাসন করেছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২২৭ দ্রঃ)। ডঃ সেনের মতে থদো-মিন্‌তারের মৃত্যুর পরে 'পদ্মাবতী' লেখা হয়, কিন্তু 'পদ্মাবতী'তে স্পষ্ট লেখা আছে থদো-মিন্‌তারের রাজত্বকালেই ঐ বই লেখা হয়েছিল।

'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জমালে'র রচনাসমাপ্তিকাল ডঃ সেনের মতের ১৬০৬ শক বা ১৬৮৪-৮৫ খৃঃ ; ছাপা বইএর শেষে "কলা অব্দ হস্তে কহি শুন গুণিগণ। মৃগাঙ্ক গগন রস করিয়া স্থাপন॥" পয়ার থেকে "কষ্টকল্পনা" করে তিনি এই সাল পেয়েছেন। এই সালকে 'সয়ফুল-মুলুকে'র রচনাসমাপ্তিকাল বলে স্বীকার করা যায় না, কারণ ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে আলাওল 'সয়ফুল-মুলুকে'র শেষাংশ রচনা সুরু করেছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৩১)। শেষ হতে ১৪।১৫ বছর লাগলে তিনি নিশ্চয়ই তা উল্লেখ করতেন, প্রথমবার এই বই বন্ধ থাকার কথা যখন তিনি উল্লেখ করেছেন।

'হপ্ত পয়কর' সম্বন্ধে ডঃ সেন বলেন, "ইহা শাহ শুজার রোসাঙ্গে আগমনের পরে এবং সম্ভবত তাঁহার হত্যার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতে শুজার আগমনের কথা মাত্র আছে, 'দিল্লীশ্বরবংশ আসি যাহার শরণে পশি তার সম কাহার মহিমা'।" এই কথা আবদুল করিম ও এনামুল হক সর্ব্বপ্রথম বলেন "আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" বইএ। ডঃ সেন তাঁদেরই মত নিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের নাম করেননি। যাহোক, এই মত আমরা সমর্থন করি না (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৩২-২৩৩, পৃঃ ২৯১ দ্রঃ)।

'দারা-সেকন্দর-নামা' সম্বন্ধে ডঃ সেন বলেন, "সৈফুল-মুল্‌ক সমাপ্তির দুই বৎসর পরে (১৬৪১) আলাওল এই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।" এখানে "১৬৪১" নিশ্চয়ই ছাপার ভুল। 'দারা-সেকন্দর-নামা'র রচনা ১৬৭০ খৃষ্টাব্দেরও পরে—'সৈফুল-মুল্‌ক' পুনরারম্ভের (সমাপ্তির নয়) দু'বছর পরে সুরু হয়।

একেবারে শেষে ডঃ সেন লিখেছেন "রোসাঙ্গে আসিয়া আলাওলের প্রথম কবিকৃতি হইতেছে দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত কাব্যের সম্পূরণ।" (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ১০২৯) অর্থাৎ ডঃ সেনের মতে আলাওল 'পদ্মাবতী' লেখারও আগে দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী' কাব্য সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু পদ্মাবতী থদো-মিন্‌তারের রাজত্বকালে লেখা। আর 'সতী ময়নামতী'র সম্পূরণ যে শ্রীচন্দ্র সুধর্মার (থদো-মিন্‌তারের পুত্র) রাজত্বকালে হয়েছিল, সে কথা আলাওল নিজে বলেছেন। এটুকু লক্ষ্য না করেই ডঃ সেন বলে বসেছেন "১০৭০ হিজরী সতী-ময়না সম্পূরণের কাল নয়।"

'আলাওল' সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে যেটুকু লিখেছেন, তার মধ্যে কিছু কিছু কাল্পনিক বিষয় স্থান পেয়েছে

(পরিচয়ের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃঃ ৮৯০ দ্রষ্টব্য)।

সর্বশেষে রামপ্রসাদ সেন। ডঃ সেনের মতে রামপ্রসাদের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের আগে রচিত হয়নি। আমরাও তাই মনে করি, কিন্তু আমাদের যুক্তিধারা ভিন্ন। ডঃ সেনের যুক্তিধারা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় কিনা সন্দেহ। তিনি 'কালীকীর্তনে' উল্লিখিত রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক রাজকিশোরকে তীর্থমঙ্গলে উল্লিখিত হুগলীর রাজকিশোর রায়ের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। এই কথা ডঃ সেনের অনেক আগে অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন (রামপ্রসাদ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৮), সুতরাং এখানে অতুলচন্দ্রের নামের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। যাহোক্ ডঃ সেন লিখেছেন কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল তীর্থযাত্রার সময়ে রাজকিশোরের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিলেন এবং "কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তীর্থযাত্রা করেন" (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৮৫৩)। অথচ অন্যত্র তিনি লিখেছেন "কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল আনুমানিক ১৭৬৮-৬৯ সালে বহু লোকজন লইয়া গঙ্গাপথে নৌকা করিয়া তীর্থযাত্রা করেন" (ঐ, পৃঃ ৮৭১)। এখানে তিনি নিশ্চিত হয়ে "১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে" লিখলেন কেন, বুঝতে পারলাম না। তারপর এরই উপর নির্ভর করে তিনি লিখেছেন, "সুতরাং রামপ্রসাদের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের পূর্বে রচিত হওয়া সম্ভব নহে, সম্ভবত পরে।"। রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক রাজকিশোরের পরিচয়ই সন্দেহের স্থল, ডঃ সেন নিজেও লিখেছেন "মনে হয় এই রাজকিশোর ছিলেন হুগলীর দেওয়ান," অথচ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় তিনি নিশ্চিত! এই রাজকিশোর কেন 'রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়' হতে পারেন না, সে সম্বন্ধে ডঃ সেন কোন কারণ দেখাননি। আর হুগলীর রাজকিশোর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেও তো প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী থাকতে পারেন এবং রামপ্রসাদকে পৃষ্ঠপোষণ করতে পারেন। সুতরাং ডঃ সেনের এই সিদ্ধান্ত আদৌ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

৮ আর দৃষ্টান্ত বাড়ালে আমাদের বইএর কলেবর মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, সেইজন্য এইখানেই ক্ষান্ত হলাম। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেরই কাছে ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থ অপরিহার্য। তার পরবর্তী সংস্করণগুলি যথাসম্ভব নির্ভুল হোক্, এই আমাদের কাম্য। সেই আশাতেই তাঁর কয়েকটি আলোচনার ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বিচার করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হলে কৃতার্থ জ্ঞান করব।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
২	১৫	'বঙ্গাল' জাতি	'বঙ্গালী' জাতি
১৮	১	কুম্ভক	কুম্ভকর্ণ
৫৫	৯	জ্ঞেয়া	জ্ঞেয়াঃ
৭২	২৬	চারটি	কয়েকটি
৭৫	৩	তিনশো সাড়ে তিনশো	চারশো
৯৯	৬	রচে	রচি
১২০	৬	১৪৯৪	আনুমানিক ১৬৯৪
১২১	৪	১৬৯৪	১৬৯৫
১২১	৬	ঠিক্ ঐ বৎসরেই	প্রায় ঐ সময়েই
১২৭	২৭	চাই	চাহি
১৩৫	১৪	৩১শে ফাল্গুন	২৮শে ফাল্গুন
১৩৫	১৫	নবদ্বীপে	নীলাচলে
১৩৫	২০	২৯শে	২৮শে
১৪০	১৮	বিখেছেন	লিখেছেন
১৪১	১৭	কর্ত্তং	কর্ত্তুং
১৪৪	৪	১৫৩৪	১৪৩৪
১৬৪	২১	যথাকর্নিতং	যথাকর্ণিতং
১৬৭	১৯	ঐ সর্গের	চতুর্দশ সর্গের
১৯০	১৮	মোগলের	মোগলের বিরুদ্ধে
২০৩	১৮	১৫২৪ শক [১৬০৬ খৃঃ অঃ]	১৫২৫ শক [১৬০৩ খৃঃ অঃ]
২০৪	৩	১৫০৬	১৬০৩
২০৪	১১	১৫০৩	১৬০৩
২০৮	২	১৪২০	১৫২০

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
২০৮	৩	১৪৯৪	১৫৯৪
২০৯	২৫	১৫০৪-০৫	১৬০৪-০৫
২১০	২২	১৫০৪-০৫	১৬০৪-০৫
২১৩	২	ষোড়শ শতাব্দীর	সপ্তদশ শতাব্দীর
২২৪	৬	১৬৫৭-৫৭	১৬৫৬-৫৭
২২৮	১	ভাব	অভাব
২৩৩	৬	১৬৬২	১৬৬৫
২৩৩	৭	১৬৬২	১৬৬৫
২৫৬	১৩	'দক্ষ'	'দক্ষে'
২৭৩	১৮	মধ্যাহ্নে	মধ্যাহ্নে
৩০১	১৭	স্মৃতিস্তম্ভ	স্মৃতিফলক
৩০৪	১৮	ফেমে	ফ্রেমে